সদর-মফস্বল

সদর-মফস্বল

সুধীর চক্রবর্তী

২০এ, সুকিয়া স্ট্রিট । কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
নভেম্বর ১৯৬৫

প্রকাশক :
অরূপ চট্টোপাধ্যায় । শৈবাল সরকার
প্রজ্ঞা প্রকাশন
২০এ, স্থকিয়া স্ট্রিট । কলিকাতা ৭০০ ০০৯

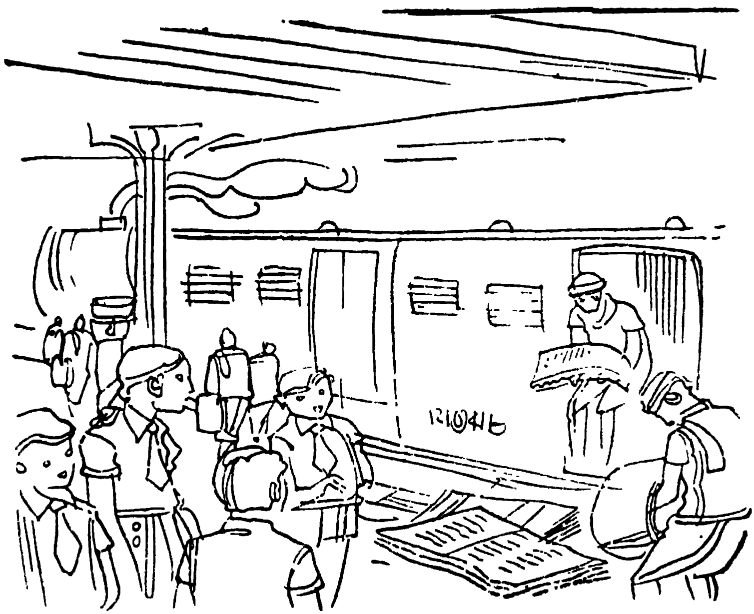
মুদ্রক :
অরিজিৎ কুমার
টেক্‌নোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
স্থধীর মৈত্র
স্কেচ :
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
বর্ণলিপি :
অজয় মিশ্র

শ্রীমান্ ধীরেন দেবনাথ

স্নেহভাজনেষু

সদর-মফস্বল



সদর-মফস্বল

বাড়িতে দোতলায় একটা নতুন ঘর উঠবে তাই একটা ঠেলা গাড়ি করে ইট আসছে ইট ভাঁটা থেকে। বেলা দশটা। প্রথম দফার তিনশো ইট বাড়ির সামনে এনে এক্কাওয়ালা নণ্টু সেখ হৈ চৈ চেঁচামেচি বাধিয়ে তুললো: 'বাবু কোথায়? বলি মিস্ত্রি কেডা? আরে ইট ডেলিভারি নেবে কে?'

ছোটখাট মানুষ নণ্টু সেখ। লুঙ্গি গেঞ্জি পরনে, হাসিখুশি। কিন্তু গলাখানা বাজখাঁই। একজন বাজারমুখো পথচারী শোরগোল শুনে নণ্টুকে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে ডেলিভারি কেস' নণ্টু গম্ভীর গলায় ব'লে আবার নিজেই হেসে ওঠে। ততক্ষণে রাজমিস্ত্রি রাজু মিঞা এসে গেছে নিচে। তাকে দেখে নণ্টু বলে, 'ও, তুমিই এ কাজের মিস্তিরি?' তারপরে আমাকে বলে, 'বাবু, এই রাজু মিস্তিরি এক পুরানো পাপী। কাজ খুব ভালো জানে। তবে বল বেয়ারিঙের একটু গণ্ডগোল আছে।'

: সেটা কি ?

: এই একটু তড়বড়ে, চঞ্চল প্রকৃতির। বল বেয়ারিঙের গণ্ডগোল তো ? যেমন ধরুন পরপর চারদিন কাজ করলো তো তিনদিন ডুব। কি গো মিস্তিরি, ঠিক কিনা ? শোনো বাপু, এ বাবুকে আর ফাঁসিও না। এখন নাও ইঁট তোলাও ছাদে, তোমার জোগালেদের ডাকো দিকি।

রাজু রেগে আছে। তবু গম্ভীর থেকে গাড়ির একটা ইঁট তুলে তাতে কন্নিকের ঘা মেরে পরখ করে। ঠং ঠং আওয়াজ ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নন্টু বলে, 'এ ইঁট আর যাচিয়ে দেখতে হবে না। ফাসকেলাস পগমিল যাকে বলে। বাইরে হারকিউলিস, ভেতরে গুড কনডিশন, বুঝলে ?'

রাজু বলে, 'হুঁ, বুঝলাম। তোর মত আমা ইঁট'

খ্যা খ্যা করে হেসে নন্টু বিড়ি ধরায় আর বলে, 'আমা কি ঝামা কেরমে কেরমে বুঝবা'।

আমি জিগ্যেস করি, 'মিস্ত্রি, ইঁট কেমন ?'

রাজু বলে, 'ইঁটের সদর তো ভালোই দেখা যাচ্ছে। এখন মফস্বল কেমন তা গাঁথনির সময়ে ধরা পড়বে। নাকি বলো নণ্টে ?'

'ইঁটের আবার সদর মফস্বল আছে নাকি ?' আমি জানতে চাই।

নণ্টে একগাল হেসে বলে, 'বাবু, সব কিছুরই সদর-মফস্বল আছে বৈকি। এই যে ধরুন আপনার রাজুমিস্তিরি, এ বেটা দিনের বেলা রাজমিস্তিরি আর রাতে ডাকাত।'

রাজু আওয়াজ তুলে বলে, 'নণ্টে, সকালবেলা দিগদারি করিস নে। কাজে যা। বাবু, এই নণ্টে-কোচোয়ান হ'লো জন্ম-ফাজিল। এর কথা কানে নেবেন না। এ বেটা দিনের বেলা ঘোড়ার গাড়ি টানে আর রেতের বেলা ফকিরি গান করে। তার মানে এ বেটা জন্মে-মুসলমান আর ভাবেরসে হিন্দু। কি বুঝলেন ?'

নণ্টে বললে, 'বাবু বুঝবে আবার কি ? তবে হ্যাঁ, সদর-মফস্বলের রহস্য যে জেনেছে তার আর মার নেই।'

কথাটা সারাদিনই আমার মনে ফুট কাটে : সদর-মফস্বলের রহস্য। বহুদিন তো কাটলো এই মফস্বলের জেলা সদরে, তাই কলকাতার চোখে আমরা মফস্বলী

মানুষ বৈকি। কিন্তু মজা এই যে আশপাশের মহকুমা আর গ্রামগঞ্জের চোখে আমরাই নাকি আবার সদরের লোক। সত্যিই কি এ রহস্য ঘোচবার?

রাজ্ মিস্ত্রির উপমাটা মোক্ষম। ইঁটের সদর তো ভাল, মফস্বলটা কেমন তা ধরা পড়বে গাঁথনির সময়। আমাদের বাইরের দিকটাও সদরের মতো ঝকঝকে সমান সমান, তবে মফস্বল অর্থাৎ কিনা অন্দরের খবর বলা কঠিন। কাজে কর্মে ধরা পড়ে, আচারে-ব্যবহারে।

'এই যেমন ধরুন আমাদের ঐ দোতলার ডেপুটিবাবু', কথাটা বুঝিয়েছিল রিকসাঅলা মোতি মণ্ডল। 'তা ছাখেন, ডেপুটিবাবু যখনই বিকেলে বেরোবেন হাতে থাকবে টর্চবাতি। কেন বলুন তো, কি বুঝলেন?'

: কি আবার বুঝবো? হয়ত যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে, অন্ধকার হবে, তাই।

: হুঁঃ, বুঝেছেন ছাতা। আপনিও তো বেরিয়েছেন বিকেলে। আপনারও তো ফিরতে সেই রাত নটা, জানি তো সব। টর্চবাতি নিয়েচেন কি?

: না তো, কেন নিইনি বলো তো?

: 'আজ্ঞে এটা আর বুঝলেন না?' মোতি হেসে বলে, 'আপনি যে মপস্বলের মানুষ আর ঐ ডেপুটিবাবু যে সদর কলকাতার। মপস্বলে এসে ওঁর সব সময়ে ভয় এই বুঝি সাপে কাটলো, বুঝলেন? আমরা ঘাপটি মেরে রিক্সাস্ট্যাণ্ডে বসে থাকি আর সব দেখে শুনে বুঝে নিই।'

: মোতি, তুমি এখানে ব'সে গাঁয়ের লোক বুঝতে পারো? তারা কেমন?

: তার লক্ষণ আলাদা। ধরুন কাপড়জামা কোঁচকানো, মুখখানা রোদে তামা কিন্তু জুতোটা নতুন। ব্যাস্ ক্যাচ কট।

: ক্যাচ কট মানে?

: ক্যাচ কট আমাদের লাইনের কতা। মানে গাঁয়ের মাল এক পিস পাওয়া গেচে, ধরো ব্যাটাকে, ডবল ভাড়া হাঁকো, ও তো রেট জানে না।

আমি প্রতিবাদ ক'রে বলি, 'ঐ এক পোশাকেই আর জুতোতেই সব গাঁয়ের লোক বুঝবে?'

'তা কেন?' মোতি বলে, 'অন্য ধারা চিহ্নত আছে বৈকি। এই যেমন ধরেন, খামকা বিকালবেলা দড়ি বেঁধে চার চারখানা বাঁধাকপি নিয়ে চলেচে, কিংবা ধরেন কেবলই হাতঘড়িতে টাইম দেখচে, বুঝবেন গাঁয়ের মাকড়া সদরে এয়েচে। অন্য ধরনধারণই কি নেই? আচে। যেমন, খুব মাতব্বরের মত ঘোমটায়-জড়ো-

সড়ো বউকে জজকোর্টের বিলডিং দেখাচ্চে। আবার ধরেন, রিক্সা থেকে নেমে খাবারের দোকানে বসে হাঁক পাড়চে, চারটে করে সন্দেশ আর চারটে ক'রে রসগোল্লা খান। কি বুঝলেন?'

আমি উজিয়ে উঠে বলি, 'খাসা চমৎকার। কিন্তু মোতি, সদর কলকাতার লোকদের লক্ষণ আরও কটা বলো, শুধু টর্চবাতি দেখলেই কি সব হয়? ধরো দিনের বেলায় তোমার গাড়িতে সদরের প্যাসেঞ্জার উঠেছে, বুঝবে?'

রিক্সা চালাতে চালাতে মোতি বলে, 'খুব বুঝবো। প্রথমেই বাবু বলবেন, "একটু ফাঁকা জায়গায় চলো, এই নদীর ধারটার নেই এখানে?" তার মানে কি? কলকাতায় ঘিঞ্জিতে থাকে তো! তারপরে ধরেন. রিক্সায় উঠে খানিক গেলেই জানতে চাইবেন "এখানে মার্ডার-টার্ডার খুব হয় তাই না? কার জোর—কংগ্রেস না সি পি এম?" কিংবা বাবুর পাশে-বসা খুকি বলে উঠলো, "বাপি, এখানে সেই বস্তাপচা সিনেমাটা হচ্ছে। ঐ ছাখো পোস্টার। আমাদের ওখানে ক-বে হয়ে গেছে"।'

সত্যিই ভাববার মত ব্যাপার। নাড়িটেপা ডাক্তারদের মত সদর-মফস্বলের মানুষ চিনে নেবার এত যে করণকৌশল আছে কেই বা জানে?

কিন্তু একান্তভাবে মফস্বলী ব্যাপারও বোধ হয় কিছু আছে। আমারই তো বেশ কয়েকটা ব্যাপারে খটকা লাগে। কলকাতায় যাতায়াত তো আজকের নয়। থেকেছিও সেখানে একসময়। মনে হয়েছে, মফস্বলের সম্পর্কে কলকাতার মানুষদের যেন তেমন প্রত্যাশা নেই। ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল প্রথম যখন মফস্বলের কলেজে পাড়ি। সেবার আমাদের সঙ্গে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রীতি ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। আমি আপন মনে স্কোর লিখছি। যাদবপুরের ওপেনিং ব্যাটসম্যান বেণু দাশগুপ্ত (তখন বাংলার রঞ্জি প্লেয়ার) মাঠে নামলো আর আমাদের বোলার তুষারের প্রথম ওভারের তৃতীয় বলেই বোল্ড।

কি ব্যাপার? যাদবপুর হতবাক। বেণু বোল্ড? আমার স্কোর-সিটের আশেপাশে তারা গুজগুজ ফুসফুস ক'রে যাচ্ছে, 'নিশ্চয়ই পিচ খারাপ', 'বলটা থ্রো করছে না তো?' জুতোর কাঁটা মসমসিয়ে বেণু উঠলো প্যাভেলিয়নে, গম্ভীর। সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো. 'কিরে পিচ খারাপ? বলটা লিফ্‌ট্ করলো না কেন? ইয়র্কার?'

বেণু প্যাড খুলতে খুলতে মুখ নিচু ক'রে ধরা গলায় বললো, 'ও সব কিছু নয়, বলটা ইনস্যুয়িং করলো, বুঝতে পারিনি।'

ইনস্যুয়িং ? গোটা যাদবপুর হাঁ। ভাবটা যেন মফস্বলে ইনস্যুয়িং? সেকি ?

হ্যাঁ, ঘটনা হলো সত্যিই ইনস্যুয়িং। পরের বছরে তুষার ধানবাদে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে বিহারের হয়ে রঞ্জিতে চান্স পেলো। আবার বাংলার ওপনার সেই বেণুর মুখোমুখি। বেণু আবার বোল্ড। সেই ইনস্যুয়িং। এবারে বেণু এগিয়ে গিয়ে তুষারের করমর্দন করে।

এমনই সব সদর-মফস্বলী ব্যাপার কতই ঘটছে।

যেমন সেবার অর্থাৎ আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমাদের কলেজের সেরা সহপাঠী অনিল ইংরাজি অনার্স পেয়ে কলকাতায় পড়তে গেল। পড়ুয়া ছেলে। কলকাতার ছেলেরা তার মুখে মেটামরফসিস্ আর প্রুস্ত্ শুনে তো থ। ভাবটা যেন ওসব বই কেবল মহানগরেই মেলে।

কিন্তু কেন এমন হলো ? সদর মফস্বলে এতখানি ফারাক ?

ভাবতে গেলে একটু ধন্দ লাগে। এখনকার নামকরা বাঙালিদের বেশির-ভাগই তো মফস্বলের সৃষ্টি। তবে সে-মফস্বল স্বাধীনতার আগের মফস্বল। তার স্বাদই ছিল আলাদা। তাতে ছেদ পড়ে গেল কি স্বাধীনতার পরে পরেই? দেহের সব রক্ত মুখে চলে গেলে বাকি শরীরের যা হাল হয় তাই হলো মফস্বল শহরগুলোর? স্বাধীন সরকার নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়তে গিয়ে সব জোরটাই কি দিয়ে ফেললেন কলকাতার দিকে ? যা কিছু উন্নয়ন আর সম্প্রসারণ আর বড়মাপের প্রকল্প সবই তো কলকাতাকে ঘিরে। মাঝখান থেকে ইংরেজ আমলের নগর গঞ্জ আর মফস্বলী জনপদগুলো হয়ে গেল হতশ্রী আর অনাদরে মলিন। তার ফলে ক্রমে ক্রমে তলাতে তলাতে সে সব জায়গার মান এমনই নেমে গেল যে মফস্বলের বোলার ইনস্যুয়িং দিলে অবাক, বিদ্যার্থী আধুনিক সাহিত্যের খবর জানলে সবাই তাজ্জব।

মফস্বল মানে তাহলে সত্যিই কোন্ জায়গা বোঝায়? প্রত্যাশাহীন, লোড-শেডিংশাসিত, রুগ্ন রাজনীতিবহুল, অনুন্নত সড়ক আর মশা, বেকার আর উদ্বাস্তু-ত্রাসিত, ম্লান মুখচ্ছবির একদল মানুষ যেখানে থাকে? আর সদর মানে কি কেবলই চটপটে, চোস্ত্, ফিটফাট, আধুনিক বিদ্যা ও কৃৎকৌশলে দক্ষ সুবিধাভোগী একদল দাম্ভিকের অক্ষয় স্বর্গ? জানি না। কোন মীমাংসা নেই এ প্রশ্নের।

তর্ক আর অভিমানের জাল গুটিয়ে আমার চোখ বরং দেখতে চায় স্বচ্ছ দৈনন্দিন আজকের মফস্বলকে। যেমন আমার এই শহর। নামটা না হয় উহ্যই থাক। বরং বলা যাক বাংলার এক আবহমান জনপদ।

সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ এখানে কলকাতার গন্ধ মেখে প্রথম ট্রেন আসে। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের হকাররা ঝাঁপিয়ে পড়ে 'কাগজ কাগজ, টাটকা খবর।' ভাগ্যবাদী একদল মানুষ কাগজ খুলেই আগে পড়ে নেয় লটারির ফলাফল। সঙ্গে সঙ্গে হাতে লেখা হয়ে যায় একটা পোস্টার আর আড়-না-ভাঙা মাইক কোঁ কোঁ ক'রে সদম্ভে ঘোষণা করে : 'আমাদের দোকানের টিকিটে আবার দশ হাজার। টিকিট নম্বর···। এখুনই আসুন আমাদের লাকী কুপন কাউণ্টারে।'

একই ট্রেন থেকে নামে অনভ্যস্ত টাই প'রে একদল উন্নয়নশীল বালক-বালিকা। সঙ্গে তাদের ঝি কিংবা সর্বস্বত্যাগিনী গর্ভধারিণীর দল। কাছাকাছি গ্রাম থেকে এরা আসছে ইংলিশ মিডিয়ামের হাতছানিতে। দেখলেই আমার সেই সার্কাসের হাতিদের কথা মনে পড়ে। প্রথম হাতির লেজ শুঁড় দিয়ে ধরেছে দ্বিতীয় হাতি, তার লেজ ধরেছে তৃতীয় হাতির শুঁড়। এমনই হাতির পরে হাতি। তেমনই গ্রাম থেকে সদর শহরের ইংলিশ মিডিয়াম, সেখান থেকে অক্সিলিয়াম কিংবা সেণ্টজনস্, সেখান থেকে লরেটো-কারমেল-সাউথ পয়েণ্ট। চলেছে হাতির দল।

আমাদের অর্থনীতির অধ্যাপক ম্যালথাসের জনবিস্ফারের তত্ত্ব বোঝাতে উপমা দিতেন বাসনের দোকানের। বলতেন. 'দেখেছো তো, সেখানে বড় একটা প্যানের ভেতরে থাকে আরেকটা প্যান. তার ভেতরে আরেকটা, তার ভেতরে আরেকটা। এমনই গরিব লোকের সন্তান।'

সেই প্যানের উপমা মনে আসে মফস্বলের প্রশাসকদের দেখলে। তাঁরাই তো মফস্বলের ধারক ও বাহক। যেমন আমাদের সদর শহরে আছে কালেক্টরেট। তার কর্তা জেলাশাসক সংক্ষেপে ডি. এম। তাঁর অধীনে দুজন এ. ডি. এম। তাঁদের নিচের ধাপে কজন এস. ডি. ও। তাঁদের নিচে ডেপুটিবাবুরা। তাঁদেরও নিচে বি. ডি. ও। আশেপাশে আরও কত তস্য তস্য অফিসার আছেন। অফিসে গেজেটেডদের আর নন-গেজেটেডদের আলাদা মূত্রাগার।

এঁদের নামাবলীর পাশে ধর্তব্য ব্যক্তিরা হলেন পি. এ. ও (কৃষি বিভাগের কর্তা), আর. টি. ও (যানবাহনের কর্তা), এস. ও. পি. ডি. (পরিকল্পনার কর্তা), ডি. আই. ও (তথ্য কর্তা), ডি. এফ. ও (বনবিভাগের কর্তা), ডি. আই (শিক্ষার কর্তা), সি. এম. ও. এইচ (স্বাস্থ্যের কর্তা), ডি. আর. ডি. ও (পল্লীউন্নয়ন কর্তা) এইসব নানা স্তর। এইরকম সব সংক্ষিপ্ততম সাঁটের নামাবলী। এঁরাই মফস্বলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এঁরাই ত্রাতা। এঁরাই ফিতে কাটেন, বাণী দেন, মিনিস্টার এলে 'হেঁ হেঁ' করেন, শাসকদলকে তেল দেন আবার অধস্তনদের ঝাঁকানি মারেন। ডি.

এম—এ. ডি. এম-দের, এ. ডি. এম—এস. ডি. ও-দের, এস. ডি. ও—বি. ডি. ও-দের সর্বদাই লেঙ্গি মারছেন। আর আছেন টি. ও অর্থাৎ ট্রেজারি অফিসার, তাঁর তো কোন প্রকাশ্য কাজ নেই, কাজেই তাঁর কম্মো হলো সব ডিপার্টের বিলে লেঙ্গি মারা অর্থাৎ অবজ্যেকশন দেওয়া।

কলকাতা সদরের লোকদের এক মস্ত সুবিধা এই যে এমন সব মহামান্যমান ব্যক্তিদের না-চিনলেও দিব্যি চলে যায়। আর মফস্বলে ঠিক উলটো। কে কতটা অফিসারের সঙ্গে লাইন করতে পারে তাতেই তার নামযশ প্রতিষ্ঠা।

আরো বৃত্তান্ত আছে। ধরা যাক আমাদের শহরে কলে তিনদিন জল আসেনি, প্রথমে জনগণ এখানে সেখানে ভীরুর মত খোঁজ ক'রে শেষে হাত কচলাতে কচলাতে জেলাশাসক মশায়ের বাংলোয় হাজির, 'স্যার, আমাদের কলে তিনদিন জল নেই স্যার।' সিমেণ্ট চাই তাড়াতাড়ি। উপায় সেই ডি. এম। তিনি লিখে দেবেন 'টপ প্রায়োরিটি'। কিংবা ধরা যাক, জেলা স্টেডিয়ামে খেলা হবে জেলা



একাদশ বনাম কলকাতার কেষ্টবিষ্টুর দল। হেঁ হেঁ করতে করতে কর্মকর্তারা এলেন ডি. এম সাহেবের কাছে। ফলে খেলাধুলায় আনাড়ি এক আই. এ. এস বঙ্গসন্তান ফুটবলে অপটু লাথি মেরে খেলা শুরু করবার সংকেত দিলেন। উদ্যোক্তারা

কৃতকৃতার্থ। শহরের বালিকা বিদ্যালয়ে পারিতোষিক কে দেবেন? কেন ডি. এম? ও, তিনি হেড কোয়ার্টারে নেই? তাহলে এস. ডি. ও। তিনিও নেই? তবে ডাকো এস. ও. পি. ডি-কে।

এইসব মফস্বল দাপিয়ে-বেড়ানো মহামান্য রাজপুরুষ বেশির ভাগই তো আসলে ডাঁটা চচ্চড়ি-খাওয়া মধ্যবিত্ত। কিন্তু যতদিন মফস্বলের পোস্টিংয়ে আছেন ততক্ষণ এঁদের অনেকের কথাবার্তা, হালচাল, উন্নাসিকতা দেখবার মতো। যেন শেরশাহের বাচ্চা।

থাকেন সব সরকারি বাংলো কিংবা কোয়ার্টারে। আছে দুয়েকজন সরকারি বেতনধারী খিদ্‌মদ্‌গার আর একটা সরকারি গাড়ির বরাদ্দ। যখন তখন বলা নেই কওয়া নেই হুস্ ক'রে ধুলো উড়িয়ে পথচারীদের সচকিত ক'রে তাঁদের গাড়ি চলে যায়। অফিস টাইমের বাইরে সেই সরকারি গাড়িতে অবশ্য বেশির ভাগ সময় সাহেবের বউ-বাচ্ছাদের দেখা যায়। সে সব বউরা আবার অনেকে বগলে ভ্যানিটি ব্যাগ সাপটে ডানহাতে নাকে রুমাল গুঁজে গাড়ি থেকে নেমে বাজারে ঢুকে বলেন, 'ওমা কি সুন্দর পটল, কি টাটকা উচ্ছে! কত ক'রে?'

এসব হাকিম গিন্নিদের কারুর কারুর, শোনা যায়, সোশ্যাল সার্ভিসের বাই আছে। তাঁর নাচগানের অনুষ্ঠানে কার্ড-বেচা এক ঝকমারি। তবু বেচতেই হয় হাকিমের কর্মচারীদের। সেই ফাংশানে আবার হাকিমের কন্যা নাচবেন, হাকিমের শালী গাইবেন সে এক বালাই। সব দিক সামাল দেওয়া কি সোজা কথা? আবার কানাকানি শুনি একজন এস. ডি. ও-র গিন্নি নাকি টাঙাইল শাড়ির ব্যবসা করেন। কী গেরো! তবু সবাইকে তৎপর থাকতেই হয়। হাকিমের হাতেই তো হুকুম।

তিনি হাসলে মফস্বল হাসে। তিনি গুম মারলেই লোডশেডিং।

এইসব প্রশাসকদের বেশির ভাগেরই লক্ষ অবশ্য মক্কা অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিংস। সেখানে কায়েম হ'তে পারলে আর কি চাই? 'উঃ, মশাই আমি হলাম কলকাতার ছেলে, আর আজ পনেরো বছর ধরে ঘুরছি সব হাফ-সিভিলাইজড মফস্বলে। সে সব কাঁহা কাঁহা জায়গা কি বলবো। রঘুনাথগঞ্জ, রায়না, বাগনান, সোনামুখী, বেতাই, হিঙ্গলগঞ্জ কীসব জায়গা! মনুষ্যবসতির অযোগ্য। কিন্তু এবারে? এতদিন পরে রাইটার্সে পোস্টিং পেয়েছি, ডেপুটি সেক্রেটারি। আর সহজে নড়ছি নে বুঝেছেন?'

বেশির ভাগ ডেপুটির এই হলো আঁতের কথা। অবশ্য সেই স্বর্গপ্রাপ্তির

চেহারাও কিছু কিছু দেখা নেই কি অনেকের? যেমন ধরা যাক আমাদের শহরের অবর জেলাশাসক অর্থাৎ এ. ডি. এম সান্যাল সাহেবের কথা। এখানে যতদিন ছিলেন, সাদা একখানা অ্যাম্বাসাডারে চ'ড়ে যখন ইতিউতি ঘুরতেন তখন কী তাঁর কৃপাবিলানো হাসি, কী ঠাটঠমক। তারপরে সরকারি লোন নিয়ে কল্যাণীতে একখানা বাড়ি বানালেন। তারপরেই ধ'রে ক'রে ট্রান্‌স্‌ফার। মহাকরণে জয়েন্ট সেক্রেটারি। ফল হলো, প্রতিদিন কল্যাণী লোকালে ভিড়ে সেঁধিয়ে শেয়ালদা আসা-যাওয়া। পরনে ডেলি প্যাসেঞ্জার-প্রুফ ফিকে নীল টেরিকটনের বুশসার্ট আর কালো ট্রাউজার। হাতে এক পেটমোটা ব্যাগ। শেয়ালদহর পোর্টিকোর তলায় সাড়ে দশটায় খাড়া মোতায়েন সান্যাল সাহেব থুড়ি এখন মিস্টার সান্যাল। প্যাচপেচে গুমোট গরম, ঘাম মুছছেন ঘনঘন। ব্যাপার কি, না এখনও রাইটার্স থেকে পিক-আপ গাড়ি আসেনি। এখন তো মফস্বলের এ. ডি. এম. নন যে অর্ডারলি সাতসকালে পুলকার থেকে গাড়ি এনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এসব দিগদারির পরেও অনেক কেচ্ছা বাকি থাকে। মহাকরণে সেক্রেটারির ভুরু কোঁচকানি, কো-অর্ডিনেশনের রগড়ানি, ফেডারেশনের অভিযোগ সবই আছে। ব্যাপারখানা যেন মফস্বলের রুই সদরে এসে বনে গেছেন সেরেফ বেলে গুড়গুড়ি।

অবশ্য এই-সব মফস্বলী দণ্ডমুণ্ডের কর্তারাও বোকা বনে যান খোদ মফস্বলেই কখনও সখনও। যেমন সেবার শহরের কমার্স কলেজে ছাত্রসংসদ হঠাৎ ঠিক করলো কলেজে সোশ্যাল সার্ভিস করবে। অর্থাৎ কিনা কলেজের আশেপাশের পল্লীতে সাফাই, সাক্ষরতা অভিযান আর দরিদ্রদের বস্ত্রদান। হঠাৎ এহেন মতি কেন? ভেতরের প্যাঁচখানা বোঝে কার সাধ্য। যাহোক তিনদিনের প্রকল্প সাঙ্গ হ'তেই অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণের অনুষ্ঠান হলো রীতি-মত প্যাণ্ডেল বানিয়ে। অভিজ্ঞান পত্র দিতে এলেন জেলার আরক্ষাধ্যক্ষ মানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস। হঠাৎ এত লোক থাকতে তিনি কেন?

যাহোক ইউ. পি ক্যাডারের আই. পি. এস মহোদয় এলেন। সুস্বাস্থ্যবান, বিনয়ী। আই. পি. এস হবার আগে বছরখানেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জ্ঞানদান করেছেন মীরাট কলেজে। এহেন ব্যক্তিটিকে ভুজুং ভাজুং দিয়ে কলেজে নিয়ে এল তুখোড় ছাত্রনেতা শংকরদেব। হাজার হ'লেও সে একজন জেনারেল সেক্রেটারি।

আরক্ষাধ্যক্ষ অভিজ্ঞান দিতে এসে একেবারে অভিভূত। একবার ছাত্রদের দিকে আর একবার অধ্যাপকদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন: 'আমি অত্যন্ত

গর্বিত। এডুকেশন ওয়াজ মাই প্রাইম চয়েস। আমি মীরাট কলেজে কিছুদিন লেকচারার হয়েছি। শিকসাই আমার চিফ ইনটারেস্ট হচ্ছে।'

অবশেষে অভিজ্ঞানপত্র দান ক'রে সবাইকে 'ধইন্নবাদ' জানিয়ে ইউ. পি তনয় তো জিপে উঠলেন। ছাত্রনেতা শংকরদেব তাঁর কানে কী সব ফিসফাস মন্ত্র দিলে। তিনি প্রথমে লাল হয়ে পরে বললেন, 'ওকে ওকে। সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আই উইল সি টু ইট।'

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে কলেজের ম্যাদামারা এক ভালমানুষ কেরানী-বাবু জিগ্যেস করলেন হেড ক্লার্ককে, 'কী ব্যাপার বলুন তো মশাই? হঠাৎ শংকরদেব সোশ্যাল সার্ভিসই বা কেন করলো আর এস. পি-কেই বা আনলো কেন?'

'জানেন না বুঝি?' হেড ক্লার্ক বিশদ হলেন, 'কলেজের কটা ছাত্র রোজই বিরক্ত করছিলো মেয়ে ইস্কুলের ছাত্রীদের। ঐ দেখেননি বড় রাস্তায় বটতলায় কটা ছোকরা বসে?'

: তাতে কি হলো? তার সঙ্গে এর কি?

: আরে দিনকয়েক আগে গার্জেনদের কমপ্লেন পেয়ে পুলিস সব কটাকে যে গারদে পুরেছে। এখন ছাড়াতে হবে না তাদের? নইলে শংকরদেব কেমন লিডার। তাইতেই হঠাৎ এই সব সোশ্যাল সার্ভিসের প্যাঁচ, বুঝলেন?

মাথা চুলকে কেরানীবাবু বললেন, 'এতক্ষণে বুঝলাম বটে। তা ছোকরার ঘটে বুদ্ধি আছে। কিন্তু শেষমেশ কি হ'লো? এস. পি কি বললে?'

: যা বলবার তাই বললো। শংকরদেবের মুখের হাসিটা দেখলেন না?

সমবেত সবাই অবশ্য বুঝে গেলেন শিক্‌সাই যাঁর চিফ ইণ্টারেস্ট সেই পুলিস সাহেবের এখনও অনেক শিক্ষাই বাকি।'

*

সদর শহরের পনেরো কিলোমিটার দূরে আমাদের সাবেক বাস্তুগ্রাম। সেখান থেকে চল্লিশ বছর আগে চাটিবাটি গুটিয়ে চলে এসেছি তবু সম্পর্ক কি একেবারে ঘোচে? গ্রামবাসীরাই যোগ রাখে। দোল দুর্গোৎসব নারাণপুজো নবান্নে ডাকে, যেতেই হয়। বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধে ডাক পড়ে, যাই। আমরাও ঐসব উপলক্ষে গ্রামের একদা-ঘনিষ্ঠদের ডাকি। গ্রামসুবাদে কাকা কিংবা জ্যাঠা কিংবা দাদা। আসেন। খেয়ে দেয়ে গাড়ি ভাড়া নিয়ে বলেন, 'তোমরা ছিলে গাঁয়ের বাবু,

তোমরাও চলে এলে আর আমরা হলাম বাবু, বুঝলে কিনা।' মানানসই শহুরে কথা বলতে পেরেছেন ভেবে নিজেরাই হাসেন।

গ্রামের মধ্যে এমনও অনেকে আছে যারা না-ডাকতেই আসে। আপ গরজী তারা। ভাবে, শহরে এসেছি যখন তখন বাবুদের বাড়ি একটু ঘুরেই যাই। এখানে বাবু মানে আমার প্রয়াত পিতা, যিনি ছিলেন জমিদার-নন্দন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের এক দশকের প্রেসিডেন্ট। বাবু তাঁরই যথাযোগ্য বিশেষণ আর সেই সুবাদে আমাদের বাড়ি কিনা বাবুদের বাড়ি। শহরে এলে এমন বাবুদের বাড়ি আসার অত্যাজ্য ব্যাধি ছিল আমাদের গ্রামের দিব্য পালের। আখাম্বা চেহারা, গলায় বাঘের ডাক। ষাট বছরের মানুষটির ভূলুণ্ঠিত প্রণাম নেওয়া আমার পক্ষে ছিল বড়ই অস্বস্তিকর। বাঘের ডাক বলতো, 'তা বললে হবে কেন? গ্রামসুবাদে আপনি আমার মামা। আপনার পিতা ছিলেন আমাদের দাদামশাই, কেননা আমার মা ছিল তাঁর ধম্মো-মেয়ে।'

অতএব দিব্য পাল আসবে। খাবে। খবরাখবর দেবে। মাসে অন্তত একবার বরাদ্দ। সেই দিব্য বহুদিন আর আসে না। তারপর হঠাৎ মাস আষ্টেক পরে উদয়। ভূলুণ্ঠিত প্রণাম সামলে নিয়ে বলি, 'কি ব্যাপার দিব্য? আর যে মোটে আসো না? আমাদের বাড়ির রাস্তা কি ভুলে গেলে নাকি?'

: কী যে বলেন মামা, বাবুদের বাড়ির রাস্তা কি এ জন্মে কোনোদিন ভুলতে পারি? আসলে বহুদিন এ দিকে আসতে পারিনি। খুব বড় ডাকাতি হয়ে গেল তো!

: ডাকাতি? তোমার বাড়িতে? কই, খবর পাইনি তো?

: ডাকাতি কি একরকম? ব্যাপার কি জানেন মামা, আপনার বউমার মাঝে মাঝেই পেটে শূলব্যথা উঠতো। এটা-ওটা অনেক চিকিচ্ছে ক'রে ফেল্। শেষে সবাই বললে সদরে দেখাতে। জেলা হাসপাতালের কাণ্ড তো জানেন। তাই কুড়ি টাকা ফি দিয়ে সরকারি ডাক্তারকে চেম্বারে দেখালাম।

: ঠিকই তো করেছো। তার সঙ্গে ডাকাতির কি সম্বন্ধ?

: আরে, তাতেই তো ডাকাতি হলো। ডাক্তার শর্মা একমাস দেখলেন। ওষুধে ফি-তে একহাজার। তারপর পাঠালেন সার্জেন দত্তর কাছে। সেখানে একমাস। তারপরে ভর্তি করলো নার্সিং হোমে। অপারেশন ওষুধ পথ্য ফি। কিন্তু কিস্যুই হলো না। ডাকাত, ডাকাত সব। পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা ডাকাতি হয়ে গেল।

দিব্য যা পরিহাসের সুরে বললো তাতে সাধারণ মানুষের অভিযোগের তাপ আছে। কে না জানে, মফস্বল শহর হলো সরকারি ডাক্তারদের মুক্তাঞ্চল। তাঁদের কাউকেই প্রায় হাসপাতালে পাওয়া যায় না কিন্তু চেম্বারে সর্বদা মোতায়েন থাকেন। প্রাইভেট প্র্যাকটিস আর নার্সিং হোমের রবরবা দেখবার মতো।

মফস্বলে আট-দশ ঘরের সাবেক বাড়িগুলো কোন্ মন্ত্রে যে রাতারাতি বনে যায় নার্সিং হোমে তা কে জানে। এটা এখন একধরনের বাড়িঅলার নতুন ব্যবসা। লোকদেখানো একজন ডাক্তার থাকেন চার্জে আর সারাদিন চলে সরকারি ডাক্তার-দের রিলে রেস। অন্যদিকে ডাক্তারদের বাড়ির সামনে গাদি মেরে পড়ে আছে গ্রাম্য রুগীর দঙ্গল আর তাদের পরিজনরা। মওকা বুঝে পাড়ার বেকাররা পলিথিনের ছাউনি টাঙিয়ে চা টোস্ট ডিমের দোকান দিয়েছে। এমনই একজন সদাব্যস্ত ডাক্তার আনন্দচন্দ্র নস্কর এম. ডি।

কোথায় বেহালায় নফরচন্দ্র দাসের গলিতে ছিল এক নস্কর পরিবার। ফরিদপুর থেকে আসা অসহায় কটি উদ্বাস্তু মানুষ। বাড়ি বলতে টালিছাওয়া দুখানা গোঁজামিল ঘর। বাড়ির কর্তা বৃন্দাবন নস্কর বেহালা বাজারে একটা চৌকি পেতে খই মুড়কি চিঁড়ে বাতাসা বেচতো। বড় ছেলে আনন্দচন্দ্র পর্ণশ্রী কলেজে পড়তো মেধা বৃত্তি নিয়ে। সেখান থেকে ন্যাশনাল মেডিকেল। পাশ ক'রে সরকারি ডাক্তার। প্রথম ক'বছর প্রাইমারি হেলথ সেণ্টার অর্থাৎ গ্রামের ডাক্তারি সেরে সোজা মহকুমা শহরে পদার্পণ ঘটলো তাঁর। এর মধ্যে বছরখানেক ছুটি নিয়ে বিবাহ ও এম. ডি পর্ব সারা হয়েছে। এবারে মফস্বলের ভূস্বর্গে তাঁর নিরংকুশ শোষণক্ষেত্র।

লোকে বলে নস্কর ডাক্তার। হাতযশ ভাল। বুদ্ধিমান। তাঁকে আর এ-শহরে পায় কে? ওষুধের দোকানে কমিশন, মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভদের কাছে পার্সেণ্টেজ, সব ফড়ে, সব দালাল নস্করের হাতের তস্কর। শহরের মদ-বেচা শুঁড়ি বদন সাহা নস্কর ডাক্তারকে নিজের নার্সিং হোমে ব্যবস্থা ক'রে দিলো। নির্ভর-যোগ্য অ্যাবরসন সেণ্টার। গোপনীয়তা গ্যারাণ্টিড।

নস্কর ডাক্তারের পশারের রমরমায় অন্য সরকারি ডাক্তারদের চোখ টাটায়। তাঁরা চিফ মেডিকেল অফিসারকে ধরেন। এম. এল. এ-কে বোঝান। ফলে নস্কর বদলি হয়ে যান চুঁচুড়ায়। কিন্তু কি যে মধু সেই শহরে কে জানে, তাই সেখানে আসা যাওয়া চলতেই থাকে। তবে কেবলমাত্র রবিবার। ভোর থেকে নার্সিং হোমে রুগী বোঝাই থাকে। ডাক্তার আসেন ভোর সাড়ে ছটার সেই প্রথম ট্রেনে, সঙ্গে থাকে এক দুষ্টুমিষ্টি-মার্কা নার্স। তাঁরা এসেই ছাখেন

রুগীদের নম্বরী টোকেন দেওয়া হয়ে গেছে। সবকিছু কণ্ট্রোল করছে পাড়ার মস্তানরা। ডাক্তারবাবু তাদের সান্ধ্য চুল্লুর টাকা দেবেন যাবার সময়। কাউকে দেবেন নেশার নিষিদ্ধ বড়ি প্রোড্রোম কিংবা রেসট্রিল। তারা তাই লেগে আছে। দুষ্টুমিষ্টি নার্সের সঙ্গে সুযোগমত একটু আধটু আকচা-আকচিই বা মন্দ কি? অভিমানী যৌবন ব'লে কথা।

সন্ধের দিকে নস্কর ডাক্তার পেটমোটা ব্যাগ ভ'রে একজন মস্তানের সঙ্গ নিয়ে নিশ্চিন্তে ফেরার ট্রেনে ওঠেন। হোম, সুইট হোম। না, সেই এঁদো বেহালার নফর দাসের গলি নয়, সল্টলেক সিটির ক্রমবর্ধমান নাগরিক ঔজ্জ্বল্যে।

শুধু নস্কর ডাক্তার কেন, মফস্বলে সরকারি ডাক্তার মানে যাকে বলে 'নেসেসারি ইভিল'। কারুর খেতাব গাইনো, কেউ চাইল্ড, হার্ট স্পেশালিস্ট কেউ, কেউ সার্জন, কেউ মেডিসিনের লোক, কেউ অর্থোপিডিক। সকলের লক্ষ্যই টাকা। 'সরকারি ডাক্তার? ওরে বাপরে বাপ, ডাকাত' এই হলো দিব্য পালের মত বহুজনের ভাষ্য। তাঁদের দাপটে আর পশারে শহরের ঘরোয়া ডাক্তারবাবুরা যাকে বলে কেঁচো।

কিন্তু সবাই তো কেঁচো নয়, কেউ কেউ ফণাও ধরতে পারে। তেমনই একজন এই নৃসিংদা, অর্থাৎ মহকুমা শহরের ঘোষাল পাড়ার ডাক্তার নৃসিংহ প্রসাদ অধিকারী, সংক্ষেপে সবার মুখে মুখে নৃসিং ডাক্তার বা নৃসিংদা। হাসিখুশি আমুদে পরোপকারী। রাতবিরেতে ডাকলে হাজির। তবে হ্যাঁ, সরকারি ডাক্তারদের মতো হাসপাতালে সিট দেবার খ্যামতা নেই, আর সবচেয়ে বড়কথা, চেনা লোকের কাছে কেউ কি গর্ভপাত করায়? 'ও সরকারি ডাক্তারই ভাল, কাউকে চেনে না, আজ আছে কাল নেই' পাবলিকের এই হলো অনুক্ত মতামত।

কাজেই নৃসিংদার মত ডাক্তার কেবলই চোট খায়। পশার হয় না। তো একবার নৃসিংদা রুখে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, ঠিক হ্যায়, পশার না হোক প্রতিপত্তি হ'তে দোষ কি? নিজের এলেম দেখাতে নেমে পড়লেন মফস্বলে।

নিজের উদ্যমে ঘোরাঘুরি করে প্রথমে হলেন মহকুমা রেডক্রশের সম্পাদক। পাবলিক ওয়ার্কের নেশা চাগলো। ক্রমে হলেন কমিশনার, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা-সভাপতি, সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অবৈতনিক পরামর্শদাতা চিকিৎসক। রুলিং পার্টির মদৎ থাকলো ভেতর ভেতর। নিশ্ছিদ্র পাকা ব্যবস্থা। সারাদিন মটর সাইকেলে টো টো। নৃসিংদা বনে গেলেন পাক্কা ভি. আই. পি। সবাই সমীহ করতে লাগলো। কমিশনার হিসাবে তিনি বদন সাহার নার্সিং

হোমের ভ্যালুয়েসন বাড়ালেন। তার কার্যকলাপ নিয়ে ভিজিলেন্সে যোগাযোগ করলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে সরকারি ডাক্তাররাও রক্তচোষা বাদুড়স্বভাব ছেড়ে নৃসিংদাকে তোয়াজ করতে লাগলেন। নস্কর ডাক্তারের মস্তানবাহিনী শলাপরামর্শ আঁটতে লাগলো কী করা যায়। এমনিতে বেশ পপুলার ফিগার নৃসিং ডাক্তারের, তাই ঝাড়পিটে উল্টো উৎপত্তি হবে।

তারপর কোথা থেকে কি হলো কে জানে। ওয়ান ফাইন মর্নিং পুলিস এসে বাড়ি থেকে নৃসিংদাকে ধরে নিয়ে গেল। সারা শহরে হৈ চৈ। কি কাণ্ড, নৃসিং ডাক্তার গ্রেপ্তার? কেন? নৃসিংদাব কাছে ভোটে হেরেছিলো শহরের উগ্র সাংবাদিক মনোজ চাকলাদার। সুযোগ বুঝে সে তার 'কড়া চাবুক' কাগজে লিখে দিলো: 'দুর্নীতির দায়ে ডাক্তার গ্রেপ্তার।' আঠারো পয়েন্টের টাইপ। কিন্তু মফস্বলের প্রেস তো, কাজেই 'র্নী' হরফ হয়ে রইলো বিশ্রি রকম রংফন্ট।

কিন্তু ঘটনাটা কি যাতে জামিনও মিললো না? পরে জানা গেল কীর্তিটি কে বা কাহার তা স্পষ্ট না হলেও দায় প'ড়েছে নৃসিংদার কপালে। রেডক্রশের সেক্রেটারি ব'লে কথা। অভিযোগ এই যে পঁচিশ পেটি প্রোটিন বিস্কুট পাওয়া গেল পাশের গঞ্জের দোকানে। আনন্দচন্দ্র আর বদন সাহার মস্তানদের মদৎ পেয়ে দোকানদার পুলিসকে বললো নৃসিংদা তাকে বিস্কুট বেচেছেন।

ব্যাস, দুই আর দুইয়ে চার। কে যে রাতারাতি রেডক্রশের গুদাম থেকে পেটি পেটি বিস্কুট নৃসিংদার শ্বশুরের পরিত্যক্ত গ্যারেজে সরালো কে জানে। কিংবা হয়ত সবাই জানে, কিন্তু ঐ যা স্বভাব, মফস্বলে হঠাৎ সবাই নির্বিকার ন্যাকা সেজে যায়। মওকা পেয়ে সরকারি ডাক্তাররা জনে জনে বলতে লাগলেন, 'ছি ছি, মানুষের সেবাধর্ম না ক'রে চুরি? রেডক্রশের মাল বিক্রি? পশু, অমানুষ। এক্ষুনি ডাক্তারি লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত।'

সুযোগ বুঝে নস্করের মস্তানবাহিনী নৃসিং ডাক্তারের বাড়ির সামনে ঢোল সহরৎ আর নাচন কোঁদন খুব করলো। নৃসিংদার একমাত্র ছেলে কলেজ পড়ুয়া সৌম্য প্রতিবাদ করতেই মস্তানরা তাকে ন্যাংটো ক'রে মাথায় ঘোল ঢাললো।

এতেই পটভূমি গেল কেঁপে। বিচারে নৃসিংদার হলো দুবছরের জেল আর সৌম্য হয়ে গেল মস্তান। যাকে বলে টপ গুণ্ডা। নস্কর ডাক্তার একদিন খামোকা চোখ রাঙানি চিঠি পেলেন। তাঁর দুষ্টুমিষ্টি নার্সকে একদিন কারা যেন ডলাই মলাই ক'রে দিলো। উঠে গেল বদন সা'র নার্সিং হোম। তার মস্তানদের সঙ্গে সৌম্যদের একদিন মোকাবিলা হয়ে গেল। সৌম্যরা তাদের এলাকা ছাড়া ক'রে দিলো।

সৌম্যের ভয়ে সবাই তটস্থ। দোকান থেকে তোলা তোলে। সাগরেদদের নিয়ে ঘোরে, রক্ত চক্ষু। চোখপসন্দ টিনএজারদের ফুসলায় প্রকাশ্যে। মাঝে-মাঝে ধুমধাড়াক্কা গোলমাল বাধে। বোমাবাজি চলে। সৌম্যগুণ্ডাকে এবেলা যদি পুলিস ধ'রে নিয়ে যায় তবে বিকেলবেলাই তাকে আবার রুস্তমের ভঙ্গিতে রাস্তায় দেখা যায়। কোন্ মন্ত্রবলে সে ফিরে আসে কেউ জানে না। তার শাসানিতে সবাই শংকিত থাকে।

দেখতে দেখতে দু'বছর কেটে যায় কোথা দিয়ে। একদিন নৃসিং ডাক্তার ফেরেন শহরে মাথা নিচু ক'রে। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকেন। বসেন চেম্বারে সকাল বিকেল। রুগী নেই। পুরোনো বন্ধুবান্ধব দুয়েকজন আসেন। চারদিকে তাকিয়ে বলেন সৌম্য-র কাণ্ড কারখানা। 'সৌম্যকে সামলাও নৃসিং'।

শুনতে শুনতে নৃসিং ডাক্তার খেপে ওঠেন। মূলে তো মানুষটা সচ্চরিত্র তবে দারুণ একরোখা, রগচটা। দশচক্রে আজ তাঁর এই হাল। তক্কে তক্কে থাকেন। কিন্তু ছেলে তো আদ্ধেক দিন বাড়ি ফেরে না। যদি বা মধ্যরাতে বেসামাল কদাচিত ফেরে তাকে আড়াল রাখেন তার গর্ভধারিণী।

অবশেষে এক মধ্যরাতে বাবা-ছেলেতে দেখা। পুরোনো মেজাজে হাণ্টার হাতে একতলায় নেমে এলেন নৃসিংহ। চড়াসুরে বললেন, 'এ সব কি শুনছি দিন-রাত তোর নামে? ভেবেছিস কি? চাবকে লাল ক'রে দেবো।'

সৌম্য ঠাণ্ডা চোখে বাপের দিকে চেয়ে বললো, 'হাণ্টার নামাও। চোরের ব্যাটা কি মন্দিরের পুরুত হবে, অ্যাঁ?'

* * * *

হাকিম আর ডাক্তারদের পরে যদি মফস্বলের কোন চরিত্র মনে টোকা মারে তবে তাঁরা হলেন সাংবাদিক। তাঁদের কান ঘেঁষে আছেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীবৃন্দ। মফস্বলে তাঁরাও এক একটি চরিত্র বিশেষ। সাহিত্যিকদের কথাও উঠতে পারে তবে তাঁরা লাজুক আর সংখ্যালঘিষ্ঠ। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রসঙ্গ থেকেই সাহিত্যিকদের আভা ফুটে উঠবে কারণ এসব জায়গায় বেশিরভাগ সাংবাদিক মানেই সাহিত্যিক। মকৃসো ক'রে দুয়েকটা বই লিখেছেন, ছেপেছেন নিজেরই পয়সায়। আমলা বা ভি. আই. পি-দের সেই বই এক কপি সগর্বে উপহার দেন। প্রকাশ্যে আশপাশের চামচাদের বলেন, 'কলকাতায় না থাকলে কি সাহিত্যে নাম করা যায়?' শহরের নানা সাহিত্য সভায় তাঁদের আমন্ত্রণ থাকে, তরুণ কবির কবিতাপাঠ শুনে ব'লে ওঠেন 'বেশ' 'বেশ'। ছোটখাট গ্রামেগঞ্জের

সাহিত্য সভা উদ্বোধন করতে খুব উৎসাহ। সেখানে মঞ্চে ব'সে ফ্রক-পরা খুকুর হাত থেকে গভীর আন্তরিকতায় মালা নিতে মাথা নিচু করেন। তারপরে সাহিত্য সম্পর্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। সেই ভাষণ নিজেরই সম্পাদিত কাগজে ছাপেন। এই হলো একটা মফস্বলী আর্কিটাইপ।

তাই ব'লে সবাই কি এরকম? ভ্যারাইটি আছে। রাগী সাংবাদিক আছেন, সবকিছুর মধ্যে দুর্নীতিখোঁজা সাংবাদিক আছেন, শাসকদলের সমর্থক সাংবাদিক যেমন আছেন তেমনই এসটাবলিশমেণ্টবিরোধী সংগ্রামী সাংবাদিক আছেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার নামী কাগজের সঙ্গে যুক্ত সংবাদদাতার একটু আলাদা পজিশন আর মফস্বলে যে-সাংবাদিক দু'কলম শুদ্ধ ইংরাজি লিখতে পারেন তিনি সাংবাদিক কুলভূষণ। একজন তো বাইরের ঘরে ব'সে সর্বদাই খটখট খটখট টাইপ ক'রে চলেছেন। বলেন, 'আমরা বৃটিশ আমলের গ্র্যাজুয়েট, ইংরিজিটাই ভাল আসে।' অন্যরা তাঁকে সমীহ করে।

আজকাল হাজার হ'লেও পাবলিসিটির যুগ তাই সবাই এঁদের রেয়াত ক'রে চলে। বিধায়কদের কাছে অবারিত দ্বার। জেলার কৃষিবিভাগের আমলারা গাড়ি পাঠিয়ে এঁদের নিয়ে যান, ভাল ক'রে খাইয়ে দাইয়ে বলেন, 'উচ্চফলনশীল এই পাটবীজটার কথা একটু ফলাও ক'রে লিখবেন' কিংবা 'এই নতুন রুর‍্যাল হেল্‌থ সেণ্টারের খবরটা যেন অ্যাডিকুয়েট রকম পাব্লিসিটি পায় দেখবেন'। জেলার তথ্য আধিকারিক সর্বদা লোকাল করেসপণ্ডেণ্টদের প্রীত করতে বিব্রত, নইলে আবার তথ্যমন্ত্রী বা তথ্যঅধিকর্তার কান ভাঙাবে। তাহলেই চিত্তির।

যুবকরা পর্যন্ত এঁদের তোয়াক্কা করে, কেননা অবরে-সবরে তাদের ক্লাবের ফাংশন হ'লে কলকাতার বড় মেজ সেজ যেকোন কাগজে খবরটুকু বার করতে হবে তো। সবাই বুঝে গেছে কাগজে কোন অনুষ্ঠানের খবর ছাপার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হ'লো সাংবাদিককে সভাপতি নিদেন প্রধান অতিথি করা। মফস্বলের যেকোন সভায় গেলে দেখা যাবে উদ্যোক্তারা খুব সম্ভ্রম সহকারে সাংবাদিকদের সামনের চেয়ারে বসাচ্ছেন, হেঁ হেঁ করছেন, খাবারের প্যাকেট দিচ্ছেন। তবে সর্বদা যে তাতে চিঁড়ে ভেজে তা নয়।

কেননা সবাই তো সব ফাংশনে যান না। একেকজন তেরিয়া টাইপের সাংবাদিক সভাসমিতিতে কোথাও যান না। নিজস্ব সূত্রে খবর জোগাড় ক'রে ঝাঁঝালো রিপোর্ট ছাপেন। ভয় তাঁদের নিয়ে। শহরে তারাপদবাবু ব'লে এক পুরোনো সাংবাদিক ছিলেন, এখন প্রয়াত। তাঁর একটা কথাই ছিল, 'দিনু এক

খোঁচা'। অর্থাৎ যেকোন খবরের শেষে উদ্যোক্তাদের একটু খোঁচা না দিয়ে তিনি রিপোর্টিং করতেন না কখনও। তাঁকে সবাই বলতো খোঁচাবাবু।

সদর শহরের সাংবাদিকরা হলেন কুলীন। তাঁদের হালচাল আলাদা। সব খবর সর্বদা তাঁরা আগে পান। জেলার আমলারা সর্বাগ্রে তাঁদের ডাকেন। এরজন্যে মহকুমা আর ছোট জায়গার সাংবাদিকদের একটা চাপা ক্ষোভ আছে। তবে সদরের সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষ নেই। জেলাশাসক, এস. পি আর সদর এস. ডি. ওর কাছাকাছি থাকার তাঁদের অলক্ষ প্রতিযোগিতা দেখবার মত। কেননা ঐসব দেবতাই সংবাদ ও ক্ষমতার উৎস। এ নিয়ে একটা মজার গল্প আছে।

ধরা যাক এক জেলা শহরে ক বাবু খ বাবু আর গ বাবু তিন নৈকষ্য কুলীন খবরের কাগজের সাংবাদিক। এখন হয়েছে কি, সে সময়ে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে সদরে নতুন এক জেলাশাসক এসেছেন। সুদর্শন, অভিজাত আর উন্নাসিক লোকটি আবার আই. সি. এসের ব্যাটা আই. এ. এস, তাই মেজাজী। ক্যালি অলা লোক, সহজে খুদে সাংবাদিকদের পাত্তা দেবেন কেন? সাংবাদিকরাও নাছোড়। ডি. এম ব'লে কথা। তাঁর সঙ্গে আগে কার পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হবে সেটা ভাইটাল ব্যাপার। সকালে উঠে ক বাবু ফোন ধরেন, 'হ্যালো ডি. এম সাহেব আছেন নাকি? ঘুমোচ্ছেন? অ'। সুবিধে হলো না।

খ বাবু ধূর্ত। ফোন করেন একটু বেলায় মিসেস ডি. এমকে, 'হ্যালো, মিসেস···? সাহেব কোথায়? আমি খ বাবু। হ্যাঁ হ্যাঁ। একটু ডেকে দেন যদি। কি বললেন? বাথরুমে? দেরি হবে? অ'। মোট কথা পাখি সেয়ানা। ধরা দেবার গতিক নয়।

ব্যাপার স্যাপার বুঝে গ বাবু তাঁর গিন্নিকে পাঠালেন মিসেস ডি. এমের কাছে। তিনি সেঁধিয়ে গেলেন অন্দরে। মিসেসের ঘর গুছোনোর প্রশংসা করলেন। বাড়ির তৈরি সরতক্তি উপহার দিলেন। আর লক্ষ করলেন শ্রীমতীর একটু ধর্মের বাই আছে, ঠাকুরঘরটি পরিপাটি।

হাজার হলেও সাংবাদিকের ঘরণী কাজেই খবর সংগ্রহে দক্ষতা থাকবেই। ক্লু পেয়ে গেলেন গ বাবু। প্ল্যান হয়ে গেল। দুদিনের মধ্যে সরস্বতী পুজো। পরদিন গ বাবু সস্ত্রীক দুপুরে চলে গেলেন ডি. এম বাংলোয়। তখন সাহেব কালেক্টরেটে অফিস করছেন। কাজেই বাংলোয় নেই।

শ্রীমতী গ ঢুকে গেলেন অন্দরে। একটু পরে অভিজাত সুন্দরীটি নেমে এসে বললেন, 'ওপরে চলুন, দুপুর বেলা এসেছেন, একটু মিষ্টি জল খান।'

'আবার খাওয়া-দাওয়া কেন' বলতে বলতে গ বাবু উঠলেন ওপরে। উঠেই বললেন 'বাঃ, সর্বত্র রুচির ছাপ'। খেতে খেতে আসল কথা পাড়লেন শ্রীমতী গ। বললেন, 'আমাদের বাড়িতে বহুদিনের স্বপ্নাদ্য সরস্বতী পুজো হয়। আপনারা দুজন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঐদিন আমাদের বাড়ি অঞ্জলি দেবেন, প্রসাদ নেবেন।'

গ বাবুর কেল্লা ফতে। শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য সকালে ডি. এমের গাড়ি ঢুকে গেল গ বাবুর বাড়িতে। গরদের শাড়িতে শ্রীমতী গ এগিয়ে এসে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়ে দিলেন। গোপন নিজস্ব সূত্রে খবর পেয়ে ক ফোন করলেন খ-কে, 'শুনেচেন?'

'হুঁ' সংক্ষিপ্ততম অব্যয়।

এমনতর কত গল্প বাতাসে ভাসে। যেমন শহরের এক হাফ সাংবাদিকের খবরের কাগজে লেখা ছাপার গল্প। বছর দশেক আগের ঘটনা। কলকাতার এক নামী কাগজের এক দামি বার্তা-সম্পাদক প্রেসের গাড়িতে এসেছিলেন বুঝি এদিকে। সন্ধে হয়ে গেছে। রেস্তও ফুরিয়ে গেছে। এ সব ক্ষেত্রে অগতির গতি কাগজের লোকাল করেসপণ্ডেণ্টের বাড়ি। কিন্তু কপাল মন্দ, তিনি নেই। গেছেন হরিদ্বার। উপায়? উপায় হলো গোঁজ। অর্থাৎ এ শহরে এক এলেমদার নতুন সাংবাদিক তাঁদের নামী কাগজে টক্কর দিচ্ছে কিছুকাল। মালিকের কাছেও দরবার করেছে। 'শহরে যেমন নিজস্ব সংবাদদাতা আছেন থাকুন, আমি হব স্যার বিশেষ সংবাদ-দাতা।' একটা দুটো খবর বেরিয়েছেও। বার্তা-সম্পাদক তাঁকে পেয়ে গেলেন। ব্যাস হিল্লে হয়ে গেল। টুরিস্ট লজে খানাপিনা। খরচ সেই গোঁজের। তারপর কিছুসময় পরে বার্তা-সম্পাদকের একটু মৌজ ভাব আসতেই গোঁজ বললে,

: দাদা, নিউজ পাঠিয়ে পাঠিয়ে হেদিয়ে গেলাম। দশটা নিউজ পাঠালে একটা ছাপেন। প্রেস্টিজ থাকে না।

: হবে হবে। আমি দেখব এবার।

: রেগুলার নিউজ বেরোলে স্যার লোকে সমীহ করে। ছোট শহর তো, লোকের ওপর ইনফ্লুয়েন্স থাকে, বোঝেনই তো। জেলার প্রশাসন বা উন্নয়নের খবর ছাপলে ডি. এম. বা এস. ডি. ও থাকে হাতের মুঠোয়।

: হুঁ, আমার হাতে হুঁকো খাবে তাই না?

: আপনার কৃপা সবই। বোঝেনই তো। ছাপোষা সংসার। ছেলে বেকার, মেয়েটার বিয়ে হয় নি। লোকাল ইনফ্লুয়েন্স একমাত্র ভরসা।

বার্তা-সম্পাদকের খোয়ারি ভাঙে আর কি। বলেন, 'কী রকম কী রকম? লোকাল ইনফ্লুয়েন্স থেকে টাকা রোজগার করো কি করে হে?'

: কি এমন আর রোজগার হেঁ হেঁ। এই যেমন ধরুন আমাদের বাসওনার জলধর মোদক একটা রুট পারমিট চান। নতুন বাসরুট চারটে হচ্ছে। খবর পেয়ে আমাকে ধরলেন। আমি ধরলাম ডি. এম.-কে। তিনি ফোন করলেন আর. টি. ও-কে। হয়ে গেল। কাকপক্ষী জানল না। জলধর আমাকে 'পান খাবেন' বলে দু হাজার গুঁজে দিল হেঁ হেঁ, এই আর কি।

: হুম। কিন্তু আর. টি. ও. কেন দিল বিনা ঘুষে?

: আমি যে স্যার ওনার আর তিনটে ঘুষ নেবার নিউজ জানি, সেকথা তো জানাচ্ছি না কাউকে। আমারও ছোট একটা চার পাতার কাগজ আছে তো!

: সেটার আবার কোন্ ধান্দা?

: ধান্দা নয়, অস্ত্র। চলে যায়। প্রশাসনকে তোয়াজে রাখি। রুলিং পার্টির এম. এল. এ, এম. পি, আর জেলার মন্ত্রীর খবর ছাপি। নিশ্চিন্ত।

: কী রকম?

: সারা বছরের সব রকম সরকারি বিজ্ঞাপন বাঁধা আর আদালতের নিলাম-ইশতাহার! ভালো রোজগার। আবার দেশসেবা। কি বলেন?

: হুঁ, তুমি তো মহা ঝান্টু। তো ডি. এম নিশ্চয়ই ঘুষ খায় না। তাকে পটাও কি করে?

: হেঁ হেঁ, ঐজন্যেই তো আপনাদের নেকনজর লাগে। এই যেমন গতবারের চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনীতে আমি ছিলাম জাজ। ডি. এম-ই করেছিলেন। আমিও মিসেস ডি. এম.-এর ফুলকে ফার্স্ট প্রাইজ দেওয়ালাম। তার পর তাঁর সেই ফুল নিয়ে সাফল্যের হাসির ফটো বেরলো আপনার কাগজে চার পাতায়। কি বুঝলেন?

: তুমি তো মহা মিচকে হে।

রিপোর্টার বললেন, 'আরো আছে স্যার। এস. ডি. ও-র ছেলের প্রাইভেট টিউটর জোগাড় করে দেওয়া, এগ্রিকালচার অফিসারের বউয়ের জন্য ঝি এনে দেওয়া, বি. ডি. ও-র মেয়েদের রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে নাচানো, এমন-কি ছোকরা ডেপুটির...'

'অ্যাঁ, ছোকরা ডেপুটির মেয়ে জোগাড় করো নাকি?' সম্পাদক উত্তেজনায় উঠে বসেন।

: না না, মেয়ে নয়। কাব্যিরোগ। আধুনিক কবি তিনি। কিন্তু শুনছে কে তার কবিতা ? তাই কারুর না কারুর বাড়িতে সাহিত্য-সভা ডাকি। কলেজের বাংলার অধ্যাপকদের ডাকি। ইস্কুলের গানের দিদিমনি গান করেন। মেয়েরা নাচে। আর সভান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ।

'বাঃ বাঃ বেশ' বার্তা-সম্পাদক তারিফ করে বলেন, 'তোমার এলেম আছে। এখন বলো তো আমার পেছনে এত ভোগ চড়ালে কেন ? সে কি শুধু নিউজ ছাপা ? মনে তো হয় না। বলো বলো, তোমার আসল ধান্দাটা বলো দেখি।'

হাত কচলে রিপোর্টার বলেন, 'চিরকাল দাদা শিশু-সাহিত্যিক হয়ে রইলাম। আমাদের এখানকার একজন প্রবীণ অধ্যাপক আমাকে সেদিন ব্যঙ্গ করে বললেন, "কি মশাই, সবাই যে শিশু-সাহিত্যিক বলে আপনাকে, সে শিশু কি বিশেষণ অর্থে ?" বুঝুন কতখানি দুঃখ আমার। তো আমি বলছিলাম কি আপনাদের কাগজে রবিবারের সাহিত্যের পাতায় যদি একটা গপ্পো ছাপিয়ে দিতেন আমার।'

'গপ্পো ? তোমার ? বলো কি হে ? একি জলধরবাবুর রুট পারমিট না এগ্রিকালচার অফিসারের ঝি ? ভেবেছ কি ? ও-সব হবে না।'

রিপোর্টার দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আপনিই তো কাগজের আসল লোক। আপনি চাইলে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে।'

চুরুট দাঁতে চেপে সম্পাদক বলেন, 'পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করানো যায় কিন্তু তাই বলে তোমাকে লেখক বানানো ? ইম্‌পসিবল্। তবে হ্যাঁ, একটা ফিচার-টিচার দিতে পারো।'

সঙ্গে সঙ্গে ফোলিও ব্যাগ থেকে বেরলো একবাণ্ডিল জলন্ত ফিচার। সম্পাদক নিমীল চোখে বললেন, 'টপিকগুলো বলে যাও।'

: বিলক্ষণ। তবে শুনুন—'এত বধূহত্যা কেন ?' 'মফস্বলের ছোট পত্রিকার সমস্যা', 'আমার চোখে উত্তমকুমার।'

: এগ্রিকালচারের ওপর ফিচার নেই ?

: বিলক্ষণ। এগ্রিকালচার থাকবে না তাই কি হয় ? শুনুন তবে এগ্রি-কালচারের টপিক। কিন্তু তার আগে একটু ধর্মের টপিক শুনবেন না ?

: হ্যাঁ বলো তো। ধর্মটর্ম আজকাল কাগজে খুব খায়। বলো বলো।

: হ্যাঁ এই যে শুনুন—'নারী ধর্মসঙ্গিনী না নর্মসঙ্গিনী ?' 'শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত আর নিত্যানন্দের সমাধি নেই কেন ?'

চড়াৎ করে উঠে বসলেন সম্পাদক, 'দারুণ বিষয় তো ? এসব কি এমনই

এমনই লিখে রেখেছ ছাপবার কথা না ভেবেই ? ধরো, আজ যে আমি আসব, এ তো তুমি জানতে না।'

: না দাদা। এ-সব ধর্মের প্রসঙ্গ লিখি আকাশবাণী আর দূরদর্শনের জন্যে।

: তাই নাকি ? বাঃ, কিন্তু শুনেছি ওখানে চান্স পাওয়া কঠিন ?

: আজ্ঞে কঠিন আবার গ্যাসীয়। অর্থাৎ ব্যাপারটা জলবৎ তরল।

: বাঃ বাঃ, তোমার কথার তো বেশ ভাঁজ আছে। তা ওখানে গ্যাসদানের তোমার নিজস্ব পদ্ধতি কি ?

রিপোর্টার একগাল হেসে হেসে বললেন, 'ডাইরেক্টার, প্রোগ্রাম এক্জিকিউটিভ আর প্রড্যুসারদের এক প্যাকেট সন্দেশ উপহার আর সেইসঙ্গে আমার চারপাতার কাগজে ঐ-সব ব্যক্তির ফটোসহ পরিচিতি ছাপা। তাতেই কর্ম ফতে।'

: কি রকম ?

: আরে মানুষ তো ? তেলে কে না ভেজে ? চক্ষুলজ্জা আছে না ? লিখে দিই ইনি সুদক্ষ আর সৎ অফিসার, নিরপেক্ষ ও সুযোগ্য। এঁর নিয়ন্ত্রণে আকাশ-বাণী / দূরদর্শন অত্যন্ত জনপ্রিয় হচ্ছে, প্রোগ্রামে বৈচিত্র্য আসছে। ব্যাস, পত্রিকার ঐ সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন, 'ছি ছি, এসব লিখেছেন, লজ্জা করে। আমি সামান্য মানুষ।' এই-সব ব'লে একটা টক বা প্রোগ্রাম দিয়ে দেন। ধর্মের টপিক এসব ক্ষেত্রে বেশ লাগসই। দেখুন দাদা, আমরা হলাম মফস্বলের মাল। কলকাতায় যাই ব্লটিং-এর মতো, যা পাই শুষে নিয়ে আসি। গাড়িভাড়াটা তুলতে হবে তো ?

'হুঁ' বার্তা-সম্পাদক বললেন, 'তা হলে আমার পেছনে যে-সব খরচ করলে, তার দরুণও তোমাকে কিছু পাইয়ে দিতেই হয়। তা এগ্রিকালচারের ফিচার কি আছে তৈরি বলো দেখি ?

: ছি ছি লজ্জা দেবেন না এভাবে। সবাই কি সমান ? তা ছাড়া আমি হলাম আপনাদের বিশেষ সংবাদদাতা। যাক গে, শুনুন তা হলে—'কলাগাছ ফেলবেন না,' 'ধানের তুঁষ থেকে তেল তৈরির সম্ভাবনা', 'গর্ভমোচা খেলে কি জন্মনিয়ন্ত্রণ হয় ?', 'খেজুর গাছ : অনেক সম্ভাবনা'।

: অ্যাঁ কি বললে ? খেজুর গাছ ? ক-পাতার লেখা ?

: ছোট্ট, চার পাতা।

: তা হলে ঐটেই দাও। কেটেছেঁটে রস বের করে নেব।

এভাবে যে হঠাৎ নবেন্দুর সঙ্গে চমকপ্রদ সাক্ষাৎকার হবে এবং অমন ঝটিতি অন্তর্ধান তা আগে বুঝিনি।

ব্যাপারটা খুলে বলার আগে একটু অন্য প্রসঙ্গ সেরে নিই। সেটা প্রাসঙ্গিক। কথাটা উঠেছে সহপাঠীদের নিয়ে। মফস্বল মানে ছোট জায়গা। স্কুল কলেজে যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করেছি তারা অনেকে কে কোথায় ছটকে গেছে জানি না। অনেকের নামও তো মনে নেই। কিন্তু যারা এ শহরেই স্থায়ীভাবে থাকে, এখানেই জীবিকা বা ঘরসংসার তাদের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে বলা মুস্কিল। অর্থাৎ মফস্বলে সহপাঠীরা একটা জ্বলন্ত সমস্যা।

কলকাতায় সহপাঠীদের নিয়ে সমস্যা কম। বিরাট শহর, ছড়ানো অক্টোপাশের মত। কার সঙ্গে যে কতকাল পরে দেখা হবে কেউ জানে না। হয়ত পুরীর সমুদ্র-তীরে দুই গিন্নীর মধ্যে আলাপ হলো। তারপর তাদের যৌথপ্রয়াসে স্বর্গদ্বারের রাস্তায় যখন দুই কর্তার আলাপ হলো তখন দুজনেই চমকে একসা। 'আরে, আমরা একসঙ্গে পড়তাম যে স্কটিশে। নামটা মনে নেই। তা তিরিশ বছর হয়ে গেল, তাই না?'

: হ্যাঁ। আমি বিমল সমাদ্দার। তোমার মানে আপনার নাম···যদ্দুর মনে পড়ছে···

: আবার আপনি-আজ্ঞে কেন। আমি সুজন সেনগুপ্ত। গ্রিণ্ডলেজে আছি।

: আমি জার্ডিন হেণ্ডারসনে।

দুই গিন্নি আর ছেলেমেয়েরা থ।

কিংবা ধরা যাক কলকাতার কোন বিয়ে বাড়িতে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক প্যাণ্ডেলে ব'সে তাঁর কলেজ-পড়ুয়া মেয়েকে বললেন, 'বুঝলি তৃণা, ঐ যে প্যাণ্ডেলের কোণে একজন জেন্টলম্যান কেবলই আমার দিকে তাকাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন ওর সঙ্গে তীর্থপতিতে পড়েছি। তখন খুব গাবলুস ছিল। ঘুগনি খাওয়াতো।'

: বাপি, ইম্‌পসিবল্। ঐ টেকোটা তোমার ব্যাচ মেট? আন্‌বিলিভেব্‌ল্।

: তোর বাপিরও গ্রে হেয়ার।

: চুপ করো। ঐ বুড়ো আর তুমি?

খানিক পরে টেকো এগিয়ে এসে হাত ধ'রে বলে, 'হ্যালো সুমন্ত্র বোস। অনেক কষ্টে চিনলাম। অনেক ভেবেও প্লেস করতে পারছিলাম না। তীর্থপতির না? কি করছো? ক্যালকাটা ক্লাবে দেখি না তো। এটি কে? কন্যা? গ্ল্যাড টু মিট ইয়ু সুইটি। কল মি ডাট্টা আঙ্কল।'

কলকাতায় বিখ্যাত কলেজে পড়ার বিড়ম্বনা আরেকরকম। ধরা যাক প্রেসিডেন্সী কলেজ। সেখানে পড়ে তো অনেকে, কিন্তু নাম করে আর কজন? যারা তেমন নাম করতে পারেনি, তাদের গ্লানির আর শেষ নেই। একেকজন আবার গাল বাজিয়ে বলে, 'আমরা হলাম অমর্ত্য সেনের ব্যাচ' কিংবা বলে, 'এখনকার ফিনান্স মিনিস্টার অসীম দাসগুপ্ত আমার সহপাঠী।' অধ্যাপকরাও এই সব ছাত্রদের সনাক্ত করেন, 'তুমি যেন কাদের সঙ্গে পড়তে? ও হো, তোমাদের বার তো কেতকী কুশারী ফার্স্ট হয়েছিলো, তাই না?'

এসব শুনে কি ভদ্রসন্তানদের আত্মপ্রসাদ বাড়ে নাকি হাড়পিত্তি জ্বলে যায়, কে জানে। তবে আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, এখন ব্যবসায়ী, কোন্ তম্য যুগে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁর এক বাঁধা কাজ হলো সত্যজিতের ছবি রিলিজ করলেই প্রথমদিন সেটি দেখা। তারপরে ফোন তুলে অন্তরঙ্গভাবে বলেন, 'কে সত্যজিৎ? আমি কেশব বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রেসিডেন্সী। উফ্, সে সব গুড ওল্ড ডেজ। হ্যাঁ, যার জন্য ফোন করা। স্প্লেনডিড, সুপার্ব। মানে আজকেই ছবিটা দেখলাম কিনা!'

সত্যমিথ্যা জানিনে। কেশববাবু কিন্তু এই সত্যজিৎকে ফোন করার গল্প বলবেনই।

মফস্বলে কিন্তু সময়বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে সহপাঠীরা এক জাগ্রত সমস্যা। যাদের সঙ্গে একদা পড়েছি তাদের অনেকের সঙ্গে দেখা হলেই সংকট। কেমন যেন এড়িয়ে-যাওয়া সম্পর্ক, ওপর ওপর। কারণ সবাই তো প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি। কেউ কেউ জীবনযুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছে। যেমন ধরা যাক সুধাবিন্দু এখন লরী ড্রাইভার, মনমোহন বাসের কণ্ডাকটার। তাই সুধাবিন্দুর সঙ্গে কোথাও দেখা হলে রাস্তার অন্য পাশ ধ'রে মুখ নিচু ক'রে দ্রুত পা চালায়। একদিন দূরপাল্লার এক বাসে উঠে দেখি মনমোহন কণ্ডাকটার। সারা রাস্তা কাছে এলো না, টিকিটও নিলো না। বাধ্য হয়ে নামবার আগে ভাববাচ্যে বললাম, 'টিকিটটা কাটা হয়নি যে।'

ভাববাচ্যে জবাব এলো, 'কদ্দুর যাওয়া হবে?'

: কীর্নাহার।

: টিকিট কাটার দরকার নেই।

কে বলবে আমি আর মনমোহন ইস্কুলে তুইতোকারি করতাম। মনমোহনের মনে হয়েছে কি দুব্‌লা এই সহপাঠী কত মার খেয়েছে ওর হাতে? কতবার কাঁচা আম এনে খাইয়েছে?

কিম্বা ধরা যাক ভানুদার কথা। ভানুদা আমাদের সঙ্গে পড়তো। স্কুলের হিরো। টকটকে রং, সুগঠিত। চমৎকার ইংরাজি আবৃত্তি করতো। স্কুলের প্রাইজের দিন ভানুদাকে দেখে কে? তখন আমি তো রোগা প্যাংলা। ভানুদা আমাদের চেয়ে বয়সেও একটু বড়, স্বাস্থ্যও চমৎকার। তার ওপরে প্যারালাল বার আর রিঙের খেলায় ওস্তাদ। তাকে দেখলেই হীনমন্যতা জাগতো কেমন যেন। সম্ভ্রম নিয়ে কথা বলতাম। ভানুদা করুণা ক'রে দুয়েকটা কথা বললেই সবাই কৃতার্থ। এহেন ভানুদা ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কোথায় যে চলে গেল।

সেই ভানুদার সঙ্গে গতবার হঠাৎ দেখা ফৌজদারি কোর্টের কাছে। কেমন যেন মলিন। তবু উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ভানুদা না? কেমন আছ?'

আমার উষ্ণ হাত আড়ষ্টভাবে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে ভানুদা অপরাধীর মতো মাথা নিচু করলো।

আমি বললাম, 'কি ব্যাপার ভানুদা? এমন করছো কেন?'

'আর ভাই, তোমাদের সঙ্গে আমার কি কথা বলা সাজে?' ভানুদা বলে।

: আমরা মানে?

: মানে তোমরা যারা জীবনে সফল, প্রতিষ্ঠিত। কত ব্রাইট ফিউচার।

: কি আর এমন? সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করি। তাতেই তোমার মতো মানুষ সংকোচে কুঁকড়ে যাচ্ছো। আচ্ছা, সত্যি ক'রে বলোতো ভানুদা, আমাকে এতদিন পরে দেখে তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

: সত্যি কথা বলতে কি ভাই, তুমি যে আমাকে চিনতে পেরেছো, কথা বল্‌ছো এতেই আমি কত গর্ব বোধ করছি।

: সে কি ভানুদা তুমি যে আমাদের হিরো ছিলে!

'এখন জিরো' ব'লে ভানুদা দ্রুত চলে গেল।

পরে খবর নিয়ে জানলাম ভানুদা ম্যাট্রিকের পর এগোতে পারেনি। নানা ঘাটের জল খেয়ে এখন ফৌজদারি কোর্টে উকিলের মুহুরী। ছাপোষা মানুষ।

কিন্তু আমি আসলে বলতে চাইছি নবেন্দুর কথা। নবেন্দু দাস। সেও তো আমার স্কুলের সহপাঠী। ছিল গলায় গলায় ভাব। বসতাম এক বেঞ্চিতে। দুজনে মিলে ক্লাস এইটে একটা কিশোর উপন্যাস লিখে ফেলেছিলাম। নবেন্দু ছিল গরীব তবে মেধাবী। তার বাবা বাজারে রেস্টুরেন্ট খুলেছিলেন। কোন রকমে চলতো। ক্লাসের ছেলেরা চ্যাংড়ামি ক'রে নবেন্দুকে খেপিয়ে বলতো 'এই নবা, তোর

বাবাকে বলবি ভাল ক'রে মাংস রাঁধতে' কিংবা 'হ্যারে নবা, তোরা কি কুকুরের মাংস দিয়ে চপ করিস ? কি শক্ত।' শুনে অপমানে নবেন্দুর ফর্সা টকটকে মুখ রাঙা হয়ে যেত। আমার মতো রোগা প্যাংলা ছেলে নবেন্দুর পক্ষ নিয়ে ঘুঁষি চালিয়ে দিতাম, পরে অবশ্য চারগুণ মার খেতে হ'তো। এরজন্যে নবা আমাকে খুব আগলাতো, কান্নাকাটি করতো।

কপাল এমন যে অমন মেধাবী নবার পড়া ক্লাস নাইনেই শেষ হয়ে গেল। তার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। দাদা ব্যবসা তুলে দিলেন। নবা গেল তার মামার বাড়ি। তাঁদের ব্যবসা ছিল। নবা সেখানে কর্মচারী হলো।

এরপর আর যোগাযোগ থাকেনি। ম্যাট্রিকের পর আমার জীবনও তো পালটে গেছে। প্রথমে স্কুল ছেড়ে কলেজ জীবনের রোমাঞ্চ। নতুনতর সহপাঠী-সহপাঠিনী। অধ্যাপকদের গ্ল্যামার, পাঠ্যজগতের প্রসারণ। কলেজ জীবনের উঁচু ধাপে উঠে সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে দারুণ বিতর্ক বিসম্বাদ, লেখালেখির চর্চা, লিটল ম্যাগাজিনের উত্তেজনা। এর মধ্যে নবেন্দু দাসের কি কোন স্থান থাকতে পারে ? তাছাড়া সে তো আমাদের শহরেও থাকতো না। মামার বাড়ি কাটোয়া থেকে মাঝে মাঝে আসতো বড়জোর।

ততদিনে আমার কলেজ জীবন শেষ হয়ে ইউনিভার্সিটির জীবন শুরু হয়ে গেছে। সেও এক মস্ত পৃথিবী ! তখন তো আমারই কলকাতা ছেড়ে বাড়ি আসতে ইচ্ছে করতো না। তারপরে পাশ ক'রে দুয়েক জায়গায় বেশ ক'বছর অধ্যাপনা ক'রে অবশেষে সরকারি কলেজের চাকরির নিয়ম অনুযায়ী নিজের শহরের সরকারি কলেজে বদলি হয়ে এলাম। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ সমাদর ক'রে আহ্বান করলো। তারা স্থানীয় উকিল কি ডাক্তার কি শিক্ষক। ততদিনে আমার চেহারা রাশভারী হয়েছে, ছাত্রছাত্রীমহলে একটু আধটু সুনামও কি হয়নি ? স্থানীয় সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ক'রে ছোট শহরে দশের একজন হয়ে উঠেছি বৈকি।

তার ফলে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় একটা আড়ালও তৈরি হয়েছে বুঝতে পারি। সবাই আর তেমন সহজভাবে মিশতে পারে না। সুধাবিন্দু মনমোহনদের কথা আগেই বলেছি। একটা আড়ষ্টভাব যেন। এই সময়ে একদিন নবেন্দুকে সহসাই দেখলাম। সাইকেলে আসছিল, হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে সাঁই সাঁই করে গাড়ি চালিয়ে দিলো। অমন সুন্দর গায়ের রং তামাটে হয়ে গেছে, মাথার চুল কমে গেছে। কি ব্যাপার ? পালালো কেন ?

খবর নিয়ে জানতে পারি তার কাটোয়া-পর্ব অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে।

সাবেক বাড়ির এক অংশে থাকে। কম বয়সেই বিয়ে করেছে। ছেলে বেশ ডাগর। কিন্তু নবেন্দু এখন কি করে? সেটা একটা কষ্টকর পেশা। শহরের দোকানে দোকানে ঘুরে অর্ডার নেয় আর একদিন অন্তর কলকাতা গিয়ে সেসব কিনে আনে। যাকে বলে সাপ্লায়ার। বিস্কুট, ডিম, প্লাষ্টিকের খেলনা, স্যানিটারি সরঞ্জাম হরেক জিনিস। অত রোদে-জলে-ঝড়ে রংটা তামাটে হয়ে গেছে। আহা রে।

তাই বলে যোগাযোগ হয় না, কেননা নবেন্দু এড়িয়ে যায় স্পষ্টত। এ তো একদিনের ব্যাপার নয়। ছোট শহর, মাঝে মাঝেই গলি-ঘুঁজিতে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিই সে কুন্ঠিত হয়ে পড়ে, মুখ মাটির দিকে বা শূন্যের দিকে ক'রে পালায়। ভারি বিরক্ত লাগে। যথেষ্ট বয়স হয়েছে। আচরণটা বেমানান। মরুক গে। আমিও দেখে শুনে আচরণবিধি বানিয়ে নিয়েছি। যে ডাকবে তার কাছে যাবো, যে এড়াবে, তাতেই যদি তার শান্তি, তবে আমি খামোকা কেন মাখামাখি করবো?

ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটেও গেছে, আমারও গা-সওয়া হয়ে গেছে। জীবনে ঘটে গেছে বহু ঘটনা। দেশকালও কি কম বদলেছে?

কিন্তু একদিন হঠাৎ উল্‌টো ব্যাপারটি ঘটে গেল। বাজার করে মিস্ত্রিরদের গলি দিয়ে সর্টকাট করছি, মনটা উদ্বিগ্ন ছিল একটা কারণে, অন্যমনস্ক ছিলাম। খেয়াল করিনি যে নবেন্দু আসছে। ফলে তাড়াতাড়িতে মুখে সেই উদাসীন নির্বিকার ভাবের মুখোসটা পরার সময় পাইনি।

কিন্তু নবেন্দুও তো মুখ ঘুরিয়ে সাঁই সাঁই ক'রে চলে গেল না। বরং সে নামলো সাইকেল থেকে। তারপর সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

কী আশ্চর্য! কত বছর পরে আমি আর নবা মুখোমুখি। তিরিশ বছর হবে। এতদিন পরে তাকে নিরিখ ক'রে দেখলাম। ঘামে মুখ জবজবে, পায়ে প্লাষ্টিকের স্লিপার, পাজামা আর সার্ট। চুল প্রায় ফাঁকা, চোখের নিচে কালি। বয়সের ছাপ পড়েছে।

মুখখানা কিন্তু উত্তেজনায় টগবগ করছে। কিছু কি বলতে চায়? কাটাতে পারছে না কি এতদিনের সংকোচ? অগত্যা আমিই বললাম ভাববাচ্যে, 'কি খবর?'

: ছেলেটাকে ভর্তি ক'রে দিলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে। জুলজিতে অনার্স।

নিমেষে সাইকেলে চ'ড়ে নবেন্দু চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ তার গর্বিত গতিপথের দিকে চেয়ে থাকলাম।

এ শহরে ধর্মের দুটো আলাদা স্রোত আছে। একটা রোমান ক্যাথলিক চার্চকে ঘিরে। ধর্মান্তরিত ক্যাথলিক সব। হিন্দু সমাজে অবহেলিত অবজ্ঞাত কিছু মানুষ দারিদ্র্যে দৈন্যে যখন মুমূর্ষু তখন গ্রামে গিয়ে বিদেশী পাদ্রীরা তাদের ধর্মান্তরিত ক'রে চার্চের আশেপাশে বাস্তু দেয়। তাদেরই উত্তরপুরুষ এরা। শ্রমজীবী। কেউ রিকশা টানে, কেউ শ্রমিক, কেউ বাজারে ফল সবজি বেচে। সারাদিন উদোম খাটনি রাতে দেশী মদ। মাঝরাতে প্রায়ই হল্লা হয়। মুখখিস্তি, অভাবী বউকে ধরে পেটানো। থানা পুলিস পর্যন্ত গড়ায় না অবশ্য, পাদ্রীরা মিটিয়ে দেন। অনুন্নত সব বাড়ি। বেশির ভাগ লোক দেখা যায় জুয়া খেলছে। তাদের সন্তানরা খাদ্য ও শিক্ষা দুটোই পায় না। নেড়ি কুত্তার সঙ্গে পথে পথেই ঘোরে। বেশির ভাগ বাড়িতেই বিদ্যুৎ নেই, টেমি জ্বলছে। দর দর করে ঘামতে ঘামতে নিচু হয়ে দুলে দুলে কেউ বিড়ি বাঁধছে। গরম তেলেভাজার গন্ধ আর মদের গন্ধে উতরোল বাতাস। পাড়ার দু পাঁচটা বয়স্থা মেয়ের হালচাল সন্দেহজনক, ঘোরাফেরা উদ্দেশ্যমূলক। তবু এই ভাবেই চলে যাচ্ছে কয়েক দশক।



বড়দিনে কাগজের শিকলি দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়। ১লা নভেম্বর কবরখানায় সবাই মৃত আত্মীয়দের নামে বাতি দেয়। আসে 'ভস্ম বুধবার', 'ধন্য রবিবার', 'শুভ শুক্রবার'। চার্চের খরচে সে কদিন জেল্লা ফোটে। বাকি সম্বৎসর যে কে

সেই। অভাব, প্রতারণা, মাতলামো, প্রহার, ছিনতাই আর পরচর্চা। মাঝে মাঝেই শুধু যান্ত্রিক নিয়ম মেনে চার্চের টাওয়ার ক্লক থেকে ধাতব ঘণ্টার অভ্রান্ত ধ্বনি।

অমন হাড় জিরজিরে পাড়ার মাঝখানে একখানা বেমানান জাঁকালো তিনতলা বাড়ি পিদ্রু মণ্ডলদের। আগে ছিল মরা গরিব। ছিল বাজারের কসাই। তার বড়-ছেলে পারদীশ অর্থাৎ প্যারাডাইস দুবাইয়ের পাঁচতারা হোটেলে রাঁধুনির কাজ পেয়েছে। ভাইটাকেও নিয়ে গেছে বাবুর্চির পদে। থোক টাকা আসছে বাবার কাছে। তাই দিয়ে এখন বাড়ির রবরবা। পিদ্রু এখন পেড্রো। আশপাশের গ্রামে জমি আর ট্রাকটার। নিজস্ব শ্যালো। তার সঙ্গে মরা সাহেবের ব্যবসা।

প্রথম দিন শুনে চমকে গিয়েছিলাম, মরা সাহেবের ব্যবসা? সেটা কি বস্তু?

বুঝিয়েছিল চার্চের টাইপিস্ট জোনাথন, যাকে আমরা বলি জনার্দন। সেই জোনাথনই আমাকে বলেছিল, 'চার্চের পাদ্রীবাবুরা ইটালিয়ান ভাষায় কী সব চিঠি লেখে। আমরা তা দিনরাত টাইপ করি।'

: সে চিঠির মর্ম কি?

: তা আমরা বুঝি না। ইংরিজি টাইপ তবে ভাষা তো ইটালিয়ান। মনে হয় পাদ্রীরা সাহায্য চেয়ে পাঠায়। আসেও বহু জিনিস।

: কি আসে?

: চিজ, চিজ-বিস্কুট, সসেজ, হ্যাম, গুঁড়ো দুধ আর বহুরকম রেডিমেড পোশাক, বিশেষ করে প্যান্ট সার্ট, নাইলন গেঞ্জি, স্কার্ট-ব্লাউজ এইসব।

: সে সব পাদ্রীরা কি করে?

: খাদ্যবস্তু সব নিজেরা খায়। গুঁড়ো দুধ কিছু বিলোয়। আর পোশাক-আশাক সব গরিব ক্যাথলিকদের দান করে। কিন্তু তারা ওগুলো পরে না। বেচে দেয়।

: কেন?

ভারি রহস্যের হাসি হাসে জোনাথন। বলে, 'আমাদের সকলের বিশ্বাস যে ওসব পোশাক কবরখানা-থেকে-আনা মরা সাহেব আর মেমদের জিনিস। তারা জীবিতকালে যা পরতো তাই ওয়ারিশনরা পাঠায় ইটালি থেকে। দয়ার দান তো? জানেন, ওসব জামা প্যান্টে কেমন যেন একটা গন্ধ লেগে থাকে।'

আমি হেসে বলি, 'এই তা হলে মরা সায়েবের ব্যবসা?'

: হ্যাঁ। পিদ্রু মণ্ডল গরিব ক্যাথলিকদের কাছ থেকে ওগুলো কমদামে কিনে শহরে আর গাঁয়ে লোক দিয়ে বেচে। খুব লাভ থাকে।

: পাদ্রীরা জানে না ? বাধা দেয় না ?

: প্রথমত, যারা বেচে তারা স্বীকার করে না। চার্চ দেখে, যাক গে পোশাক না পরুক টাকা তো পাচ্ছে গরিবেরা। আর পিদ্রুকে কিছু বলার সাহস নেই পাদ্রীদের।

: কেন ?

: সে সব সময় শাসায় পাদ্রীদের প্রোটেস্ট্যাণ্ট হয়ে যাবে ব'লে।

হো হো করে হেসে উঠি। জোনাথন বলে, 'এখন তো চার্চ থেকে বিদেশী পাদ্রী সব চলেই যাচ্ছে, তাদের জায়গায় নতুন আসছে কেরলিয়ান পাদ্রী। ওরা খুব রাফ আর বাঙালিদের খুব হেট করে, যা-তা বলে। তাই চার্চে আজকাল লোক খুব কম যায়। ভেতরে ভেতরে চাপা ক্ষোভ আছে পাড়ায়।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আজকাল অনেক কমবয়সী সাউথ ইণ্ডিয়ান ফাদার দেখি বটে। তা এত সাউথ ইণ্ডিয়ান পাদ্রী কেন ?'

: ওরা খুব গোঁড়া ক্যাথলিক আর সাউথে বিশেষত কেরালায় বেকার সমস্যা খুব। এখানে যত সিস্টার দেখেন তার বেশির ভাগ সাউথ ইণ্ডিয়ার।

শহরের এই মহামহিম চার্চের দিকে তাকালে আমার অবশ্য কোনো খ্রীস্টধর্ম-বিশ্বাসীর মুখ মনে পড়ে না, মনে পড়ে একজন মুসলমানের মুখ। তার নাম রমজান মোল্লা, রিকশাচালক।

কেন চার্চের দিকে তাকালে তার নাম মনে পড়ে সে কথা বলার আগে রমজানের কথা একটু বলতেই হয়। সে থাকে শহরের নলুয়া পাড়ায়। 'নলুয়া' মানে মুসলমান পাটিকর। যারা পাটি বানায়। তাদেরই বংশধর রমজান, তবে যুগধর্মে পাটি না বানিয়ে রিকশা চালায়। আমি বেশির ভাগ সময় রমজানের রিক্শায় চড়ি। গাড়ি চালাতে চালাতে রমজান অবিশ্রান্ত বকে চলে। তার থেকে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ে। যেমন নলুয়া মানে যে মুসলমান পাটিকর সে খবর তো আমি রমজানের কাছে জানতে পারি। অবশ্য রমজানের বলার ধরনটা মজার। বলেছিল, 'বুঝলেন স্যার, নলুয়ারা পাটি করত আর আমি পার্টি করি।'

: 'বাঃ চমৎকার বলেছ' আমাকে তারিফ জানাতেই হয়, সেইসঙ্গে কৌতূহল, 'কোন্ পার্টি ?'

: কম্যুনিস্ট পার্টি। কেন জানেন ? মুসলমান ধর্মের মতো এই কম্যুনিস্ট পার্টি। একবার নিলে আর ছাড়তে পারবেন না।

রমজান কম্যুনিস্ট কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ। তাদের পাড়ার মসজিদে যে মোল্লা থাকেন

তার খিদমতকারি করতে সে ভালোবাসে। আরবের টাকায় তাদের মসজিদের চেহারা ফেরাবার জন্যে সে খুব তৎপর। কী করে সে টাকা পাওয়া যায় তা আমার কাছে কেবলই খোঁজ নেয়। ভালো সংস্করণের একখানা কোরান তার খুব দরকার যদিও অক্ষরজ্ঞান নেই। আমি তখন সদ্য 'গরম হাওয়া' ছবিটা দেখেছি। মনটা নরম। হঠাৎ তাই একদিন রমজানকে বলে বসলাম, 'তোমাদের বসবাস করতে কোনো অসুবিধে আছে কি? আমাদের শহরে তো কোনো হিন্দু-মুসলিম সমস্যা নেই। তোমাদের ওপর কোনো অবিচার অত্যাচার হয় না নিশ্চয়ই।'

রমজান মুখ বেঁকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি গোপন করে বলল, 'অসুবিধে আর কি এমন? আমাদের নলুয়া পাড়ায় আগে মুসলমান ছিল ভর্তি। পার্টিশন হয়ে তারা বাংলাদেশ চলে গেছে। তাদের জায়গায় এসেছে সব গরিব ছোটলোক রিফিউজি। তারা খুব অভদ্র তাতে মুসলমানদের ওপর খুব রাগ। সেবার পাড়ায় খুচরো কি এক ঝামেলায় আমার ভাগনেকে ধরে নিয়ে গেল। সে দর্জির কাজ করে। বেশি মারধোর করে নি, কেবল ডান হাতের প্রথম আঙুলটা থেঁতলে দিয়েছে। ছোকরা আর দর্জির কাজ করতে পারে না। এখন সে আমার মহাজনের লরিতে ক্লিনারের কাজ করে। কি বুঝলেন? কেমন আছি আমরা?'

অপমানে কান ঝাঁ ঝাঁ করে। অনেকটা আত্মরক্ষার জন্যেই বলি, 'ওরকম দু-একটা অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে। সাধারণ ভাবে তোমাদের প্রতি হিন্দুরা নিশ্চয়ই অবিচার করে না।'

রমজান তেমনই হাসিমুখে বলল, 'অবিচার কাকে বলে? আচ্ছা ধরুন, আমাদের পাড়ায় একটা মিউনিসিপ্যালিটির টাইম কল আছে। লোডশেডিং থাকলে জল আসে না। তো জল যেদিন আসে বা যখন আসে তখন বালতি আর ঘড়া নিয়ে গরিব বউঝিরা লাইন দেয়। তা ধরুন কুড়িঘর রিফিউজি, পাঁচঘর আমরা মুসলমান। আমাদের বউঝিদের ছোঁওয়া তো চলে না। কাজেই সমুদয় রিফিউজির জল নেওয়া হয়ে গেলে তার পরে যদি কলে জল থাকে তবেই তো আমরা জল পাবো? এটা বিচার না অবিচার?'

আলাপচারি এর পর আর এগোয় না সেদিন। কিন্তু অচিরে রমজান আমাকে একটা নতুন কথা শোনায় আরেক দিন. আর তাতে আমার সারা চৈতন্য নাড়া খেয়ে যায়। কথাটা উঠল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে। আমাদের শহর থেকে এগার মাইল দূরে একটা গ্রামে হঠাৎ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধে। দু দিনেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর সতর্কতা হিসাবে আমাদের শহরের শ-দুয়েক মুসলমানকে

সরিয়ে এনে রাখা হয় পুলিসী সুরক্ষায় একটা স্কুলে। রমজানের পরিবারও সেখানে সাময়িক আশ্রয় নেয়। এই সময়কার কথা তুলে রমজান বলল, 'বুঝলেন স্যার এবারের রায়টের সময় যখন আমরা সব ইস্কুলে ছিলাম তখন পুরুষমানুষরা সবাই সারা রাত জেগে থাকতাম। বলা তো যায় না, যদি অ্যাটাক হয়। পেছনেই বাঙালপাড়া। আর সত্যি বলতে কি পুলিসের ওপর আমাদের একদম বিশ্বাস নেই। তাই মেয়েছেলে আর বাচ্চাদের ঘুমোতে বলে আমরা জেগে পাহারা দিতাম।'

আমি বললাম, 'কিন্তু রমজান, অ্যাটাক তো হয় নি?'

: তা হয় নি। বলবার কথাটা তা নয়। আসলে স্যার, আমরা রাত জাগতাম আর আলোচনা করতাম যদি হিন্দুরা অ্যাটাক করে তবে কি করব। কেউ বলে মেটেবুরুজ যাব। আমি বলি সেখানে করবে কি? বিহারী মুসলমানদের সঙ্গে খাপ খাবে কি? আমার ভায়রাভাই গোলাম বললে, চলো বাংলাদেশ পালাই। উহুঁ, তাতেও আপত্তি উঠল।

: কেন?

: কারণ সেখানে দারুণ বেকারসমস্যা আর প্রচণ্ড জিনিসপত্রের দাম। তা ছাড়া আমরা এখন গেলে সে দেশের নাগরিকত্ব পাবো না। সেখানে ব্যবসাপত্রের লাইসেন্স পাবো না। আরো সমস্যা কি জানেন? এদেশ থেকে বাংলা দেশে গেলে এখন আর জমিজমা বিষয় সম্পত্তি কেনা যায় না। আইন নেই। জানেন কি এ-সব?

বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেই হলো নিজের অজ্ঞতার কথা। সেইসঙ্গে কৌতূহল দমন করতে না পেরে জানতে চাইলাম, 'তখন তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিলে?'

রমজান বলল, 'বড় অদ্ভুত সিদ্ধান্ত সেটা। ঠিক হলো সবাই মিলে অসহায় ভাবে মরতে তো পারি না। লড়বো যে তারই বা জনবল বা অস্ত্র কই? কোথাও পালাবার উপায় নেই। বাংলাদেশ আমাদের বরাবরের জন্য রাখবে না। হিন্দুরা তো আমাদের নিজেদের ধর্মে মেনে নেবে না। তাই শেষমেশ ঠিক হলো অ্যাটাক হলেই আমরা সোজা দল বেঁধে চার্চে চলে যাব। পাদ্রীবাবাকে বলবো, বাঁচান আমাদের। শিগগির খ্রীস্টান করে দিন। বাঁচতে চাই আমরা। কেমন বুদ্ধি করেছিলাম বলুন তো?'

রমজানের কথার জবাব দিতে পারি নি। সেই থেকে শহরের ক্যাথলিক চার্চটা দেখলেই আমার কেমন লজ্জা করে।

*　　*　　*　　*

মনে আছে জ্যৈষ্ঠের এক দুঃসহ গরমের দিনে যোগ দিয়েছিলাম সরকারি কলেজের কাজে। জায়গাটা মফস্বলের এক আধা শহর, তবে কলেজ বিল্ডিংটা চমৎকার। পাম আর দেবদারুর অ্যাভেনিউ। সামনে বিরাট খেলার মাঠ। একপাশে ঝিল। তাছাড়া প্রথম চাকরির একটা রোমাঞ্চ ছিল। সরকারি কলেজ সম্পর্কে তীব্র মোহ। অবশ্য দুদিন পরেই গরমের ছুটি পড়বে। তা হোক। সরকারি কাগজপত্রে সইসাবুদ সেরে, অধ্যক্ষ মশায়ের নির্দেশে স্টাফ রুমে ঢুকলাম। সবাই পরিচয় পেয়ে স্বাগত জানালেন।

নবীনতম সদ্য-অধ্যাপকটিকে দেখে প্রবীণতম অধ্যাপক দাস কাছের গোড়ায় ডেকে বসিয়ে স্নেহস্বরে বললেন, 'আজই জয়েন করলেন? বয়স তো খুব কম। কেরিয়ার ভাল? তাহলে খুব চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি এ-সার্ভিস ছেড়ে যেতে পারেন।'

: কেন?

: এ-সার্ভিসে এখন আর কিছু নেই। কেবল ট্রান্সফার আছে আর জি. ও. অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট অর্ডার আছে। ব্যাস। চাকরিটা কেমন জানেন? বনেদী বাড়ির বউ হবার মতো।

কৌতূহল হ'লো। বললাম, 'একটু বুঝিয়ে বলুন'।

চুরুটে টান মেরে অধ্যাপক দাস বললেন, 'বনেদী বাড়ি দেখেছেন তো? খুব বিশাল পুরোনো চক মেলানো বাড়ি কিন্তু ভেতরটা ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে। সংস্কারের অযোগ্য। তবে কেতা কানুন খুব আছে। সেই বনেদী বাড়ির বউ-দের বাইরে যাওয়া নিষেধ। ভেতরে থেকে মার খাও। মর্যাদাবোধ আর আভিজাত্যের ব্যাপার। বাইরে বেরোলেই বদনাম। এই দেখুন আমি। পঁচিশ বছর আগে বনেদী বাড়ির মোহে পড়ে সার্ভিসে ঢুকেছিলাম। প্রাইভেট কলেজ শুনে নাক সিঁটকোতাম। বনেদীআনার দম্ভ। কী লাভ হ'লো? ইংলিশ বি-গ্রুপে গোল্ড মেডালিস্ট। সারাজীবনে একটা প্রমোশন আর মাকুর মত কলেজে কলেজে ঘোরা। ছি ছি।'

সত্যিই দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু উৎসাহ ফিরে পেলাম বিরাজ বর্মনের সঙ্গে আলাপ হতেই। এ গল্প অধ্যাপক বিরাজ বর্মনেরই। তাঁর সঙ্গে আমায় আলাপ ও স্মরণীয় সহকর্মিত্ব ঐ আধাশহরেই। বছর পাঁচেকের সমুজ্জ্বল বন্ধুতার সেই রেশ আজও চিঠিপত্রে অম্লান।

সরকারি কলেজের রুটিনমাফিক ট্রান্সফার-পদ্ধতি কত ঠাণ্ডা মাথার মানুষকেও যে স্নায়বিক ভাবে উত্তেজিত করতে পারে তার দৃষ্টান্ত বিরাজ। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী পশ্চিম বাংলার নানা অপরিকল্পিত অপুষ্ট মফস্বল যে কোন্ অন্তর্ঘাতে অসামান্য ব্যক্তিত্বকে ন্যুব্জ করে দেয়, অনুজ্জ্বল অনুদ্যমী ক'রে দেয় প্রখর মেধা ও মননকে, তাও প্রথম আমি বুঝি বিরাজকে দেখে ও জেনে।

চাকরির প্রথম দিনেই বিরাজের সঙ্গে মিশে বুঝলাম, সে যাকে বলে টিপিক্যাল বিদ্যাসাগর-বর্ণিত সুশীল ও সুবোধ বালক। আপনি থেকে তুমিতে আসতে লেগেছিল পাঁচ মিনিটের মতো। ব্যবহার ছিল এতটাই আন্তরিক। তার জীবনের ব্রত ছিল আদর্শ পথে চলা, গুরুজন ও পিতৃবাক্য মান্য করা এবং পরীক্ষায় প্রথম হওয়া। স্কুল ও কলেজ জীবনে সব কটি ব্রত পালনে সে সার্থক হয় ক্লাশে। ম্যাট্রিক ও আই. এসসি-তে বিরাজের নাম প্রথম পাঁচজনের মধ্যে দেখেছি মনে পড়ে। কেননা সে তো আমাদের সামান্য বড়। সে পরীক্ষা দেয় অবশ্য বর্ধমান থেকে। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক আর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। সবাই তাকে প্ররোচিত করল ট্রম্বে যেতে, নিদেন সাহা ইনস্টিটিউটে গবেষণা করতে। বিরাজ দ্বারস্থ হলো তার পিতৃবাক্যের। তিনি ছিলেন ছোট মাপের উচ্চাশাহীন ধর্মভীরু নিরীহ মানুষ। পিতা বললেন সরকারি কলেজে কাজ নিতে। কেন? কারণ সেখানে হাঙ্গামা কম, সম্মান বেশি আর পেনশন অবধারিত।

ছয়ের দশকের গোড়ায় বোঝা যায় নি যে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উচ্চতর লেখাপড়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। নানা প্রাইভেট আর স্পনসর্ড কলেজ ছড়ি ঘোরাবে সরকারি কলেজের ওপর। বোঝা যায় নি যে মুড়ি-মিছরি এক দর হবে। বিরাজ জানত না যে অমন অসামান্য পরীক্ষার ফল থাকা সত্ত্বেও তিরিশ বছরেও সে থেকে যাবে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। পদার্থবিদ্ হিসাবে তার সমকালীন ও অনুজরা যখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে অথবা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে বা পরমাণু গবেষণায় বিখ্যাত তখনও বিরাজ নির্বিকারচিত্তে গণতান্ত্রিক ৭০০-১৬০০ স্কেলে মাইনে নিয়ে পড়াচ্ছে হয়তো টাকীর গণ্ডগ্রামে।

শুধু টাকী নয়, আদিবাসী-সংকুল ঝাড়গ্রাম, উত্তরপ্রত্যন্ত কোচবিহার এমনকি শিল্পনগরী দুর্গাপুরেও সে জ্ঞানদান করেছে। সরকারি আদেশপত্রে লেখা 'ইন দি ইনটারেস্ট অব দি পাবলিক সারভিস' শিরোধার্য করতে গিয়ে বিরাজ চিরজীবন নিজের ও পরিবারের ইনটারেস্ট ত্যাগ করলো। সেইসঙ্গে তার আধুনিকমনস্ক স্ত্রী

ভ্রষ্ট হলো কলকাতা নামক সুখদ উদ্যান থেকে, সন্তানরা ভালো বিদ্যায়তনে পড়তে পেল না। তাতে অবশ্য বিরাজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। আদর্শবাদী শিক্ষা-ব্রতী সে, গীতার 'যথা নিযুক্তোঽস্মি' আউড়ে দিব্যি কাটিয়ে দিল।

নিজের ঘরে বসে আপনমনে গুন গুন করতো বিরাজ :

আরো আরো প্রভু আরো

এমনি করে আমায় মারো।

হেসে বলতো, 'জানো, এ-গান রবীন্দ্রনাথ বেঁধেছিলেন ভবিষ্যতের সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের কথা ভেবে।'

এই রকম খেলাচ্ছলে বছর দশ-বারো কাটিয়ে সে যখন মফস্বলের এক কলেজে কর্মরত তখন এসে গেল সারা দেশকে সচকিত করে মুক্তির দশক। মুক্তির প্রথম ঝাপট লাগলো স্কুলকলেজে। মুক্তিকামী ছাত্রসমাজ একজোট বেঁধে বলতে চাইল —আমরা মুখস্থবিদ্যায় পরীক্ষা দেব না, পরীক্ষার হলে বসে বই দেখে টুকে দেবো। যারা সেই মহৎ ব্রতে বাধা দেবে তাদের লাশ পড়ে যাবে।

বিরাজের কলেজও পিছিয়ে থাকলো না। সেবার বিরাজ ছিল গরমের ছুটিতে কলেজের ভারপ্রাপ্ত এবং সেই সুবাদে পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পুরো দায়িত্বে। ছাত্ররা অগ্রিম তাকে উড়ো চিঠিতে বিধিসম্মত সতর্কীকরণ করলো। সহকর্মীরা বোঝালেন, অধ্যক্ষ চিঠি লিখলেন—সময় খারাপ, একটু চোখ বুঁজে থাকুন। স্ত্রী বলল, 'এই বিদেশ বিভুঁয়ে আদর্শের জন্য তুমি কি প্রাণ দেবে?' অবিচলিত বিরাজ একটু হাসলো কেবল।

পরীক্ষার প্রথম দিনেই ঘটলো অঘটন। তারক বলে একটা বিচ্ছু ছেলে ঘণ্টা পড়ার আগে ধরা পড়লো। বাইরে থেকে উত্তরপত্র এনে সে মূল খাতার সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছিলো। পরীক্ষাবিধির ভাষায় তাকে বলে 'গ্রস মিসকনডাক্ট'। বিরাজ তারকের খাতার ওপর মন্তব্য লিখে পাঠালো। যাকে বলে 'রিপোর্টেড এগেনস্ট'।

প্রথমে কলেজে আর নবপল্লী অঞ্চলে হৈ হৈ হলো, তার পরে কানাকানি এবং শেষে আবহাওয়া থমথমে হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তারক নিজে এলো কথা বলতে। সঙ্গে অদ্ভুতদর্শন কটা ছোকরা। বিরাজের বউ কিছুতেই বেরোতে দিল না বিরাজকে। নিজে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কথা বললো। তারক মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শাসিয়ে গেল, 'বি. বি-কে বলবেন ওসব আদর্শ-ফাদর্শ বুঝি না। যদি আমার আর. এ. তুলে না নেন তবে সাংঘাতিক ঘটনা হবে। সবাই টুকছে, সব কলেজে টুকলি হচ্ছে, উনি এলেন ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।'

বিরাজ এবার দৃশ্যত সাময়িক ঘাবড়ালো। তার স্ত্রী লাগালো কান্নাকাটি। আমাকে চিঠি লিখলো : 'আপনার বন্ধুকে বোঝান। ঐ সর্বনাশা তারকের রেজাল্ট বেরোবার আগে এ কলেজ থেকে বদলির বন্দোবস্ত করুন, দোহাই।'

চিঠি দিলাম। বিরাজ জানালো, ট্রানসফার চেয়ে রিপ্রেজেনটেশন দেব না। কোনোদিন উমেদারি করি নি। ঘাবড়াও মৎ বন্ধু। আদর্শের জন্য লড়তে হয়। বাবা বলতেন, 'কাওয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইমস্ বিফোর দেয়ার ডেথ।'

ঐ ঘটনার যবনিকা পড়েছিল মাস তিনেক পরে এক সকালে। বড়ই মর্মন্তুদ সে ঘটনা। কিন্তু তা জানাবার আগে তারক সম্পর্কে একটু জানা দরকার। শহরের নবপল্লী অঞ্চলে তারককে চেনে না এমন কেউ নেই। কাজেই লোকাল ইনভেস্টিগেশনে জানা যায় যে, তারক খুব বেপরোয়া ধরনের ছেলে ছোটবেলা থেকে। খুব রাফ। ভীষণ নিষ্ঠুর। শিশু বয়সেই নির্বিকার চিত্তে ফড়িঙের পাখা ছিঁড়ে দিত সে। বাড়ির কাউকে মান্য করে না। স্কুল থেকে একবার রাস্টিকেটেড হয়েছিল। মোট কথা কোনো তথ্যই বিরাজের পক্ষে আশাপ্রদ ছিল না। গরমের ছুটির পর কলেজ খুললে অধ্যক্ষমশাই একটা শেষ চেষ্টা করলেন তার বাবাকে ডেকে এনে। কিন্তু খুব চেষ্টা করেও তারককে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ানো গেল না। ইতিমধ্যে খবরের কাগজে জানা গেল খুব শীঘ্রই পার্ট ওয়ান রেজাল্ট বেরোবে।

অত কি খেয়াল রাখা যায়? বিরাজ খুব মেজাজে সেদিন বাজার করে বাড়ি ফিরছিল। সস্তায় একটা ভালো ইলিশ পেয়েছে। মনে ছিল সেই আনন্দ। জানতো না পথে অপেক্ষা করছে কী ভয়ানক ভবিষ্যত। বাজার থেকে ফেরার পথে একটা চেনা দোকানে কাগজের হেড লাইন পড়ে তার পাশের এক খবরে তার গায়ে কাঁটা দিল। 'পার্ট ওয়ান ফল প্রকাশিত'। সর্বনাশ।

বিরাজ দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরলো। একটা সর্টকার্ট নির্জন গলিপথ তার বিবেচনায় মনে হলো নিরাপদ। আর সেই পথেই তারকের সঙ্গে দেখা। সুনসান রাস্তা। হৃৎস্পন্দ দ্রুত, মুখ পাংশু। যেন দেখতেই পায় নি এই ভাবে সে এগোলো। পা কি এগোয়? কিন্তু অবধারিতভাবে রাস্তার অন্য পাশ থেকে তারক বেঁকে চলে এলো। আদর্শবাদী বিরাজ তার বুকে গুলির নিশ্চিত আঘাত ভেবে চোখ বুঁজলো। হঠাৎ পায়ে কিসের স্পর্শে সর্পদষ্টের মতো চমকে সে দেখলো তারক তাকে প্রণাম করছে। একি? একি?

: আপনি স্যার দেবতা। আপনি কখনো ক্ষতি করতে পারেন? আমি পাশ করে গেছি।

টলে উঠলো বিরাজের স্থিতপ্রজ্ঞ জগৎ। মনো হলো একটা ভীষণ ক্রূর গুলি তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল।

বিরাজ ভাবলো কে প্রতারক? তারক না বিশ্ববিদ্যালয়?

* * * *

পূর্ত বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু শান্তনু ভালোবেসেছিল তার পাশের বাড়ির সুন্দরী মেয়ে রানুকে। বিয়েতে দু বাড়িরই অমত ছিল। অসবর্ণ বিয়ে। ওসব কি এ যুগে চলে? শান্তনু বন্ধুমহলে প্রায়ই কাঁদুনি জুড়তো 'তোরা কিছু একটা কর'। সে তো আজকের কথা নয়। অন্তত পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তখন লাভ ম্যারেজ ছিল খুব রহস্য-রোমাঞ্চের ব্যাপার। আমাদের আড্ডার স্বনির্বাচিত নেতা শশাঙ্ক একদিন বললো, 'কী রোজ ধানাই-পানাই করিস? রানুকে নিয়ে আয় একদিন। রেজিস্ট্রি করে দিই। মালদায় নিয়ে চলে যা। আণ্ডার এজ তো নোস্, দুজনেই অ্যাডাল্ট। তুই চাকরিও করিস্। ভাবনা কি?'

হঠাৎই ঘটলো ব্যাপারটা। এক সোমবার বিয়ে হলো। শশাঙ্কর হুকুমে আমাকে থাকতে হলো সস্ত্রাক। একজন মহিলা নাকি থাকা দরকার। বিয়ের পর বন্ধুরা মিলে খাওয়া-দাওয়া হলো। চাঁদা করে কেনা হলো গৃহস্থালির সরঞ্জাম। আমরা সস্ত্রীক চললাম নববিবাহিতদের সেটল করাতে কালিয়াগঞ্জে। সেখানেই শান্তনুর কর্মস্থল।

কালিয়াগঞ্জ পৌঁছতে বেলা এগারোটা বাজলো পরদিন। ভাড়া-করা ফ্ল্যাটে ওঠা গেল। শান্তনু ঐ ফ্ল্যাটে আগে থেকেই থাকতো। একতলার ছিমছাম দু খানা ঘর। অগোছালো। এক ঘণ্টার পরিশ্রমে আমার গিন্নি তা সাজিয়ে ফেললো। রানু কেবলই কাঁদছে বাপের বাড়ির শোকে। বন্ধুদের দেওয়া উপহার সামগ্রী, যথা কেরোসিনচালিত বার্নার, প্রেসার কুকার, ক্রকারি সব সাজানো হলো। হুট বলতে বিয়ে। শান্তনু কেনাকাটা গোছানো কিছুই করে রাখতে পারে নি। কোনো রকমে একটু ব্যবস্থা করে নতুন প্রেসার কুকারে সঙ্গে-কিনে-আনা ডিম আলু দিয়ে ভাত চড়াতে বেলা গড়ালো। শ্রীমতী একটু বোধ হয় কলঘরে গিয়েছিলেন ধুলো ময়লা ধুয়ে একটু গায়ে জল ঢালতে। ইত্যবসরে প্রেসার কুকারে বার বার হুইসিল বাজতে লাগলো। আমি আনাড়ি, রানু প্রেসার কুকারে অপটু। অসহায় দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করি। প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ঘরে ঢুকলেন এক মধ্যবয়সিনী। ত্রস্তে কুকার নামিয়ে কাংস্য কণ্ঠে ঝংকার দিলেন, 'শান্তনু, তোমার নতুন প্রেসার কুকারটি ভাই বড়ই দুশ্চরিত্র। কী ভীষণ সিটি মারছিলো।'

চমকে গেলাম এবং থমকে। অপরিচিতা মহিলাটির আবির্ভাব যেমন চকিত, সংলাপ তেমনই শানদার, নাটুকে।

হতভম্ব শান্তনু কোনোরকমে এগিয়ে বললো,…'ইয়ে. মানে ইনি ওপরে থাকেন। মানে দোতলায়। মানে আমাদের ল্যাণ্ডলেডি…মানে'

'অত ইয়ে ইয়ে করতে হবে না' খুব পরুষকণ্ঠে বললেন মহিলা. 'আমি হলাম তোমাদের সকলের সরমাদি। ওসব ল্যাণ্ডলেডি-ফেডি নই. স্রেফ বাড়িউলি। ইস্কুলে পড়াতাম! রিটায়ার করেছি। একা মানুষ। কি আর করি? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় দোতলা করে উঠে গেছি। নীচেরটা ভাড়া দিই। সঙ্গও পাই, টাকাও জোটে।'

আমরা কিছু বলবার আগেই আবার শুরু করলেন, 'শান্তনু, মাস পাঁচেক ভাড়া এসেছ, তাই না? ও তো কালিয়াগঞ্জে বাড়ি ভাড়াই পায় না। ব্যাচিলর তো! কেউ সাহস করে বাড়ি ভাড়া দেয় না। যদি কিছু ঘটে? আমার তো অতশত ভয় নেই। দেখলাম আমিও ব্যাচিলর শান্তনুও ব্যাচিলার। দুজনে পটবে ভালো।'

সরমাদির অনর্গল হৃদয়-বিদারক কথামালায় শান্তনু পাংশু, রানু ভ্রূকুঞ্চিত, আমরা সস্ত্রীক বেপথু। অবস্থা সামলাতে আমি আগ বাড়িয়ে বললাম, 'দিদি আমাদের বেশ রসিক তো!'

: আর ভাই, রসের আর দেখলে কি? বুড়ো বয়সে আর কি তেমন জমে? এই দ্যাখো, একটু ঠাট্টা করেছি কি না-করেছি অমনি মেয়ের নাকের পাটা ফুলছে। কি নাম তোমার?

: রানু।

: বাবার দেওয়া নাম না শ্রীমানের দেওয়া আদরের নাম? বলা তো যায় না, আজকালকার মেয়েরা বিয়ের পর বাপের দেওয়া জিনিসকে আদর করে না! তুমি তো আবার বাপের বাড়িটাকেই ত্যাগ করে এসেছ।

কথা নয়তো যেন কেটে কেটে বসা চাবুকের দাগ। রানু কেঁদে ফেলল। শান্তনু তাকে সান্ত্বনা দিতে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। আমার বোকাসোকা গিন্নি রাগ করে বলে, 'কি করে বুঝলেন বাপের বাড়ি ছেড়ে এসেছে?'

সরমাদির মুখে একটা বহুদর্শী ঝুনো হাসি খেলে গেল। বললেন, 'ওসব বুঝতে সরমা গুহরায়ের পাঁচ সেকেণ্ড লাগে, বুঝেছ? আমি হলাম "না বিইয়ে কানাইয়ের মা।" কি করে বুঝলাম জানো? শোনো তবে। বিয়ের পর সংসার

গোছাতে এসেছে বন্ধু আর বন্ধুর বউ। বাপের বাড়ির কেউ আসে নি। আর শুনবে ? বিয়ে হলো কিন্তু নতুন খাট নেই, ড্রেসিং টেবিল নেই, শাড়ির ট্রাঙ্ক নেই। এসব থেকে কি বোঝায়, অ্যাঁ। আচ্ছা, এখন চলি ভাই। আবার আসবো। এখন পাশের ঘরে চলুক মানভঞ্জনের পালা।'

তাই বলে মানুষটা খারাপ নয়। বোঝা গেল ক্রমশ। মানুষের বাক্য দিয়ে যে তার অন্তরকে বোঝা কঠিন এ কথা আমাকে বোঝান সরমা গুহরায়। সন্ধেবেলা মানুষটা যেন একেবারেই আলাদা রকমের। হালকা প্রসাধন সেরে, সুন্দর এক বুটিদার শাড়ি পরে সরমাদি এলেন। পেছনে ট্রে হাতে পরিচারিকা। তাতে পোলাও, মাংস আর ফিস ফ্রাই। অনেক কমলাভোগ। বললেন, 'আগে তো নোটিশ দাও নি তাই বেশি কিছু করতে পারলাম না। মফস্বল জায়গা। হুট বললে জিনিস মেলে না। তাই বলে ডিমসেদ্ধ ভাত খেয়ে দাম্পত্য জীবনের শুরু ? তোমাদের সরমাদি কি মরেছে ? তবে কি জানো ভাই, এদেশে অবিবাহিতা মেয়ে মানে হলো ছড়ানো গোবর। কোনো কাজে লাগে না।'

জমে গেল নৈশভোজ। চমৎকার রান্না সরমাদির। তাঁর স্বভাবটির মতোই মাখা-মাখা, একটু বা ঝাল। রান্নার তারিফ করতেই বললেন, 'আর রান্না ! এ রান্না তারিফ করার লোকই জুটলো না জীবনে। চিরকাল মেয়ে ইস্কুলে ইতিহাস পড়িয়ে গেলাম, এদিকে আমার শরীরের জিওগ্রাফি পালটে গেল। আসলে রানুর মতো জোগাড়ে নই। এই মেয়ে, রাগ কোরো না ভাই। তোমার ক্যাচটা ভালোই হয়েছে।'

খানিক থেমে শান্তনুকে বললেন 'তুমিও ঠকো নি বাপু। সাধারণত কি হয় ? লাভ ম্যারেজ মানেই লোকসান ম্যারেজ। রানু কিন্তু দেখন-শোভা মেয়ে। যা সুন্দর মুখ। ভাইকে আমার জ্বালাবে খুব।'

সকলে হেসে উঠতেই বললেন, 'সবটাই হাসি নয়। ধমক-ধামকও দিতে হয় দিদিগিরি বজায় রাখতে। এবার একটু ধমকাই।'

আমার স্ত্রীর হাত দুটো ধরে বললে, 'বললে তো তখন, বিয়ে হয়েছে চার বছর। আর কতদিন অতৃতীয় হয়ে থাকবে ?'

এবারে এক ঝলক হেসে নিল শান্তনু আর রানু।

আমি বললাম, 'দিদি, ব্যাচিলর জীবন কেমন ?'

: এমনই খারাপ নয়। স্বাধীন ঝাড়া হাত পা। কিন্তু আসলে পুকুরের জলে পাথরের বাটির মতো। কখন যে ডুবে যাবে কেউ জানে না।

বিয়ে না করার জন্মে ঝামেলা পুইয়েছেন ?

এখনও প্রতি মাসে পোয়াই।

সে কি ? এই বয়সে ?

শোনো তবে ! এক হিন্দুস্থানী ছোঁড়া আমাকে সারামাস খবরের কাগজ দেয়। কাগজ দোতলায় ছুঁড়ে দেয়। সমস্যা নেই। কিন্তু মাস কাবারে হয় সমস্যা।

কেন ?

সে মাস কাবারে টাকা নিতে এসে হাঁক পাড়ে, 'ও কাকিমা, পেপারের টাকাটা তো দেন।' আমি তাকে বলি, 'ওরে বাছা, আমাকে মাসিমা বল্ পিসিমা বল্ কিন্তু কাকিমা বলিস নে। ওরে তোদের কাকাবাবুকে আমি জোগাড় করতে পারি নি রে।' বেটা মুখপোড়া খোট্টা, কিচ্ছু বোঝে না।

সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।

দুদিন পরে চলে আসার আগের সন্ধ্যায় আমার স্ত্রী উশখুশ করতে লাগলেন, 'কাল ভোরে চলে যাব সরমাদির সঙ্গে একবার দেখা হবে না ?'

এমন সময় স্বয়ং সরমাদি এসে হাজির। খুব সেজেগুজে আর একটা দামী বাঙ্গালোর সিল্ক পরে। বললেন, 'যুগল মিলন দেখতে এলাম।'

: এত সেজেগুজে চললেন কোথায় ?

: যাব একটা বিয়েবাড়ি। কেমন সেজেছি ? পছন্দ হয় ?

হঠাৎ কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'কপালে সিঁদুরের টিপ পরেছি সেটা কি আলাদা করে দেখেছ ? কেন পরেছি জানো ? না পরলে নেমন্তন্ন বাড়িতে সবাই ভাববে আমি বিধবা। কিন্তু সিঁদুর টিপ দেখলে ভাববে কুমারী, তাই না ?'

ব'লে নিজেই হাসলেন সরমাদি উচ্চকণ্ঠে। তাতে কি এক অবর্ণনীয় বেদনার বিহ্বলতা ছিল জানি না। আজও কানে বাজে। একটা মানুষ বাইরে হাসি-খুশি আর অন্তর্মূলে এতটাই রিক্ত ? নারী চরিত্রের সদর-মফস্বলের তল পাওয়া বোধহয় কঠিনতর।



শহর-অশহর

কাকে যে বলে শহর আর কাকে মফস্বল, তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি না। যেমন এই কলকাতার কথাই ধরা যাক। সেই ঘটনাটা শুনেছেন তো? দুটি পরিবার বেড়াতে গেছেন কাশীতে। উঠেছেন গঙ্গার কাছে এক ভালো হোটেলে। দুই পরিবারের দুই কর্তা আলাপ করেছেন হোটেলের লাউঞ্জে এই মর্মে—

: আপনি কোথায় থাকেন?

: কলকাতায়।

: কলকাতার কোথায়? সাউথ না নর্থে?

: নর্থে।

: নর্থের কোথায়? হাতিবাগান? ফড়েপুকুর? শ্যামবাজার?

: না, আরেকটু দূরে।

: ও, তা হলে বেলগাছিয়া, পাতিপুকুর?

: না না, মানে বাঙ্গুর অ্যাভেনিউ ছাড়িয়ে।

এই পর্যন্ত ব'লে ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, 'আর আপনি কোথায় থাকেন?'

: আমি থাকি কলকাতার বাইরে।

: কোথায়?

: ভবানীপুরে।

এর পরে এক অস্বস্তিকর নীরবতা।

এই সব ভেবেই আমি বুঝে পাইনা কোথায় শেষ হয় শহরের সীমানা, আর

কোথায় মফস্বলের শুরু। বেলঘরিয়া সোদপুর কি শহর না মফস্বল? বেলুড় কী? আমার বন্ধু শচীন বলে, পশ্চিমবাংলায় শহর একটাই, কলকাতা। আর সব গ্রাম। এটা একটা অত্যুক্তি। সব দিক বিচার ক'রে মফস্বলের এক আলাদা ধরন আছেই। কিছু কিছু মানুষজন আছেন যাঁদের টিপিকাল মফস্বলী প্রোডাক্ট বলা চলে।

আমি প্রথমেই এমন দুই প্রোডাক্ট-এর বিবরণ দেব। একজন হালিশহরের ন্যাড়াদা, আরেকজন ভদ্রেশ্বরের সত্যচরণ সাধুখাঁ।

ন্যাড়াদার সঙ্গে আমার পরিচয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে। কলকাতায় খিদিরপুরে যে-রাতে জাপানী বোমা পড়ে তার পরদিন আমরা কলেজ স্ট্রিট অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসি হালিশহরে মাসির বাড়ি। সেই প্রথম আমার মফস্বল দেখা। ধুলোভরা রাস্তা, পানাপুকুর, টালির ছাদের বাড়ি, বাঁশবাগান আর দারুণ মশা। হালিশহরে প্রথম আমি দেখি কামারশালা। সেটা ছিল মাসির বাড়ির পাশে। মালিকের নাম ন্যাড়াদা। একটা টালিছাওয়া ঘর। তার মাঝখানে হাপর। আমরা একটা কাঠের পিপেয় ব'সে হাপরের চেন টানতাম আর ন্যাড়াদা গনগনে আঁচে লোহা রাঙিয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে ছুরি, বাঁটালি এইসব বানাতেন। আর চলতো তাঁর লাগাতার গল্প। আমার মূল আকর্ষণ ছিল সেইটাই। সদ্য কলকাতা শহর থেকে ছটকে-পড়া এক কিশোরের পক্ষে ন্যাড়াদার গল্পগুলো খুবই রোমাঞ্চকর। পরে অবশ্য বুঝি সেসব গল্পের বেশির ভাগ ছিল আসলে গুল্প। যেমন ধরা যাক ন্যাড়াদা একদিন বললেন, 'বুঝলে, তোমার মাসির বাড়ির পিছনে আগে ছিল গহন জঙ্গল। বাঘ আসতো মাঝে মাঝে। তখন কাঁচড়াপাড়া রেল ওয়ার্কসপের র‍্যামজে কিংবা জন সায়েব আসত বাঘ-শিকারে। এসেই বলতো, ডাকো প্রিয়ডর্শনকে।

'প্রিয়ডর্শন মানে?' আমি জানতে চাইলাম।

ন্যাড়াদা বললেন, 'আরে প্রিয়ডর্শন সায়েবি উচ্চারণ আর কি। মানে প্রিয়-দর্শন। এই আমি, প্রিয়দর্শন কর্মকার। এখনকার এই তামাটে চেহারা দেখে বুঝতে পারবে না এককালে কী চেহারা ছিল আমার। টকটকে রঙ, এই বাইসেপ, এই চওড়া আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি। হালিশহরে আমি ছিলাম সব তাতে ফার্স্ট। এখনও আছি।'

: কিসে কিসে ফার্স্ট আপনি?

: চেহারায় তো বটেই। তার পরে ধরো ডবল ব্যারেল বন্দুক আর শিকারীর জ্যাকেট আমিই প্রথম কিনি এ দিগরে। এখন আমার দেখাদেখি অনেক শালাই কিনেচে।

'তাই নাকি ?' আমি উচ্ছ্বাস দেখিয়ে বলতাম। মানুষটাকে লোফালি দিতে খুব ভালোও লাগতো।

ন্যাড়াদাও ঝাঁজিয়ে বলতেন, 'আরে হ্যাঁ হ্যাঁ। আরো শুনবে ? হালিশহরে আমিই প্রথম বাঘশিকারী, অন্তত দশটা চিতা মেরেচি। আমিই প্রথম মোটর সাইকেল কিনি। আরো শুনবে ? তা হলে সব চেয়ে বড় খবরটা জেনে নাও। এখানে আমিই প্রথম লাভ ম্যারেজ করি।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অমল কিশোর, লাভ ম্যারেজের মর্ম কি বুঝি ? ন্যাড়াদা হেসে বললেন, 'লাভ ম্যারেজ বুঝলে না তো ? বড় হলে বুঝবে।'

বড় হবার মুখেই অবশ্য আত্মগর্বী মফস্বলী মানুষটাকে বুঝে ফেলি। মফস্বল সম্পর্কে ধারণাও হয় খানিকটা। অর্থাৎ ছোট বৃত্তের জগৎ, খাটো অভিজ্ঞতার। সহজ সাফল্য আর আত্মতুষ্টিতে ঘেরা। সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করলেই সেকালে হৈ চৈ পড়ে যেত। কেউ কলকাতার সেকেণ্ড ডিভিশনে ফুটবল খেললেই সবাই তাকে হিরো বানাতো। খবরের কাগজে একজন স্থানীয় লোক ফিচার লিখেছিলেন 'হালিশহরের রামপ্রসাদের ঘাট'। তিনি বনে গেলেন সাহিত্যিক, রাতারাতি। তা ন্যাড়াদাও তো তার ব্যতিক্রম নন। তিনি আমায় বলতেন, 'শোনো, জীবনে যখন যা চেয়েছি তা পেয়েছি। সুখ শান্তি স্বাস্থ্য সম্মান টাকা পয়সা। আমার চাহিদা তো কম।'

পরে জানতে পারি, ন্যাড়াদার একটা ইচ্ছে পূরণ হয় নি। সন্তান-কামনা মেটে নি। অবশ্য পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে ন্যাড়াদা সে কামনাও মেটান এক চমৎকার উপায়ে। তখন আমি এম. এ. পড়ি। বেশ লায়েক। তবে বছরে একবার দুবার মাসির বাড়ি যেতাম বৈকি। আর গেলেই ন্যাড়াদার বাড়ি একবার ঢুঁ মারতাম। ততদিনে হালিশহর একেবারে পালটে গেছে। ন্যাড়াদাও অবশ্য আর কামারশালা চালান না। গেলে খুশি হয়ে বলতেন, 'কে বাদল নাকি ? বাপরে, খুব হেঁতেল হয়ে উঠেছ দেখছি।'

এটা-সেটা খানিকটা কথা হবার পর জিগ্যেস করলাম. 'তার পরে ন্যাড়াদা হালিশহরের পক্ষে নতুন আর কি করলেন ?'

: একেবারে আনকোরা নতুনটা শুনবে ? একটা পোষ্যপুত্র নিয়েছি।

: সেকি ? বাঃ। কিন্তু এতবড় হালিশহরে কারুর পোষ্যপুত্র নেই ? খোঁজ নিয়েছেন ?

: পোষ্যপুত্র আছে। কিন্তু আমার সন্তান কোন্‌খান থেকে আনা জানো? অনাথ আশ্রম থেকে। সে উদারতা কেউ দেখাতে পারে নি।

আত্মপ্রসাদের হাসি ভেসে উঠল।

এই হলো প্রিয়দর্শনের সন্তান সুদর্শনের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত। এর পরে তার ধাপে ধাপে ধাপে বড় হবার বৃত্তান্তে আমাদের কাজ নেই। কেবল ষাট থেকে সত্তরের দশকের মাঝখানের কয়েক বছর যে সুদর্শনের বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় এইটুকু তথ্য খেয়াল রাখা জরুরি। আমি এই সময় আর তত ঘন ঘন হালিশহরে যাই নি। মাসিও দেহ রেখেছেন। ক্বচিৎ কখনো গেলে ন্যাড়াদা ধারাবিবরণী শুনিয়েছেন এবম্বিধ—'বুঝলে বাদল, সুদর্শনটা খুব



হেঁতেল হয়ে উঠেছে। এই দশাসই চেহারা, বাপের নাম রাখবে।' 'তার জন্যে তিনটে মাস্টার রেখেছি, অঙ্কে খুব মাথা, আমার ধারা পেয়েছে আর কি।'

'তোমার বৌদি তো তাকে সব বাটা খাওয়ায়।' একটু লাজুক হেসে খানিক চিন্তা ক'রে ন্যাড়াদা বললেন, 'তবে হ্যাঁ, অতবড় শরীরের মধ্যে মনখানা বড় নরম। একেবারে আমার মতোই তো হবে, নাকি বলো?'

আমি আর কি বলি? পৃথিবীতে এটাও তো কম প্রথম নয় যে জন্মসূত্রহীন সন্তান পাচ্ছে তার পালক-পিতার শরীর আর স্বভাবের ধরন। আমি জিগ্যেস করি, 'লেখাপড়া কেমন চলছে কলেজে? নৈহাটিতে পড়ছে তো?'

: হ্যাঁ, ঐ ঘোষপাড়া রোড থেকে ৮৫ নম্বর বাসে যায় আসে। মাঝে মাঝে খুব গোলমাল বাধে। ছেলেটা অন্যায় অবিচার সইতে পারে না। একটু নকশাল প্যাটার্নের হয়েছে তো।

নকশাল প্যাটার্ন? তার মানে প্রতিবাদী। ভাবলাম, মন্দ কি। ন্যাড়াদার বাড়িতে সুখ শান্তি সাফল্য স্বাচ্ছন্দ্য সবই তো আছে। কেবল প্রতিবাদটা প্রথম আসছে অনাথ শিশুর রক্ত থেকে।

এর পরের ঘটনার ধারা দ্রুত ঘটে গেছে, আমি পরে জেনেছি। সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে ন্যাড়াদার সব টাকা নিঃসাড়ে ক্ষয়ে গেছে। একদিন সন্ধেবেলা একদল যুবক এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ন্যাড়াদার দোনলা বন্দুক। বাড়িয়ে দিয়ে গেছে তাঁর রক্তচাপ আর টেনশ্যন।

পরে একদিন হঠাৎই চলে যাই হালিশহরে। খবর পেয়ে নিজেই আসেন ন্যাড়াদা দেখা করতে। ম্লান পরাজিত মানুষ। চুপ করে বসে বসে কাঁদলেন। অনিচ্ছুক সুদর্শনকেও এনেছেন। তার মুখখানা থমথমে। সমস্ত শরীরে দারিদ্র্য আর ক্লিষ্টতার ছাপ স্পষ্ট।

'এই একটা জায়গায় হেরে গেলাম বাদল'—ন্যাড়াদা চোখ মুছে বললেন, 'ভেবেছিলাম ছেলের মতো একখানা ছেলে করব এই সুদর্শনকে। জলের মতো অর্থব্যয় করে আজ আমি ফকির। আজ চার বছর ছেলেটা বি. কম পাশ করে বসে আছে। দেশটা এত পালটে গেল?' খানিকক্ষণ থেমে ন্যাড়াদা বললেন, 'এই হালিশহরে আমি চিরকাল প্রথম সব কাজ করেছি। আর আজ সাধারণ হয়ে গেলাম? জানো, এই পাড়াতেই রয়েছে দশজন গ্রাজুয়েট?'

কোনো জবাব ছিল না। নীরবে ন্যাড়াদাকে বাড়ি পৌঁছতে গেলাম। সেই ভাঙা কামারশালার ধারে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ন্যাড়াদা আমার হাত দু-খানা জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বাদল, সুদর্শন তোমার আপন ভাইপোর মতো। ওর জন্যে তুমি একটা কিছু কোরো।'

টুপটুপ পড়ছে রক্তরঙের শিমুল। সেই রঙ দেখলাম জ্যাড়াদার চোখে। বুঝলাম আত্মগর্বী মানুষটা এই প্রথম ভিক্ষা চাইলেন।

* * * *

একসময়ে চাকরির সুবাদে শ্যামনগর-তেলিনিপাড়া ঘাটে নৌকো পারাপার করতে হতো। মাঝে মাঝে একই নৌকোয় পার হতেন সত্যচরণ সাধুখাঁ। ভদ্রেশ্বরের মানুষ, কাজ করতেন শ্যামনগরের কাছের এক জুট মিলে। বলেছিলেন পৈতৃক চাকরি। তার মানে?

খাকি হাফপ্যাণ্ট শাদা হাফশার্ট পরা সত্যচরণ বুঝিয়েছিলেন পান চিবোতে চিবোতে, 'ভদ্রেশ্বর-চন্দনগরের লোক তো আমরা। মাল খেয়ে আমাদের অন্ন-প্রাশন হতো বুয়েচেন। ছোট্ট বেলায় বয়ে গিয়েছিলাম ত। তা বাপ আমার নড়া ধরে চটকলের লালমুখো গোরা জন সায়েরের পায়ের কাছে নিয়ে ফেলে বললে—'আই সন স্যার'। আই সন মানে মাই সন আর কি। সেই চাকরিতে জুতে দিলে। আর আজও গোলামি করছি।'

: কত বয়েস হলো?

: আসলে পঁয়ষট্টি। চটকলের খাতায় আছে আটান্ন। ও-সব বাপের কেরামতি। হরসকোপ না এপিঠ-ওপিঠ কী সব করে যেন বয়েস কমিয়ে দিয়েছিল। কেন জানেন? ঘোর ব্যাটা সংসারের ঘানিতে। বদ্‌খেয়াল ঘুচে যাবে।

: খুব বখে গিয়েছিলেন নাকি?

: সে-সব ভাবলে এখন হাসি পায়। কত সৈরভী বাতাসী হরিমতী আর পান্নার ঘরে বসেছি। ফরাসডাঙার কাপড় পরে সে সব কত কাপ্তানী! তবে মনে পাপ ছিল না। যত পাপ এই দেহে, বুয়েচেন?

'কেলাস সেভেন' পর্যন্ত বিদ্যে এই সত্যচরণ আসলে ঈঙ্গ-ফরাসী মফস্বলের এক জাগ্রত নমুনা। তাঁর মতে চন্দনগরও আর সে চন্দনগর নেই। কেন? না সেখান-কার মদে এখন আর মনে রঙ হয় না। তিনি কখনও কলকাতাতেও যান না। কেন? 'গিয়ে কি হব্যা? সে তো দোআঁশলা জায়গা'। এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে দশ মিনিটের নৌকাবিহার দিব্যচক্ষু উন্মোচনের পক্ষে যথেষ্ট। মানুষটাকে নাড়াচাড়া করতে ভালোই লাগতো। কেবল মুশকিল যে বড়ই মুখ আল্‌গা। আর মাঝে মাঝে বলে উঠতেন 'আর সইতে পারি নে মা ধরণী, দ্বিধা হও'।

মাংস খেতে ভালোবাসতেন আর মাছ। বলতেন 'মশাই আমি মাতৃভক্ত। মাছ মানে মা আছ। মাংস মানে মায়ের অংশ।' আমি অবাক হয়ে মানুষটাকে

দেখতাম আর ভাবতাম চারদিকে এতসব পালটে গেল অথচ সত্যচরণ ধরে আছেন সেই তেলিনিপাড়া-গোঁদলপাড়া-ভদ্রেশ্বরের কবেকার হারিয়ে যাওয়া জীবনকে। তবে কি কোনো পরিবর্তনই তাঁর চোখে পড়ে না? একদিন জিগ্যেস করেই বসলাম, 'এতসব পরিবর্তন চারদিকে আপনি খেয়াল করেন না?'

: পরিবর্তন? কই? ও হ্যাঁ কিছু কিছু শব্দ পালটেচে।

: শব্দ?

: হ্যাঁ। মনুমেণ্ট হয়েছে শহীদ মিনার। রাইটার্স হয়েছে মহাকরণ। হাওড়া ব্রিজ হয়েছে রবীন্দ্র সেতু।

: এই শুধু? আর কিছু পালটায় নি?

: হ্যাঁ, হেড ক্লার্ক এখন হেড অ্যাসিসট্যাণ্ট, ক্লার্ক এখন ডিলিং আসিস্ট্যাণ্ট, আর্দালী আর বেয়ারা এখন ডি গ্রুপ স্টাফ।

আরে, এ তো খুব চোখ-খোলা মানুষ দেখছি। একজন সহযাত্রী বললেন, 'সত্যবাবু, এ-সব পাল্‌টাতে মগজ লাগে তো?'

: তা লাগে, তবে পয়সা বেশি লাগে না।

: মানে?

: মানে আর কি? ডালহৌসিকে বি. বা. দী. বাগ করতে ক পয়সা খরচ? এসপ্লানেড, বললেই হলো সিধু কানু ডহর। খরচ কাদের জানেন? ঐ সব পাণ্টানো রাস্তায় যাদের দোকান আছে। পাণ্টাও সাইনবোর্ড, পাণ্টাও ক্যাশমেমো।

আমি বললাম, 'সত্যবাবু, লেখাপড়ার জগতে কী পরিবর্তন দেখছেন?'

: কলেজ হয়েছে মহাবিদ্যালয়, ম্যাট্রিক হয়েছে মাধ্যমিক। আমাদের সময় পাশ করতে না পারলে বলতো ফেল করেচে, এখন বলে ব্যাক পেয়েচে। আগে ম্যাট্রিক পাশ করলে সবাই জলের মতো ইংরিজি লিখতো, এখন বি. এ. পাশ দিয়েও ইংরিজি লিখতে পারে না।

মধ্যগঙ্গার জল সত্যচরণের রসিকতায় চলকে ওঠে। যাত্রীরা হাসিতে টাল-মাটাল। চন্দননগর হাসপাতালের এক নার্স যাতায়াত করেন একই নৌকোয়। তাঁর দিকে চেয়ে সত্যচরণ বলেন, 'এই মিসিবাবাদের হাসপাতালে এখন কতই নতুন কথার আমদানি।'

: কী রকম?

: রুগিকে বলে পেশেণ্ট, ডাক্তারকে বলে এস্‌পেসালিস্ট, খাওয়াদাওয়াকে বলে ডায়েট আর…আর…বলব?

বুঝলাম সত্যচরণের মুখের আগল খসবে তাই সাবধান করতে যাব এমন সময় তিনি শ্যামনগরের কালীবাড়ির দিকে পূর্বাস্য হয়ে বললেন, 'আর পেট-খসানোকে বলে এম. টি. পি.। হে মা ধরণী, দ্বিধা হও।'

সত্যচরণকে পাওয়া গেল আবার পরদিনই। নৌকোর নিচু ছইয়ের মাথায় দু-জনে বসলাম। বললাম, 'কালকে আপনি যেসব পরিবর্তনের কথা বলছিলেন তার মধ্যে তিনটে প্রধান বিষয় বাদ গেছে। এক হলো সিনেমা'···

বাধা দিয়ে সত্যচরণ বললেন, 'আমরা বলতাম বই, এখন বলে ফিলিম। কেউ কেউ বলে ছবি। আগে বইয়ের হিরোইনদের বলত অমুক দাসী এখন বলে দেবী।'

আমি ফেরাতে চেষ্টা ক'রে বলি, 'আর খেলাধুলো?'

: খেলা আর আছে নাকি? আছে দল বদল। সেই সঙ্গে জুটেছে বিশ্বপাপ না কাপ কী যেন। আর আছে কতকগুলো গালভারি শব্দ।

: কি রকম?

: কোচ, স্টপার, লিঙ্কম্যান, স্ট্রাইকার, স্কিমার, উইঙ্গার। খেলা তো নয় যেন ম্যাথামেটিক্‌স্ কেননা বল এখন মাইনাস করে। আর কি বোলবো বলুন, আমাদের ব্যানডেল লাইনের বিখ্যাত কলা এখন খেলার মধ্যে ঢুকেচে।

: তার মানে?

: তার মানে ব্যানানা কিক। ঐ যে গো, সেদিন বলছিলো রেডিওতে অজয় বসু— চিমা বলটাকে ব্যানানা কিক ক'রে গোলে ঢোকালেন।

আমি বললাম, 'বাদ দিন ওসব অসৈল কথা। রাজনীতির কথা বলুন।'

'রাজনীতির কতা বলবার আর কি আচে, সব ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁই' সত্যচরণ খইনি মুখে পুরে বললেন, 'এখন রাজনীতি মানে শহীদ বেদী, শহীদ মিনার, সিধু কানু ডহরে অবস্থান। আর আচে পেটো, চেম্বার। আছে ঘেরাও আর চলবে না চলবে না।'

: আর কিছু নেই রাজনীতিকে?

: আচে কতকগুলো আলফাবেট, ইংরিজির।

: মানে এ বি সি ডি? সেকি?

: শুনিন তাহলে, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বুঝে নিন। ডি.এম.কে, এ.আই.ডি. এম.কে, বি.জে.পি, সি.পি.আই.এম, সি.পি.আই.এম.এল, আর.এস.পি, এস.ইউ. সি.আই, আর.সি.পি.আই, আর.সি.পি.এম.এল, কি? আর বোলবো?

: এখনও আছে ?

: বর্ণমালা সাবাড় ক'রে দিয়েছে রাজনীতি। এখনও অনেক আচে, শুনবেন ?

: থাক, থাক।

: এখনও অভিনন্দনের কতা বলিনি, রঙের কতা বলিনি।

: সেটা আবার কি ?

: জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন, লালসেলাম, গৈরিক অভিনন্দন। আবার সেদিন হলো কি জানেন ? চন্নগর কলেজে ভোট হয়েচে। এপার থেকে বুঝতে পারচিনে কোন্‌দল জিতলো—এস. এফ না সি. পি। নৌকোর ছোকরাদের বললুম, 'ত্যাখ্‌তো কি রঙের ধুলো উড়ছে'। সবুজ আবীর মানে সি. পি। লাল আবীর মানে এস. এফ। কি বুঝলেন ?

: বুঝলাম সবই রঙিন।

রঙিন কথাটা শুনেই কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন সত্যচরণ। একটু বুঝি অস্ফুটে, বললেন, 'হ্যাঁ, সবই রঙিন। নাঃ, এখন আর রঙিন কিছু নেই, সবই ফ্যাকাশে।'

: কিসের কথা বলছেন ?

সত্যচরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কি আর বোলবো আপনাকে। আমাদের চুঁচড়োর তোলাফটকের বেবুশ্যে মেয়েছেলে দেখেচেন কোনদিন ? শালার এই সমাজটা সেইরকম হয়ে গেছে। মাইরি বলচি একদম জেল্লা নেই।'

বাপরে, এ যে মাতালের মুখে কালীকেত্তন !

মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে অতি কষ্টে হাসি সামলাই। ততক্ষণে অস্তমান সূর্যের রঙে রঙিন সত্যচরণ আবার বলতে শুরু করেছেন, 'আগে মশাই, এসব অঞ্চলে মানে ভদ্দেশ্বর বদ্যিবাটি চুঁচ্‌ড়ো চন্নগর মানকুণ্ডুতে কত মেয়েছেলের খারাপ পাড়া ছিল। সব দিলরাঙানো চমকদার রূপুসী, বুঝলেন ?'

: বিশেষভাবে এসব জায়গাতেই কেন ?

: একে বলে গঞ্জ জায়গা। গঞ্জ্‌ নয় গঞ্জো। গঙ্গার ধারে কাছে তো ! টাকা সবসময় উড়চে আর ফোতো কাপ্তানের ভিড়।

: কেন ?

: কলকারখানা। ব্যবসা বেসাতি, জাহাজ নৌকো, তেজারতি বুঝলেন ? কাঁচা পয়সার কারবার। আবার চটকল, তাতে ছত্রিশ জাতের আমদানী। এখানে খুব টাকার গরম। ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ সব এখানে থেকে গেচে।

তাদের দাপও যেমন তাপও তেমন। সে দাপ আর তাপ কমাবে কে? সেইজন্যে রাঁড় লাগতো। তাদের ঘরবাড়ি থেকে ফুসলে আনার জন্যে আড়কাঠি থাকতো বুঝেছেন? ফরাসীরা খুব প্রেমিক জাত তো। মাল আর রাঁড় তাদের নিত্যনতুন চাই। তা সেসবের অভাব কি?

: কি ভাবে আসতো?

: এই দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পুজো, রথ, কার্তিক পুজো এ সবের রবরবা এখানে খুব। আশপাশের গাঁ-গুলো ভেঙে লোক আসতো সে সব দেখতে। ছোটলোকের ভিড় তার দশ আনাই ছিল মেয়েমানুষ। বয়স্থা, কুমারী, বেধবা, বরে-নেয়না, আঁটকুড়ো সবরকমের টাইপ। নিজের সমাজে তাদের খুব একটা টান ছিল না। খুব হেনস্থা ছিল কিনা।

: তারপর?

'তারপর আর কি' সত্যচরণ আরেকবার খইনি নিয়ে বলেন, 'তারপরে মেলাখেলায় এসে ঐসব উপুষী হুতুশী মেয়েছেলে হারিয়ে যেত।'

: হারিয়ে যেত?

: আহা হারাতো কি আর? বাচ্চা নাকি? ঐ মানে আড়কাটিদের হাতে পড়তো। আসনাই হ'তো। তারপরে ফোতো কাপ্তানদের রক্ষিতা। তারপর আরো শুনবেন? তারপর পাঁচহাত ঘুরে শেষপজ্জন্ত এইসব খারাপ পাড়ায় আসতো। মনে রাখবেন এটা আপনার মফস্বলও নয়, সিটিও নয়, এ হ'লো গঞ্জো জায়গা।

: কি বললেন? মফস্বলও নয় সিটিও নয়, তার মানে?

'ও মশাই, সেটাও জানেন না! মফস্বল হ'লো অজ জায়গা, কিছু নেই কিছু নেই। তবে হ্যাঁ সিটি বেশ ভালো জায়গা, যেমন বর্ধমান সিটি, কেষ্টনগর সিটি, লালবাগ সিটি—এসব রাজা বাদশার জায়গা ছিল তো, খানদান আছে। তবে গঞ্জো গঞ্জোই। এই যেমন আমাদের চন্নগরের লক্ষ্মীগঞ্জো। মূলে এই লক্ষ্মীটা কে? একজন বেবুশ্যে। ধুস্ এখন সব গেচে, তেমন আর কই?

: আর নেই?

: নেই কি আর? আচে। তবে দেখবেন চুঁচড়ো চন্নগরে এক একটা বাড়িতে আজকাল লিকেচে—'গৃহস্থ বাড়ি, বিরক্ত করিবেন না'। তার মানে কি বুঝলেন? পুরোনো মাতালদের সাবধান করচে। আগে ঐসব বাড়িতে বেবুশ্যে থাকতো। কত ফুর্তি করেচে। এখনও মালের ঘোরে দরজায় টোকা মেরে বলে, 'ওলো সই বকুলবালা, বলি ঘরে আচো না মরেচো'?

'তাহলে এখন এ সব এলাকা ভদ্র সভ্য হয়ে গেছে সেটাও বলুন' আমি আশ্বস্ত হয়ে বলি।

'ভদ্র সভ্য? হ্যাঁ, সব খুব ভদ্র সভ্য ব্যাপার আজকাল' সত্যচরণ ব্যঙ্গের হাসি মুখে ফুটিয়ে বললেন, 'মানুষ এখন খুব উদার হয়ে গেছে হটাৎ। কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেখেন? লেখা থাকে—অসবর্ণে আপত্তি নাই, বিধবায় আপত্তি নাই, ডিভোর্সিতে আপত্তি নাই, কি বুঝলেন?'

আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে সত্যচরণ বললেন, 'আরে মশাই, খারাপ মেয়েছেলেরা আজকাল সতী নকৃথী হয়ে ঢুকে পড়চেন ভদ্দরলোকের বাড়িতে। এখনকার দিনে যারা হারিয়ে যায়, পালিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, তারা আর খারাপ পাড়ায় গিয়ে ওঠে না। দিব্যি ব্যানারসী প'রে হয়ে যায় উদার গেরস্থ বাড়ির বউ। মা ধরণী, দ্বিধা হও।'

* * * *

আমাদের ছোটখাটো শহরে কতদিন আছি। অলস, বৈচিত্র্যহীন। সামনের রাস্তার দু-পাশে দেবদারু আর রাধাচূড়ার অ্যাভেনিউ। মাঝে মাঝে গুলমোহর। তার পাতা ঝরে, পাতা জাগে, ফুল ফোটে, এই সজীবতাটুকু নিয়েই যেন বেঁচে থাকি। সামনের নাকের ডগার একটা সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে দু-তিন বছর অন্তর ভাড়াটে বদলায়। সেটা একটা বৈচিত্র্য। ক-দিন কৌতূহল থাকে কে এলো কে এলো? গিন্নি খবর আনেন ছাদ থেকে কিংবা কন্যা পাড়া থেকে। কখনো ডাক্তার, কখনো বাস্তুকার, কখনো অধ্যাপক। সবই সরকারি লোক। ফ্ল্যাটের মালিক হিসেবি মানুষ। বলেন, 'মশাই, বাড়ি ভাড়া দেব সরকারি লোককে। ভাড়া বকেয়া থাকবে না। ফার্নিচার কম। ঠিক তিন চার বছরের মাথায় বদলি। ব্যাস, ঘরে ঘরে কলি চুন ফিরিয়ে এক লপ্তে ভাড়া বাড়াও। মেনটিনেন্সও হলো, আর্থিক লাভও হলো।'

এবারে খবর এলো নতুন ভাড়াটে মধ্যবয়সী ডাক্তার। তা বেশ, বাড়ির সামনে একজন ডাক্তার থাকা ভালো। বিশেষত রাতবিরেতে। 'উঁহুঁ, সে গুড়ে বালি' গিন্নি বলেন, 'নতুন ডাক্তার ডারমাটোলজিস্ট।' তার মানে চর্মরোগবিশারদ। সদর সরকারি হাসপাতালে কুষ্ঠনিবারণী বিভাগে এসেছেন। কুষ্ঠ? চর্মরোগ? বাব্বা। সবাই মানুষটাকে যেন অস্পৃশ্য ভাবলো। অচিরে ঝি খবর আনলো পঞ্চাশ-পেরনো ডাক্তার বিয়ে করেন নি, সঙ্গে আছে চাকর। সর্বনাশ, ডাক্তার বিয়ে করে নি? তা হলে নিশ্চয়ই চরিত্রহীন। পাড়ায় মেয়েমহলের নির্ভরযোগ্য রায়।

পাড়ায় ডাক্তার ভাড়াটে হলে সাধারণত যুবকরা উৎসাহিত হয়। ফাংশনে মোটা চাঁদা দেন ডাক্তার, চেম্বারে অপেক্ষারতা কমবয়সী রোগিণীদের ভিড়িক দেওয়া যায়, তা ছাড়া অবরে সবরে বিনে পয়সায় কিছু ট্রাংকুইলাইজার। নতুন চর্মরোগের ডাক্তার সম্পর্কে যুবকরাও নিরাশ হলো। মফস্বলে চর্মরোগের রুগি ভিজিট দিয়ে ডাক্তার দেখাবে? অসম্ভব। সুন্দরী মেয়ে চর্মরোগ দেখাতে আসবে? ছিঃ, তা হলে কেমন সুন্দরী সে?

মোটকথা সবাই যখন হতাশ তখন আমি তৎপর হলাম। হাজার হলেও ডাক্তার তো! আমাদের পাড়ায় এসেছেন। সঙ্গে স্ত্রী পর্যন্ত নেই। তাই অগত্যা একদিন গেলাম বিকেলে। পর্দা ঠেলে ঢুকে বললাম, 'আলাপ করতে এলাম ডাক্তারবাবু। সামনের বাড়িটা আমার। কলেজে মাস্টারি করি।'

ব্যাচিলর হলেও ডাক্তার বেশ শৌখিন মানুষ। চমৎকার চুনট-করা ধুতি আর গিলেকরা পাঞ্জাবি প'রে সোফায় ব'সে 'ইণ্ডিয়া টু ডে' পড়ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা করলেন, 'আসুন আসুন। আমি ডাক্তার সুধাংশু কর। কলকাতার মানুষ। সরকারি চাকরি করতে গিয়ে মফস্বলেই জীবন কাটল। বালুর-ঘাট থেকে আসছি।'

প্রথম দর্শনে হতাশ হবার মতোই। মাথায় টাক, খুব বেঁটে, বেশ কালো। বয়স অন্তত পঞ্চান্ন। নিশ্চয়ই তিতিবিরক্ত স্বভাবের হবেন। কিন্তু অনুমান পাল্টে গেল দশ মিনিটে। খুব আলাপী, মেজাজী, খোলামেলা মানুষ। জানা গেল ভালোবাসেন থিয়েটার দেখতে ও করতে। খোঁজ নিলেন এখানকার নাট্যদল বিষয়ে। ভদ্রলোক খেতে ভালোবাসেন এবং খাওয়াতে। একজন রান্নার মহিলা পেয়েছেন কিনা জিগ্যেস করতেই বললেন, 'মেয়েমানুষে আবার রাঁধবে কি? ওদের তো মাত্রাজ্ঞানই নেই। ভোজকাজে কারা রাঁধে? হোটেলে কাদের রান্না খান? বড় বড় ক্লাবে, জাহাজে, পার্টিতে কারা রাঁধে?'

নারীবিদ্বেষী নাকি?

হঠাৎ বললেন, 'গায়ের রঙ আমার ঘোর কালো কিন্তু মনটা শাদা। শাদা মনে কাদা নেই। অনেক শ্বেতীও সারিয়েছি।'

'ভালো কথা মনে পড়েছে' আমি বললাম 'হঠাৎ চর্মরোগবিশারদ হলেন কেন?'

: প্রিসাইসলি তিনটে কারণে। এক, আমি মশাই ঘুমোতে ভালোবাসি—এ ডাক্তারকে কেউ রাতে ডাকবে না। দুই, চর্মরোগে রুগি মরে না, কাজেই হাসপাতালে হুজ্জৎ হবে না। তিন, চর্মরোগের চিকিৎসা খুব সোজা।

: কেন ?

: যত রকমের চর্মরোগ হয় তার মধ্যে নব্বইভাগ সারে না। ওষুধ দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হয়। ড্রাগও খুব স্পেসিফিক, মোট আট দশ রকম। বেশি লিটারেচার ঘাঁটতে হয় না। চেম্বারে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের ভিড় নেই। খাসা আছি। খাই-দাই, নাটক করি, নাটক দেখি।

আমি বললাম, 'বিয়ে করেন নি কেন ? তারও কি প্রিসাইস কোনো কারণ আছে নাকি ?'

: সব চেয়ে বড় কারণ আমার বাবা-মা।

: মানে ? তাঁদের আপত্তি ?

: না না, তাঁরা কবেই দেহ রেখেছেন। আসলে আমাদের বাড়িতে শেষ বউ নিয়ে আসেন আমার বাবা। সেই বউ অর্থাৎ আমার মা নিয়ে আসেন আমাকে আর তার পর চার চারটে বোনকে। ব্যাস্, বাবা তো চোখ বুজলেন। এবারে বুঝুন চারখানা নেগেটিভ নিয়ে আমার বিপদ।

: নেগেটিভ ?

: মেয়েদের মধ্যে পজিটিভ আপনি কি দেখেন ? সবটাই নেগেটিভ ভ্যালু। আমার চারটে বোনকে বিয়ে দিতে গিয়ে জমানো টাকাও শেষ, মাথার চুলও সব সাফ। বিয়ে করি নি আর। আর বিয়ে করতে ভয়ও পাই। যদি আমার আবার গুচ্ছের নেগেটিভ হয় ?

'ব্যাচিলর লাইফে অসুবিধে হয় না ? রান্নাবান্না, চা-করা, ঘর গুছোনো…' আমি জানতে চাই।

: আসলে আমার জীবনযাপন খুব সংক্ষিপ্ত। এক, আই ডোন্ট টেক টি। মিটে গেল। দুই, রান্নাবান্না। মুড না থাকলে রাঁধি না। দুটো বড় টিফিন কেরিয়ার আছে। হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে খাই। তিন, ঘরগুছোনো। একজন চাকর আছে। সেই গুছোয়। জামাকাপড় কাচে, ইস্ত্রি করে, গিলে করে। ব্যাস্ মিটে গেল। আমার মা ছোটবেলা থেকে সব সময় বলতেন 'ওরে সংক্ষেপ কর্, সব কিছু সংক্ষিপ্ত কর্'। তা মাতৃবাক্য অলঙ্ঘনীয়। সংক্ষিপ্ত করতে করতে আজ এই দশা। চেহারা সংক্ষিপ্ত, চুল সংক্ষিপ্ত, জীবনযাত্রা সংক্ষিপ্ত। মাঝে মাঝে বুঝলেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সলিলোকিতে বলি : 'কী তোমার প্রকৃত নাম বাপু ? সুধাংশু কর না সংক্ষিপ্ত কর ?'

অচিরে দেখা গেল পাড়ায় সকলের কাছে ডাক্তার খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছেন।

তাঁর ঘরে সকলের অবারিত দ্বার। সেই সুযোগে পাড়ার যুবকরা তাঁকে যখন-তখন যে কোনো উপলক্ষে টুপি পরাচ্ছে। পুজো প্যাণ্ডেলে ডাক্তার করের উৎসাহে সেবার নাটক হলো। খরচের বড় অংশ তাঁর। কেবল শর্ত একটাই : নাটকটি হতে হবে নারীবর্জিত।

বস্তুত মহিলাদের সম্বন্ধে এত অ্যালার্জি আমি বড় একটা দেখি নি। আমার দুই মেয়ে। সে-কথা শুনেই বললেন, 'কী সর্বনাশ, ডবল নেগেটিভ? তার মানে বোঝেন? আপনার লাইফ মশাই হেল হয়ে যাবে।'

: কেন?

: টাকা লসের কথা ছেড়েই দিন। একটা বাজে অর্থলোভী লোককে বলতে হবে বেয়াইমশাই, চ্যাংড়া জামাইকে বলতে হবে 'এসো বাবা'।

আমি বললাম, 'চর্মরোগের মতোই দুরারোগ্য আপনার মহিলাতঙ্ক। বুড়ো-বয়সে বুঝবেন। কি মশাই, কেউ কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা দিয়েছিল নাকি?'

ডাক্তার কর জিভ কেটে বললেন, 'আরে ছোঃ, কী যে বলেন। ক্লিন বডি অ্যাণ্ড মাইণ্ড। দেখছেন না এত ইনফেকশাস রুগি ঘাঁটি তবু চর্মরোগ নেই। সেইরকম দেখবেন মেয়েদের ব্যাপারে কোনো প্যাচ বা স্পট নেই আমার মনে। মেয়েরা কীরকম জানেন? অনেকটা আমাদের কনট্যাক্ট্ ডারমাটাইটিসের মতো।

: সেটা কি বস্তু?

: বেশ আছেন। শরীরে কোনো চর্মরোগ নেই। কিনলেন এক সস্তার চটি। তার কনট্যাক্টে চর্মরোগ বেধে গেল। একেই বলে···

কথায় বাধা দিল চাকর। তার জিজ্ঞাস্য 'আজ কি রান্না হবে?' ডাক্তার কর বললেন, 'ফ্রিজে ডিম আছে? আচ্ছা। আলু, ডিম আর মুসুর ডাল সহ ভাত চাপিয়ে দাও। এইসব খেলে নিজেকে কি মনে হয় জানেন? সিদ্ধপুরুষ। আলুসিদ্ধ ডালসিদ্ধ ডিমসিদ্ধ ভাতসিদ্ধ। গ্র্যাণ্ড।'

: কিন্তু নেগেটিভ থাকলে কত কি রান্না করে খাওয়াতো।

: এবং এই আড্ডাটা মাটি করে দিয়ে হাতে একটা চটের ব্যাগ ধরিয়ে বলতো 'বাজার যাও। অমুক আনো তমুক আনো। পাকা তেঁতুল এনো। দইয়ের সাঁজা এনো। লাউ কিনলে সঙ্গে চিংড়ি এনো।' ওঃ হরিব্‌ল্।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ডাক্তার কর ইনফেকশন এড়াতে পারলেন না। কে জানত যে সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগ নার্স ছাড়াও সোশ্যাল অফিসার নামে এক নতুন পদ সৃষ্টি করবেন সব বড় হাসপাতালে? এই সোশ্যাল অফিসার পদে আনকোরা নিয়োগ

পেলেন গ্রাজুয়েট মহিলারা। আমাদের সদর হাসপাতালে সোশ্যাল অফিসার হয়ে যোগ দিলেন সখীসোনা বসু। ডানাকাটা পরী নন, তবে চোখে ধরার মতো। বয়স চল্লিশ। তাঁর শরীরে যৌবন ব্যাপারটা অবশ্য যৌ-তে নেই আর, তবে ব-তে আছে, ন-তে ঢলে পড়ে নি। ইনফেকশনটা এল সেই পথে।

আর কি সংক্ষিপ্ত থাকতে পারে জীবন? জানলায় রঙ বাহারি পর্দা এলো প্রথমে, তার পরে ডাবল বেড পালঙ্ক, ড্রয়ার লাগানো আয়না। আমরা সবই দেখছি। অবশেষে একদিন জানা গেল গতরাত্রে রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ডাক্তার সংক্ষিপ্ত কর বিশদ হয়েছেন। সকালে গিন্নি দেখালেন, 'ঐ দ্যাখো ছাদে রঙিন শাড়ি ঝুলছে।'

আর অপেক্ষা করা চলে না। সোজাসুজি চলে গেলাম ডাক্তার সকাশে। সহাস্যে বললেন, 'আসুন আসুন, বসুন, চা খান।'

: চা?

: হ্যাঁ চা। আজ থেকে চালু হলো।

আমি বললাম, 'কীভাবে আপনাদের পজিটিভ-নেগেটিভ ব্যাপারটা হলো? প্লেন ইনফেকশ্যান না কনট্যাক্‌ট্ ডারমাটাইটিস?'

হা হা করে হাসলেন প্রথমে খানিকক্ষণ। তার পরে আলাপ করিয়ে দিলেন সখীসোনা করের সঙ্গে। তিনি চা বানাতে ভেতরে যেতে ডাক্তার খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বললেন, 'ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাই তা হলে। কখনও গড়িয়া ছাড়িয়ে সোনারপুর রাজপুর ঐ-সব দিকে গেছেন? মনে করুন একা ঐ দিকে বেড়াতে বেড়াতে কখন বেশ রাত হয়ে গেছে। রিকশা নেই, গড়িয়ার মোড় বহুদূর। হঠাৎ শুনলেন একটা লাস্ট বাস আসছে। কী করবেন? লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে উঠে পড়বেন, না সারাপথ হেঁটে ফিরবেন একা একা?'

তিন কাপ ধূমায়িত চা নতুন ট্রে-তে করে নিয়ে সলজ্জে ঢুকলেন সখীসোনা। ডাক্তারবাবু বললেন, 'এই আমার সেই লাস্ট বাস।'

*　　*　　*　　*

আধা শহর জীবনের একটা বড় অঙ্গ তার সেলুন। কলকাতার সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে দেখেছি কেমন যেন তাড়া সদাসর্বদা। তা ছাড়া এক ঘরে জন পাঁচ-ছয় লোক চুল-দাড়ি কাটছে আর জনা-দশেক লোক অপেক্ষা করছে এই দৃশ্য খুব রোচক নয়। কেমন যেন দম আটকানো, অস্বাস্থ্যকরও। আধা শহরের সেলুনে খুব একটা ভিড় থাকে না সাধারণত। খদ্দের কম তাই একজন দুজন ক্ষৌরকার

কাজ করে, বেশির ভাগ সময় সিট খালি থাকে। আমি একদা যখন মহিষাদলে থাকতাম তখন একটা সেলুন কিংবা সত্যি বলতে কি সেই সেলুনের মালিক রেণুপদ বেজ মশায়ের প্রেমে পড়েছিলাম। এমনও হয়েছে যে চুল তেমন বড় হয় নি হয়তো তবু স্রেফ রেণুপদ নামক অলৌকিক নরসুন্দরের সঙ্গ পাবার লোভে ঢুকে পড়েছি সেই সেলুনে। স্মিত হেসে তিনি বসিয়েছেন চেয়ারে। সামনে সাবেক বেলজিয়ান কাঁচের মস্ত আয়না। তাতে একই সঙ্গে মুকুরিত আমার সকৌতূহল মুখ আর তাঁর হৃষ্ট ভাবভঙ্গি।

কিন্তু তার আগে রেণুপদ-র সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের কথা বলতে হয়। সেই আধোচেনা জায়গায় সেবার চুল কাটার খুব দরকার হলো। বাজারের রাস্তায় হাঁটছি আর নজর রাখছি কোনো সেলুন যদি পাই। পেয়ে গেলাম হঠাৎ। সেলুনের নাম 'জনপ্রিয় সেলুন'। সাইনবোর্ডে আরও লেখা : 'বয়স শিক্ষা স্বাস্থ্য ও রুচি অনুসারে সাধারণ ও বুনিয়াদী ভিত্তিতে চুল ছাঁটা হয়'।

বুনিয়াদী শিক্ষা কথাটা খুব চালু ছিল সে-সময় কিন্তু ভাবলাম বুনিয়াদী ভিত্তিতে চুল ছাঁটা ব্যাপারটা কী হতে পারে ? বলতে গেলে ঐ বিচিত্র বিজ্ঞাপনের ভাষাই আমাকে জনপ্রিয় সেলুন আর তার মালিক রেণুপদ-র প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রেণুপদ মানুষটি বয়স আন্দাজে বেশি বুড়োটে। চুল সব শাদা। তবে আচার-ব্যবহার খুব ভালো, গলার স্বর খুব সরু। সুইং দরজা ঠেলে ঢুকতেই খুব খাতির করে বসালেন। বড় বেলজিয়াম কাঁচের আয়নাটা বেশ সম্ভ্রম আদায় করেছিল মনে আছে। আয়নার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল উল্টোদিকের দেওয়ালে-টাঙানো বাণী : 'এইসা দিন নাহি রহে গা'। ততক্ষণে রেণুপদ তাঁর হাতের কাজ শুরু করেছেন বেশ ধীরে ধীরে। কাঁচিতে একটু হাত বুলোন, চিরুনি পরিষ্কার করেন। আমি সিটে বসে বললাম : 'সাইনবোর্ডে যা লিখেছেন তার সবই স্পষ্ট কিন্তু বুনিয়াদী ভিত্তি ব্যাপারটা কি।'

মুখের ফাঁকে মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার হাতে বেশ খানিকটা সময় আছে তো ? তা হলে ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে বলতে পারি। তার আগে দেখুন ঐ দেয়ালে কি লেখা।' ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম :

গীতাখণ্ড ইক্ষুদণ্ড গিলিলে আস্বাদ নাই।
গুরু পাশে বসে বসে সরসে চিবানো চাই ॥

কাঁচির আওয়াজ তুলে রেণুপদ বললেন, 'অর্থাৎ সব জিনিসের ব্যাখ্যা করে বুঝতে হয়। যেমন ধরুন, আমাদের নরসুন্দর বলে কেন, জানেন কি ?'

: না তো। বলুন শুনি।

নরকে সুন্দর করে যে সেই নরসুন্দর। কী ভাবে সুন্দর করে? ঠিক ভাবে চুল কেটে। এখন বুঝতে হবে চুল কি এবং চুল কেন। বলতে পারেন?

বলতে চাইছিলাম চুল এক মহা উৎপাত বিশেষ। যার জন্যে মাসে একবার করে মেনে নিতে হয় অসহ্য বন্দীত্ব। এই চুলের জন্যে নিগ্রহও কম হয় নি। বিশেষত ইস্কুলে। মাস্টারমশাই তো চুলের মুঠো ধরে টানতেন কিনা। সে-সব কথা না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকি। রেণুপদ মহা উৎসাহে শুরু করেন, 'ভেবে দেখুন, মাছের যেমন আঁশ, পাখির যেমন পালক, ফলের যেমন আলকুশি, মানুষের তেমনই চুল। চুল মানুষকে রক্ষা করে ঠাণ্ডা গরমে আঘাতে। সেই চুল আবার



সুন্দর করে কেটে, আঁচড়ে, তেরি কেটে মানুষ নিজেকে সুন্দর করে সাজায়। তা হলেই আমাদের দায়িত্বটা বুঝুন। ভগবান তো আমাদের জাতটাকে এক বিরাট কাজের ভার দিয়েছেন। নরকে সুন্দর করাই কাজ আমাদের। তো সেটা বয়স শিক্ষা স্বাস্থ্য আর রুচি অনুযায়ী করতে হবে তো? আবার ধরুন বড়ঘরের মানুষজনের চুল কাটতে হবে বুনিয়াদী ভিত্তিতে। বুঝলেন? যেমন ধরুন সপ্তাহের ছটা দিন আমাকে পাবেন এ দোকানে। রবিবারে বন্ধ। কেন? না ঐদিন মহিষাদলের সব বুনিয়াদী ফ্যামিলিতে আমার যেতে হবে চুল কাটতে।'

বুনিয়াদী কথাটার মানে ততক্ষণে আমার বোধগম্য হয়েছে। এবারে তাই বলি, 'আপনি তা হলে এখানকার উচ্চ সমাজেও জনপ্রিয় ?'

সলজ্জে মাথা নেড়ে বললেন, 'তা বলতে পারেন। তিনপুরুষের কারবার তো। আমার বাবা চারুপদ-র হাতের কাজের খুব নামডাক ছিল। আমারও সুনাম আছে। আমার হাতের কাজ বিলেত আমেরিকাতেও গেছে।'

আয়নায় রেণুপদ-র গর্বিত মুখচ্ছবি। হাতের কাজ বিলেত আমেরিকা গেছে শুনে নড়ে-চড়ে বসি। জিগ্যেস করি, 'আপনার হাতের কাজ বিদেশ গেছে মানে ?'

: মানে খুব সোজা। ধরুন আমাদের মহিষাদলের বিখ্যাত বুনিয়াদী ফ্যামিলি গর্গ বাড়ির ছোটছেলে সেবার আমেরিকা গেল। যাবার আগের দিন গর্গ বাড়ি ডাক পড়লো আমার। সুন্দর করে তার চুল ছেঁটে দিলাম। পরদিন মোটরে করে কলকাতা-দমদম। সেখান থেকে প্লেনে চড়ে দিল্লি। দিল্লি থেকে আমেরিকা। ব্যাস্ আমার হাতের কাজ চলে গেল আমেরিকা। এবারে বুঝলেন ?

বুঝলাম যে মানুষটা যাকে বলে রসখাজা টাইপ। জমবে ভালো। আসার সময় চুল-কাটার নির্দিষ্ট রেটের চেয়ে বেশিই দিলাম একটা টাকা। রেণুপদ বললেন, 'আবার আসবেন।'

সে আর বলতে ?

অচিরে রেণুপদ আর জনপ্রিয় সেলুন আমাকে হণ্ট্ করতে থাকল। নানা ছুতোয় যেতাম। এমনকি দাড়ি কামাতেও। বিশেষত সন্ধ্যার পর মানুষটার কথাবার্তার ভাঁজ খুলে যেত। সে-সময় রেণুপদ-র একমাত্র সহকারী তাঁর সন্তান শশিপদ থাকতো না। তার বিকেলের পরে ছুটি। এই অবসরে রেণুপদ আমার সামনে খুলে ধরতেন তাঁর ধ্যানের জগৎ, তাঁর দর্শনের কথা। আমারও আধোচেনা জায়গায় দিব্যি সময় কেটে যেত। একদিন বললেন, 'যখন খদ্দের থাকে না বাইরের রকে চেয়ার পেতে বসি। মানুষজন দেখি। মানুষই তো সব চেয়ে বড় শিক্ষক। অবসরে একটু-আধটু ধাঁধা বানাই। মানুষই অবশ্য সব চেয়ে বড় ধাঁধার সামগ্রী, নয় কি বলুন ?'

: একটু ব্যাখ্যা করুন।

: হ্যাঁ ব্যাখ্যা করবো তো বটেই। ধরুন মানুষের দেহ। কেবলই পাল্টায়। তবে আমাদের বাঙালি ঘরে সৌন্দর্য নেই। যা-কিছু সৌন্দর্য সব শৈশবে। এ যেন দিশি কুকুরের বাচ্চার মতো। দেখেছেন দিশি কুকুরের বাচ্চা ? চমৎকার

জিনিস। কী সুন্দর রূপ। তার পরে যেই বড় হয় সঙ্গে সঙ্গে থেঁকি রূপটা বেরিয়ে পড়ে। বড় অসুন্দর।

আমি মানুষটার দিকে সমজদারী চোখে চাই। বলি, 'জীবনের সব রহস্যের ব্যাখ্যা জীবন দিয়ে পাবেন কি ?'

: দেখি, চেষ্টা তো করি। আর মাঝে মাঝে ধাঁধা বানাই।

: একটা ধাঁধা বলুন তো ?

: শুনুন তবে,

কাঠের গাই আর মাটির বাছুর
গলা কাটলে দেয় দুধ

মানে কি ?

: বলতে পারব না।

: কাঠের গাই মানে খেজুর গাছ, মাটির বাছুর মানে কলসী। এবারে বুঝলেন তো গলা কাটলে দেয় দুধ মানে কি ?

সাবাশ জানিয়ে চলে আসি সেদিনকার মতো। আত্মমগ্ন মানুষটা অধিকার করে নেন আমার দিনযাপনের অনেকটাই।

তার পরে ঘটে সেই আশ্চর্য ঘটনা। সেদিন চুল কাটতে কাটতে রেণুপদ খুব গাঢ় দুঃখের স্বরে বললেন, 'আমার বয়েস মাত্র পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন কিন্তু চুল সব বশিষ্ঠ মুনির মতো শাদা। এর কারণ আমি অনেক ভেবে বার করে ফেলেছি। আমি আমার বাবার পঞ্চাশ বছর বয়সের সন্তান। তাই তাঁর যৌবনের আশীর্বাদ আমি পাই নি।'

পাশের সিটে ছেলে শশিপদ চুল ছাঁটছিল নীরবে। লজ্জায় মাথা নিচু করলো দেখলাম। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'দেখুন চুল-দাড়ি পাকার অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। জিন, ক্রোমোজোম, হরমোন, বংশধারা। তা ছাড়া স্রেফ পেট খারাপ থেকেও চুল পাকে অনেকের। আপনার ব্যাপারটা…'

: আমার ব্যাপারটা স্পষ্ট। জানেন, আমার তিন দাদার মধ্যে একজনেরও চুল আমার বয়সে পাকে নি। বাবার কারণেই আমার চুল পেকেছে নিশ্চিত। তাই আমি কি করেছি জানেন ? এই যে আমার ছেলে শশিপদকে দেখছেন, ও আমার পঁচিশ বছরের সন্তান। আমি ওকে কুড়ি বছরে বিয়ে দিয়েছি। ওর এখন চার বছরের এক খোকা আছে। দেখবেন ওদের দুজনেরই চুল পাকবে না।

ঘটনাটা ঘটলো ঠিক এর পিঠোপিঠি। আমি জানতাম না যে রেণুপদদের

বাস্তবাড়ি সেলুনেরই লাগোয়া। যাই হোক, রেণুপদ সবে তাঁর বক্তব্য সেরে স্বভাব-সুলভ মৃদু হাসিটি ঠোঁটে টেনেছেন এমন সময় তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ব্যাপার এই যে, সেলুনের স্বইং-ডোর ঠেলে ঝড়ের মতো ঢুকলো দুটো দামাল শিশু। একজন বছর চারেকের, আরেকজন পাঁচ। বছর পাঁচেকেরটি রেণুপদকে ঠেলা মেরে বললো, 'বাবা বাবা, মন্টু আমার চকলেট খেয়ে নিয়েছে শিগ্‌গির দশটা পয়সা দাও, নইলে ওকে ধরে পিটোব কিন্তু।' বছর চারেকেরটি আশ্রয় নিল শশিপদর কোলে। কাঁদতে কাঁদতে বললো আধো আধো স্বরে, 'না গো বাবা, আমি তকলেট নিই নি, শুধু শুধু মালবে কাকা।'

আমি হতভম্ব। রেণুপদ আর শশিপদর হাতের কাঁচি থেমে গেছে। বিরাট দুই বেলজিয়াম কাঁচের স্বচ্ছ দর্পণে ধরা থাকে এক অস্বস্তিকর দৃশ্যচিত্র। চিত্রার্পিত রেণুপদ, অসহায় লজ্জিত শশিপদ। আমার চোখে ফ্রিজ শটের মতো আটকে গেল রেণুপদ আর শশিপদর একই বয়সী দুই সন্তানের মুখ! সঙ্গে সঙ্গে ভাবলাম রেণুপদর এই কনিষ্ঠ সন্তানের কি অল্প বয়সেই চুল পেকে যাবে?

উত্তরটা জানা হয় নি। সেই যে এলাম মহিষাদল থেকে, তার পর থেকে আর যাওয়া হয় নি।

*　　　　*　　　　*　　　　*

এক প্রান্তে একটা পরিত্যক্ত ভিটেয় বাস করে এক অন্ধ মানুষ। তার পোশাকী নাম রহমত খাঁ। কিন্তু সবাই তাকে জানে পুষু এই ডাক-নামে। আশ্চর্য যে সারাদিন সে প্রায় ঘুমোয়। কেবল বেলা বারোটা আর রাত আটটায় লাঠি ঠুকে ঠুকে সে কতকগুলো নির্দিষ্ট বাড়ি যায়। তার থালা-বাটিতে ডাল তরকারি নিয়ে আবার ফেরে তার ডেরায়। কেন তাকে ঐ-সব লোক রোজ খেতে দেয়? এক বর্ষার রাতে পুষু হাউমাউ করে কাঁদে আর জানায় তার আত্মবিবরণ। এক-কালে নাকি ঘোড়ার গাড়ির কোঁচোয়ান ছিল পুষু। তখন এ শহরে রিকশা বা বাস কিছুই ছিল না। পুষু সেইকালে এ শহরের বাবুদের গাড়িতে করে নিয়ে কত জায়গায় ফুর্তি করাতো। সে ছিল মেয়েছেলেদের আড়কাঠি। বাগানবাড়ি কিংবা নানা নৈশ-নিকুঞ্জে কত কাণ্ড হয়েছে এক সময়। যে-সব বাবুদের নিয়ে যেত তাদের কারুর কারুর বাড়ি এখনও সে খেতে পায়। কিন্তু মাঝখান থেকে যৌন-রোগে পুষুর চোখদুটো গেছে। বর্ষার রাতে তার কান্নার সেইটাই ছিল বিষয়। 'আল্লা, এ কেমন তোমার বিচার। আমাকে হ্যালাখ্যাপা করে দিলে আর ঐ

লোকগুলো, ঐ···বাবু···বাবু এখন দিব্যি আছে। কেউ কমিশনার, কেউ চেয়ার-ম্যান, কেউ আবার নেতা। সব জানা আছে।'

এই পুষুর কাছ থেকেই জানা যায় যে শহরের প্রান্তে নদীর ধারে আগে ছিল পতিতালয়। শশী নামে এক স্থূলাঙ্গিনী মাসি ছিল সেই পতিতালয়ের কর্ত্রী। তার নাম থেকেই গলিটির নাম হয় মোটা শশীর গলি। এখনও শহরের পুরনো বাসিন্দারা এ গলির প্রসঙ্গে ইংরিজিতে বলেন 'ফ্যাট মুন লেন'। লোকে রহস্য ক'রে বলে, 'কোন্ গলি? যেখানে রাতে লোক বেড়ে যায়?'

সে গলির এখন আর মহিমা নেই। কিন্তু কোনোদিন যে সেখানে আমাকে যেতে হবে তাও ভাবি নি। যেতে হলো আমাদের বাড়ির ঝি-র সুবাদে। একদিন সে কাজ করতে এসে কেঁদে পড়লো, 'দাদাবাবু, আমার মেয়েকে জামাই আর নিচ্ছে না, আমার বাড়িতে থুয়ে দিয়ে গেছে। আপনাকে এর একটা বিহিত করতে হবে।'

অস্পষ্ট জানতাম তার জামাই বামাপদ এক কীর্তিমান যুবা। ত্রিশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনে তার বহু রেকর্ড আছে। হেন অকাজ নেই যা করে নি। সব-শেষ সে ঠেক করেছিল স্থানীয় সিনেমা হলের আশপাশে। জুয়াড়ি, মোদোমাতাল, পকেটমার, ছিনতাইবাজ, সাট্টার পেনসিলার, চুল্লুর চোরাচালানী এই সব রকম কাজেই সে ভালোরকম দক্ষ। শেষমেশ ধরেছিল সিনেমার ব্ল্যাকারের কাজ। ঝাড়-পিট হুজ্জতি করতো খাঁটি বচ্চন-স্টাইলে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সিনেমা হলের কর্তৃপক্ষ তাকে দিল অ্যানাউন্সারের চাকরি।

শুরু হলো বামাপদর নবজীবন। একটা সাইকেল রিকশায় মাইক বেঁধে সে 'অ্যালাউন্স' করতে লাগল সারা শহরে ঘুরে ঘুরে। তার ফাটা গলায় সে ক্ষণে ক্ষণে গর্জে উঠত মাইকে: 'এই যে আমি বৈশাখী হলের অ্যালাউন্সার বামাপদ অ্যালাউন্স করছি। আজ থেকে আসছে দুর্ধর্ষ ফাইটিং চিত্র···নাচে গানে ভরপুর। দারুণ সেক্স, দিলচপ্‌স্ হিরোইন। তিনটে মার্ডার···দুটো রেপ। আসুন আসুন।'

তার বাক্যজাল আর কল্পনাশক্তিতে সিনেমা হলের কর্তৃপক্ষ বিব্রত হলেন অচিরে। পাবলিকের কাছ থেকে অভিযোগ আসতে লাগলো। তখন বামাপদকে নিরুপায় হয়ে প্রোমোশন দেওয়া হলো 'আশার' পদে, যার কাজ হলো টর্চ দেখিয়ে অন্ধকারে দর্শকদের সিটে বসানো।

তার এই নতুন প্রোমোশনের খবরটাও একদা আমাদের ঝি সগর্বে জানিয়ে বলেছিল, 'বুঝলে বৌদি, জামাই আজকাল সিনেমা হলে আলো দেখায় গো।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে জামাই আমার টর্চ জ্বেলে লোককে সিটে বসায়। তার এখন খুব দায়িত্ব।’

অবশ্য বরাবরই খুব দায়িত্ব নেবার ঝুঁকি ও প্রবণতা ছিল বামাপদর। আমাদের ঝি-র মেয়ে বিন্দুকে সিঁদুর পরাবার আগে সে আরো আধ ডজন মেয়েকে দায়িত্ব নিয়ে সিঁদুর পরিয়েছে। তাদের কেউ ভেগেছে, কেউ হয়েছে হাপিস। বামাপদর সবশেষ ক্যাচ আমাদের বিন্দু। একদিন বুঝি একা একা ইভনিং শোয়ে গিয়েছিল বিন্দু। বামাপদ তাকে নিজস্ব প্রতিভায় কয়েক ঘণ্টায় পটিয়ে ফেললো। পরদিন নেমন্তন্ন করলো নতুন ছবি দেখতে। সেটা ছিল জয়া ভাদুড়ির ‘গুড্ডি’। টর্চের আলোয় জায়গায় বসিয়ে বামাপদ শুধু বিন্দুকে একখানা কানে কানে ডায়লগ দিয়েছিল। মজে গেল বিন্দু। আসলে মস্তানদের মধ্যে কী একটা চার্ম থাকে। তা ছাড়া বামাপদর অসংখ্য হিন্দি গান ঠোঁটস্থ, মুখে চোস্ত ফিল্মি বুলি। বখে-যাওয়া মেয়েদের সে স্বতোচ্ছল গুরু।



তার মুখের ভাষাও ছিল অদ্ভুত। আমাদের ঝি রাগের মাথায় অভিযোগ করেছিল যে, তার জামাই যে ভাষায় কথা বলে তা নাকি দুর্বোধ্য। ‘সে ভাষা সোহাগের না খিস্তির তা বোঝা যায় না বৌদি’। কী জানি কেমন সে ভাষা। অপরাধ জগতের ভাষা নিয়ে একটু আধটু পড়াশুনো ছিল তাই বামাপদর বিচিত্র

ভাষা জানবার একটা আগ্রহ স্বভাবত ছিল। কিন্তু সে আগ্রহ পূরণের কোনো স্বাভাবিক উপায় তো ছিল না। সে সুযোগ হঠাৎই জুটে গেল যখন বিন্দুর মা-র কাতর অনুনয় 'আপনাকে এর একটা বিহিত করতে হবে' আমাকে নাড়া দিল। কাজটা তো সোজা নয়। বামাপদর চরিত্র সংশোধন।

যাই হোক, হদিশ ক'রে আমাকে যেতে হলো মোটা শশীর গলি। সেই প্রথম আমাদের শহরের সব চেয়ে রহস্য-রোমাঞ্চ-ঘেরা অংশে আমার অনুপ্রবেশ। গা ছমছম করছিল। এখানে কত কীর্তি কত কেলেঙ্কারি ঘটেছে একদা। যেন এক ঐতিহাসিক দুর্গদর্শনের দুর্লভ সুযোগ এসেছে। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হলো যে আমি যত না দেখছি গলির অন্যান্য বাসিন্দারা তার চেয়ে অনেক বেশি দেখছে আমাকে। কী ব্যাপার ? এই ভদ্রলোক এখানে ? আমার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতেই একজন সসম্ভ্রমে সেই তীর্থকেন্দ্রে আমাকে হাজির করল। অর্থাৎ বামাপদর সর্বাধুনিক ডেরায়। ছোকরা আমাকে খানিকটা চিনতো জানতো। দেখেই বলল, 'আসুন আসুন প্রাজি, তসরিফ লাইয়ে। তো আপ কা মাফিক বড়িয়া আদমি এখানে। এ তো আপকো বহুতই মেহেরবানী। হাম নাহি জানে কদরদানী।'

এবারে বোধগম্য হলো খানিক বিন্দুর মার আক্ষেপ। বোঝা যায় না বামাপদর ভাষা, সোহাগের না খিস্তির। আসলে হিন্দি ছবির ককৃনি। বামাপদ বললো, 'তো আপ কিসকো মাংতা ? অওর কিসকে লিয়ে ?'

আমি সসংকোচে বললাম, 'বিন্দু'।

: ওহো, বিন্দু-কি-মামলা। কোওন বিন্দু ? যো মেরি গুড্‌ডি থি ? মেরি দিলকি গুড়িয়া ?

স্থানমাহাত্ম্যে আমারও মুখে মা বাগ্‌বাদিনী সময়োচিত ভাষা জুগিয়ে দিলেন। বললাম, 'ও সব দিল্লাগী ছাড়্। বিন্দুকে ওয়াপস্ ক'রে দিয়েছিস কেন ? ভেবেছিস্ তার মাথার ওপর কেউ নেই ? জানিস্ আমি তার নিজের মামার মতো ?'

বামা জিভ কেটে বলল, 'বেশক বেশক। আমি জানি আপনি তাকে কত পেয়ার করেন। কিন্তু সওয়াল এহি হ্যায় কি মেরি গুড্‌ডি আর সিধেসাধা লেড়কী না আছে। বহোৎ বুরা, বহোৎই গন্ধা।'

টি-ভি সিরিয়াল-দেখা আমি কিছু কম নই। ধন্যবাদ দূরদর্শনকে। তার দৌলতে ব'লে বসলাম, 'মতলব ?'

: মতলব ইয়েহি হ্যায় মামা কি বিন্দুর উপর আমার আর প্যার নেহি। তার ওপর আমার মহব্বৎ টুটে গেছে আহিস্তা আহিস্তা।

: কেন ? তার কসুর কি আছে ?

: তার ফিগারটা হালফিল দেখেছেন কি ? ছিল জয়া ভাদুড়ি এখন হো গিয়া টুনটুনকা মাফিক। আপশোস।

কোনো রকমে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললাম, 'সত্যি কথা চেপে যাচ্ছিস কেন ? আসল ব্যাপারটা কি ?'

: অস্‌লি বাত ধোঁকেবাজি।

: তার মানে ?

'ব্যাপার এহি মামা, বিন্দু' এই পর্যন্ত ব'লে বামাপদ আকাশে দু হাত ছুঁড়ে নাটুকে ভঙ্গিতে বললো, 'মেরি বিন্দু আমার জিগরি দোস্ত্ সুরজকা সাথ লটঘট কিয়া। উসকো মাফি নহি মিলেগা। ওয়াপস্ নেহি লুঙ্গা। ও ধোঁকেবাজ রেণ্ডি হায়।'

এবারে বিশদে জানা গেল বামা-র এক সাগরেদের কাছে মূল ঘটনা। গত দু মাস বিন্দু আর সূর্যকে নিয়ে বামা সন্দেহ রোগে ভুগছিলো। একদিন খবর এলো শহরপ্রান্তের আরেক সিনেমা হলে সূর্য আর বিন্দু ম্যাটিনী শো দেখছে। খবর পেয়েই ওস্তাদের মাথা গরম। ছুটলো সে। সেই হলের স্টাফদের সঙ্গে ওস্তাদের জান পহেচান ছিল। 'আর জানেন তো ওস্তাদের আমার বিল্লি চোখ। আর.সে হলো আঁধিয়ার মে টর্চ ফেল্‌নেওয়ালা। বিল্লি চোখে ঠিকই দেখলো।'

: কি দেখলো ?

: সে বহুৎ শরম কি বাত। দেখলো কি সুরজ আর বিন্দু দোনো মিল করকে সিনেমা হলে থিয়েটার করছে।

: তার মানে ?

: ওস্তাদের তখন বহোৎ রাগ উঠে গেছে। এ তো মজাক্ নেহি। পবিত্র সিনেমা হলে থিয়েটাব ? দাদা চিন্তা করুন, পর্দায় অমিতাভ্‌জী আর রাখীজী। কত ভারী কিৎনী বড়িয়া চিজ। তাঁর মধ্যে বেশরম কম্‌বক্‌ত্ লেড়কি জড়াজড়ি করছে ? ওস্তাদ হুংকার দিল : 'আবে ছোঃ'। ওস্তাদ বামাপদ এতক্ষণ ছিল না। বোধ হয় ঘরে ঢুকে একটু চুল্লু প্রসাদ নিয়ে এলো। তার চোখ লাল। সেই চোখ আবার উদাস।

আমি বললাম, 'বামাপদ, এর একটা মীমাংসা হয় না ?'

বামা খুব অবহেলাভরে তার শাগরেদকে বলল, 'পিপ্লু, তুই মামাকে সমঝে দে বিন্দু অওর সুরজকা সাথ হামারি আখেরি বুঝসুজ হো গিয়া।'

আমি বললাম, 'কি সেই মীমাংসা।'

পিপ্পু খুব বীরত্বের ভঙ্গিতে বলল, 'ফাইটিং ছবিতে শেঠি কি করে জানেন?'

: না তো।

: তবে শুনুন। শুনে লিন। পহেলে ওস্তাদ্ সেই ছুপা রুস্তমের জামার কলার ধ'রে বাইরে এনে ঢিসুম ঢিসুম অওর লাথি। উসকে বাদ আপনাদের ভোলেভালে সিধা সাধা বিন্দুকে বলল, 'আভি নিকালো রেণ্ডি।'

'ব্যস্' বামাপদ চোখ বুজে বলল, 'ওহি থি আখেরি ডায়ালগ।'

পরাজিত উকিলের মতো ব্রিফ গুছিয়ে চলে যাবার আগে আমি মূর্খের মতো বলে বসলাম, 'এখন তুমি কি করবে বামাপদ?'

বামা বললো, 'বহুৎ জব্বর খানাপিনা, চক্কর মক্কর গানা অউর দিল্‌পসন্দ্ হাসিনা। সমঝে?'

* * * *

শহর আর অশহরের সীমানা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ এ যেমন ধরা কঠিন তেমনই আজকাল কঠিন হয়ে পড়েছে গ্রাম-শহরের সীমারেখা টানা। অন্তত সেই সব গ্রাম, বিশেষ ক'রে যেগুলি হাইওয়ের ওপরে কিংবা দূর দূর জনপদকে সংযোগ করতে যেসব নতুন পাকা সড়ক গড়ে উঠেছে তার আশেপাশে। যেমন ধরা যাক যে-রাস্তা যাচ্ছে হলদিয়া সেই রাস্তার ধারে-কাছের গ্রামগুলো এখন আর তত গ্রাম নেই। এমনতর রাস্তায় বরাবর গাড়ি ক'রে যেতে যেতে নজর করলে দেখা যাবে রয়েছে গাড়ি সারাইয়ের কারখানা, ধাবা, পেট্রোল পাম্প আর আবাসিক হোটেল লজ। এ সব ব্যবসা, সংলগ্ন গ্রামবাসীদের উদ্যমেই গড়ে উঠছে। কেননা গ্রামে এখন উল্‌পো টাকা আছে, ঋণদান সংস্থা আছে, রাজনীতির হিস্যা আছে। পল্‌কা খানিকটা হুজুগও আছে। তাই লজের পাশে শিব বসিয়ে মন্দির গ'ড়ে নাম দেওয়া হয় 'লজেশ্বর'। বোঝা যায় গ্রাম এখন আর গ্রামবৃদ্ধদের পরামর্শে বা সদুপদেশে চলছে না, গ্রামের ভরকেন্দ্র এখন যুবকবৃন্দ। তারা অর্ধশিক্ষিত, উচ্চণ্ড, খরচে আর লোভী। হাইওয়ের আশেপাশে প্রতিদিন যত কেলেংকারি আর অসামাজিক কার্যকলাপ ঘটে তা খবরের কাগজে বেরোয় না।

মাঝে মাঝে মনে হয়, মফস্বল যেমন ক্রমেই হয়ে উঠছে কলকাতামুখী, তেমনই গ্রাম হয়ে উঠছে মফস্বলের মত। ম্যাটাডোরের চলাচলি আর অন্তর্দেশীয় দূরপাল্লার বাসের নেট-ওয়ার্ক দূরকে নিকট করছে দ্রুত। এখন এইরকম সব গ্রামে সকাল-সকাল খবরের কাগজ এসে যায়। তাছাড়া সম্বৎসর পাওয়া যাচ্ছে ইলিশ মাছ

আর আঙুর-আপেল। দক্ষিণবঙ্গ, ম্যাটাডোর সার্ভিসের কল্যাণে পাচ্ছে উত্তরবঙ্গের আনারস, উত্তরবঙ্গ পাচ্ছে গঙ্গাসাগরের তরমুজ। গ্রামের বাসস্টপে জমে উঠেছে ভি ডি. ও হল, রিকসাস্ট্যাণ্ড, ডাইং ক্লিনিং, ট্রাঞ্জিস্টারের দোকান।

এ ধরনের হঠাৎ-গ্রামের মানুষজন রাজনীতির তৃণমূল ঠিক নয়, বরং বলা যায় তৃণাগ্র। হাওয়ায় কখনও দোলে এদিকে কখনও ওদিকে। এই কংগ্রেস তো ঐ সি. পি. এম, কি অন্য দল। হালে উঠেছে বি. জে. পির হাওয়া। গ্রামে আছে ছোট মাপে পার্টি অফিস। সকাল-সন্ধে ক্যাডাররা মাদুর পেতে ব'সে খবরের কাগজ প'ড়ে যে যার বিরোধী দলের আদ্যশ্রাদ্ধ করে। বাসস্টপে উঁকিঝুঁকি দিলে প্রথমেই চোখে পড়বে জমির সার আর কীটনাশকের সাইনবোর্ড। বড় বড় গাছের গুঁড়িতে টিনের ওপর বিজ্ঞাপন দেখা যাবে কাছাকাছি স্টেশন থেকে দু মিনিট দূরের ঋতুবন্ধ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য নার্সিং হোমের খবর। যেখানে গোপনীয়তার 'গ্র্যান্টি' আছে। আরেক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যাবে অদূরের শহরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কে. জি. বিভাগে 'ভর্তি চলিতেছে'। 'সিঁদুর নিওনা মুছে', 'বউমা বাড়ি ফেরেনি' যাত্রার খবর অথবা 'মহাভারত অবলম্বনে সম্পূর্ণ রামায়ণ'। অবশ্যই একটি সেলুন আছে। বছর দশ পনেরো আগে এ ধরনের সেলুনের নাম ছিল 'সুচিত্রা সেলুন'। তারপরে লেখা থাকতো 'এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা হয়।' এখন এসব সেলুনের নাম পালটে গেছে। তবে সাইনবোর্ডে অপটুহাতে-আঁকা দুটি ব্যক্তির স্যুট-বুট-পরা সহাস্য ছবি যোগ হয়েছে। একটু খতিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে ছবি দুটির মুখের আদল বচ্চন আর মিঠুনের।

অনুপুঙ্খ বর্ণনা রেখে আমরা বরং এবারে ঢুকে যাই গ্রামের ভেতরে। আসলে দো-আঁশলা জায়গা, না-গ্রাম না-শহর। হিন্দু মুসলমান খৃস্টান পাশাপাশি বসবাস। কৃষ্ণনগর-করিমপুর দীর্ঘ সড়কের ধারে এই গ্রাম। গ্রামের পুবসীমান্তে বাংলাদেশ।

এই অসম্ভব গরীব গ্রামে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঝলমলে বিদেশী সিন্থেটিক নাইটি খুলে ততোধিক চোখ-ধাঁধাঁনো বিদেশী হাউসকোট পরে নেয় রুপো গোমেশ। পাশের গ্রামের মেয়ে। কিছুকাল আগেও যাকে আঞ্চলিক উচ্চারণে সকলে ডাকতো 'উপো', বছর আষ্টেক আগেও যে এখানকার স্কুলে এগারো ক্লাশে পড়তে আসতো, মাথায় ছিল গিজগিজে উকুন।

ভোরবেলা উঠেই রুপোর প্রথম কাজ হ'লো মুখখানা মেজে ঘষে একটা জলজলে সিঁদুর চিহ্ন আঁকা আর কপালে লাগানো একটা শিল্পার টিপ, কেননা

তার স্বামী থাকে দূর বিদেশে। রুপোর পায়ে বিদেশী স্লিপার, গায়ে উগ্র বিদেশী পারফিউম। তার বাড়ির পাপোষটা পর্যন্ত বিদেশী, বাথরুমে বিদেশী সাবান। আপাতত হাতে তার অবশ্য একটা এদেশী স্টিলের বাটি। তাতে রাতের ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে সে বারান্দার গ্রিল গেট খুলে প্রকাশ্যে আসে এবং হাঁকে 'আয় আয়, আঃ আঃ'। ছুটে আসে একটা দুটো লেজনাড়া খেঁকি, উড়ে আসে একঝাঁক কাক। তাদের চিৎকারে আর খেয়োখেয়িতে প্রতিবেশীরা বুঝতে পারে উঠলেন এবারে মহারাণী উপোবিবি। এটা তাদের ব্যঙ্গাত্মক বেদনার সৃষ্টি।

উপোর এই সাতসকালের দেখনদারিতে বিরক্ত হয় অনেকে, কেউ দেয় গলা খাঁকারি, কোন প্রতিবেশী বউ হয়তো কোলের বাচ্চাকে ঠোনা মেরে কাঁদায়। মধ্যবয়সিনীরা নিজেদের মনে গজরায় 'যতসব লোক দেখানি ঢং' কিংবা 'ঐ্যাও আরম্ভ হ'লো এবার উপোর ছেনালি'। তাতে অবশ্য রুপো গোমেশের কিছু এসে যায় না। কেননা তার রূপ না থাকলেও রূপিয়া আছে অঢেল।

কিন্তু আগে তা ছিল না। পাশের গ্রামে টিমথি বিশ্বাসের ছোটমেয়ে, সোনামণির বোন। মা মিলিয়ে নাম রেখেছিলো সোনারুপো। রুপো দাঁড়িয়েছিলো উপো, আর সোনাকে সবাই বলতো সুনা। সুনার ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে গেছে। নাম যার সোনা তার ভাগ্য অবশ্য গিল্‌টির পানা। মরা গরীবের ঘরে বিয়ে হয়েছে তার। কেননা তার বাবা টিমথির একটা মুদির দোকান কোনরকমে খুঁড়িয়ে চলে। রুপোর ভাগ্য কিন্তু প্ল্যাটিনামের মত। তাতে সে আবার একটু আল্‌গা চটকদার দেখনসই। এ গ্রামে পড়তে আসতো এগারো ক্লাশে, চোখে ধ'রে গেল নিরাপদ গোমেশের। সে ছিল বর্ডারের স্মাগলার, ডাকাবুকো আর জোগাড়ে। রুপোকে সে ফুসলে বিয়ে করে। তারপরে কি হয় সে কথা পরে।

আপাতত দেখা যাচ্ছে নিরাপদ থাকে বিদেশে। কিন্তু তার এলাকায় সে একখানা বেশ আধুনিক ডিজাইনের তিনঘরের বাড়ি বানিয়েছে। বাড়িটা এখনও শেষ হয়নি। বছরে একবার ক'রে এসে সে দু মাস ক'রে থাকে আর বেড়ে ওঠে তার বাড়ির গতর। চারপাশের খেটেখাওয়া মানুষের অনুন্নত ঘরবাড়ির পরিবেশে নিরাপদ-র এই বাড়ি যেন স্পর্ধায় ফোঁস ফোঁস করছে। প্রথমেই চোখে পড়ে এক মস্ত অ্যানটেনা। চাঁদনি রাতে যখন ওর রুপোলি রং আকাশের দিকে দাঁত মেলে থাকে আর গাঁক গাঁক করে টি ভি চালায় রুপো, তখন শ্রান্ত নিরাশ পাড়ার মানুষ আর তাদের বৌ-ঝিদের চোখ জলে যায় ঘৃণায় পরাজয়ে হীনমন্যতায়। কিন্তু তারা উল্টে রুপোর টি. ভি-টার মত গর্জাতে পারে না। তারা বড্ডই গরীব।

বরং সকাল থেকে তারা শোনে রুপোর হরেকরকম জানানদারি আর বড়-লোকী চালের দেমাক। যেমন পাঁচ বছরের পার্থকে সে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে, 'হ্যাঁরে পার্থ, আজকে সকালে লুচি খাবি,.না কিমার গরম গরম বড়া ভেজে দেব?' পার্থ তার পুত্র। তার কোন ডাক নাম নেই। সবসময়ের ঝি অ্যাঞ্জেলাকে রুপো ঝংকার দিয়ে শুধোয়, 'অঞ্জু, ষষ্ঠী দাদাবাবুকে ওভালটিন দিয়েছিস্?' ষষ্ঠী তার দূর সম্পর্কের দেবর।

রুপোর এমনতর দেমাকী ঘোষণা যেসব প্রতিবেশীদের শোনাতে তারা তখন গতর খাটার কাজে বেরোবার আগে কেউ অ্যালুমিনিয়ামের সানকিতে ওলা গুড় দিয়ে পান্তা খায়, কেউ খায় স্রেফ আটা গোলা, কারুর বড়জোর জোটে রুটি-চা। তাদের কেউ শ্রমিক, খেতমজুর, ভ্যান রিক্সাচালক, কেউ হকার, কেউ দোকান-কর্মচারী, কেউ স্রেফ ফেরেব্বাজ। রুপোর ঘোষণায় তাদের নুয়ে-পড়া মুখ কালো হয়ে যায়, খাদ্য মনে হয় তেতো, চোখদুটো ক্ষুব্ধ আক্রোশে জ্বলে। কিন্তু তবু তারা চুপ ক'রে থাকে। কেননা তাদের বেহিসেবী টাকা নেই উপোর মত। তাছাড়া ষষ্ঠী মস্তান আর তার দলবলকে সবাই ভয় করে। সবচেয়ে বড় কথা উপোর কাছে তারা বাঁধা কুকুর। বিপদে আপদে তাদের বউ-ঝিরা উপোর কাছেই হাত পাতে। উপোর একটা দয়া দেখানোর নেশা আছে।

ফিটফাট সেজেগুজে ষষ্ঠী এসে দাঁড়ায়, পেছন পেছন তার নেকড়ের মত অ্যালসেসিয়ান বিঙ্গো। ষষ্ঠীর নিখুঁৎ দাড়ি কামানো, আফটার-সেভ লোশনের রমণীহরণ গন্ধ চারপাশে, পরনে নিভাঁজ দামী বিদেশী টেরিলিন। রাজদূত গাড়ির চাবির রিং আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে সে বলে, 'গোটা পঞ্চাশ টাকা লাগবে'!

রুপো টাকা বার করতে করতে বলে, 'কাল যে দুশো টাকা দিলাম, কিছু ফেরেনি?'

: হিসেব চাইছো নাকি?

মুখ বিবর্ণ তবু রুপো বলে, 'চাইতে মানা নাকি?'

: শুধু তো খেতে পরতে দাও আর দু'দশ টাকা হাতখরচা। কিন্তু কত বড় দায়িত্ব বলো তো তোমাকে সামলানো? আমি না থাকলে এ বাড়ি ডাকাতে সাফ ক'রে দিতো আর তোমাকে ছিঁড়ে খেতো তা জানো?

: ইস্, অত যেন সস্তা। পুলিশ নেই? আইন নেই? আর কিছু না থাক আমার টাকার জোর তো আছে। পাড়ার লোক কি অমনি অমনি চুপ করে

থাকে? টাকা ছিটোতে হয় বুঝলে? আমাদের গাঁয়ে ছড়ায় কি বলে জানো? বলে 'দুনিয়াটা কার বশ? দুনিয়া টাকার বশ', বুঝলে?

'আমি টাকার বশ নই', ষষ্ঠী গম্ভীর গলায় বলে, 'চললাম। ফিরতে রাত হবে। কাল আমি নিরাপদ্দাকে চিঠি লিখে দেবো — এখানে আমার থাকা পোষাচ্ছে না'।

রুপো এগিয়ে এসে ষষ্ঠীর সার্টের পকেটে পঞ্চাশ নয়, একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তার হাত দুটো ধ'রে বলে, 'ইল্লি, যেতে দিচ্ছে কে? বাবু খুব রেগেছেন। এই শোনো, আমার দিব্যি, রাতে কিন্তু হাবজি-গাবজি ও সব গিলে এসো না'।

ফার্স্ট রাউণ্ড জিতে ষষ্ঠী শিস্ দিতে দিতে বেরিয়ে যায়। রাজদূত আর বিঙ্গো গর্জে ওঠে।

এই গ্রাম থেকে মধ্যপ্রাচ্য কতদূর? রুপো ভাবতে পারে না। মানুষটা কতদূরে পড়ে আছে। রুপোকে নিরাপদ বলেছে, 'এখানে যখন সকাল নটা, বুঝবা, তখন মধ্যপ্রাচ্যে শেষরাত'। তার মানে এখন মানুষটা ঘুমিয়ে কাদা। তবু স্বপ্ন দেখছে বোধহয়: বাড়িটা ছবির মত সাজিয়ে নিতে হবে। পার্থকে মানুষ করতে হবে। টাকা গুছিয়ে এনে দেশে ফিরে বিজনেস করবে। তাহলে এখন সে কি করে? এইখানে যত শংকা রুপোর। নিরাপদ তেমন স্পষ্ট বলে না। ষষ্ঠী জানে। বলে, নিরাপদ্দার খুব টাকার লোভ। কোন্‌দিন যে কোন্ ঝামেলায় ফাঁসবে কে জানে?

নিরাপদ ছিল ছোটমাপের স্মাগলার। আসলে এখন বড় মাপের স্মাগলার। তার মূল কেন্দ্র বোম্বাই আর শাখাপ্রশাখা মধ্যপ্রাচ্যে। পাশের শহরের একজন স্মাগলার নিরাপদকে ঐ লাইনে ফুসলেছে। বাকিটা রুপোর পয়।

অশহরে আর গ্রামে হঠাৎ-হঠাৎ হয়ে-ওঠা পয়মন্ত বড়লোকদের খবর তেমন-ভাবে কজন আর রাখেন? কিন্তু খেয়াল করলে যে কোন জনপদে দেখা যাবে এক একটা গজিয়ে ওঠা বিসদৃশ রকমের বড় বাড়ি। বেছে বেছে দুটো চারটে ছেলে-মেয়েদের পোষাকে একটা বাড়তি চোখধাঁধানো জেল্লা। অনুন্নত অঞ্চলে সিনেমা বা ভি. ডি. ও. হলে ঘাম আর দুর্গন্ধের মধ্যে সহসা নাকে লাগে দামি সুরভি। লোকে অস্ফুটে বলে, 'আরবের টাকার ব্যাপার সব'।

আমার এক ছাত্র এমন সব পরিবারের কথা আমায় বলেছিলো। আরবে থাকা এইসব মানুষ নাকি বছরে একবার বা দুবার বাড়ি আসে। সঙ্গে করে আনে বিদেশী জামা-কাপড়, সেণ্ট পাউডার ক্রিম সাবান আর লিপস্টিক। নিয়ে

আসে দামী চটি, সিন্থেটিক শাড়ি আর অন্তর্বাস। নিয়ে আসে টেপরেকর্ডার ক্যাসেট আর হরেক রকম গ্যাজেট।

আর নিয়েও যায় কিছু। সেটা ভারি মজার অথচ করুণ মানবিক। তারা নিয়ে যায় নাকি ক্যাসেটে ভ'রে বউয়ের সোহাগী কথাবার্তা, শীৎকার, দুজনের চুম্বনের শব্দ। নিয়ে যায় ছেলেমেয়ের আবৃত্তি আর হৈ হট্টগোল, সদ্যোজাত সন্তানের কান্না। নিয়ে যায় গেরস্থালির ঠুংঠাং আওয়াজ।

তলিয়ে ভাবলে মনে হবে এতো নিছক মজা নয়, এ যে দারুণ বেদনাবহ। অতি গরীব। হঠাৎ-পাওয়া টাকার সাশ্রয় আর সদ্ব্যবহার দুই-ই জানে না। নীতিবোধ প্রবল অথচ আকাঙ্ক্ষা আছে, আছে আসঙ্গলিপ্সা। ঐ বিলাসের দেশে অমর্যাদায় গ্লানিতে প্রতিদিন কাটিয়ে কত কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতে চায় তারা। ভাবতে অবাক লাগে, ক্যাসেটের ফিতেয় ভরা আছে বউয়ের শাব্দিক কামনার চিহ্ন, সন্তানের দেয়ালা? তাকি হয়? হ'তে পারে? অথচ হচ্ছেও তো। এই যেমন নিরাপদ নিয়ে গেছে রুপোর কান্না আর সোহাগের শব্দ, পার্থ-র আধো-আধো বোলের টুইংকল টুইংকল। পাঠিয়েও দিয়েছে নিরাপদ-র আশা আর স্বপ্নের সংলাপ, কামনার ইঙ্গিতে ভরা ফিতে। সঙ্গহীন গহীন রাতে রুপো সেগুলো বাজায় আর শরীরী আবেগে কাঁপে।

রুপোর পাড়ায় এখন রাত এগারোটা। পাড়ার খেটেখাওয়া মানুষগুলো ঘুমে বেহুঁস। শুধু অতল নৈঃশব্দ্য ফুঁড়ে কানে আসে রাতচরা পাখির ডাক। হাইওয়ে থেকে দূরাগত ট্রাকের আওয়াজও ক্রমে কমে আসে। একটুক্ষণ আগে দূরদর্শন তার সঙ্গ ত্যাগ করেছে। রুপো এখন নিপাট একা। না না ঠিক একা নয়। ঐ তো বিছানায় তার সন্তান। আরেকটা সন্তান সে চাইবে এবার। কতই বা বয়স তার। বাইশ চব্বিশ বড়জোর। রুপোর চোখে ঘুম কই?

এই সময় একেকদিন রুপো কাঁদে। সারাদিনের জানানদারি আর দাপটের সঙ্গে সেই কান্না মেলে না। এই কান্না বড় গোপন আর একান্ত। প্রতিবেশীরা শুনতে পায়না, কিন্তু পাশের ঘরে ষষ্ঠী প্রায়ই শুনতে পায়। তার ঘরে দেশলাইয়ের আওয়াজ ওঠে: ঠকাস্।

রুপো উঠে জল নিয়ে ঘাড়ে কপালে দেয়। গ্রিলে গাল চেপে নীরব অন্ধকারকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে। ঘরে এসে পার্থর চুলে বিলি কাটে খানিক। তারপরে স্টিল আলমারি খুলে ছোট্ট ওয়াকম্যান বার ক'রে কানে হেডফোন

লাগিয়ে ক্যাসেট চালায়। চরাচর শুনতে পায় না কিন্তু রুপোর শ্রবণ শোনে : 'কেমন আছো বউ? আমার উপো, আমার রূপমতী'...

থরথর ক'রে গা কাঁপে রুপোর। নিরাপদ-র ছবিখানা নাইট ল্যাম্পের নরম আলোয় কেমন যেন অস্বচ্ছ লাগে। একটা আমূল আসঙ্গ পিপাসা তাকে স্থবির ক'রে দেয়। কানে ওয়াকম্যান ততক্ষণে কত কি জপছে, মর্মে ঢুকছে কই? হঠাৎ সচকিত হ'লো রুপো : 'পার্থ কত বড় হ'লো বলো না গো। ইংরিজি ইস্কুলে যাচ্ছে তো? উপো, ছেলেটা আমার কথা শুধোয় তোমায়? তোমার মত দেখতে হয়েছে না আমার মত?'

একটু বিরতি। হঠাৎ : 'কতদিন তোরে দেখিনি উপো। কতদিন তোরে...' খুট ক'রে ওয়াকম্যান বন্ধ করে রুপো। শব্দহীন অসহ নিশীথিনী কান্না হয়ে গলে পড়ে রুপোর গালে। এমনসময় পাশের ঘরে কাশির শব্দ ওঠে খুক খুক। রুপো প্রাণপণে দেখতে চায় তার ঘুমন্ত সন্তানের নিষ্পাপ মুখ।

ঠুক ঠুক। খুব মৃদু। দুই ঘরের মাঝের দরজায়। উঃ কী ভীষণ। রুপো ভাবে।

ঘরের নীলাভ রাত-আলো নিভিয়ে দেয় রুপো। মাঝের দরজা খুব সতর্কতার সঙ্গে খুলে দুদণ্ড দাঁড়ায় ঝন্‌কাটে। অন্ধকার। খস্‌খস্ চটির শব্দ। যুবা শরীরের স্বেদ গন্ধ। এক মুহূর্তে দুটো বলিষ্ঠ হাত তাকে টেনে নেয়। একটু ভাবতেও সময় দেয় না।

কঠোর হাত নাইটির জিপ ফাসনারে পড়ে। সেটা খুলে দেয় যুবতীর কান্নার ঢল। আবারও আবারও পরাজয় মানে রুপো।

বাগানে ফলসন্ধানী বাদুড়ের পাখার ঝটপটানি শুনে বিঙ্গো গর্জে ওঠে।

*　　*　　*　　*

খুব কি গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে শহর-অশহরের নানা প্রসঙ্গ? তাহলে কমিক রিলিফ হিসেবে দুনীচাঁদবাবুর কথা আনতেই হয়। কিন্তু এখন আমাদের শহরে পথে-পথে-ঘোরা অর্ধোন্মাদ দুনীবাবুকে দেখলে অবশ্য কোন কমিক সেন্স জাগে না বরং কষ্টই হয় কেমন যেন, বিশেষত আমাদের, যারা আগের দুনীবাবুকে দেখেছি। এখনকার দুনীবাবু শহরের নানা পথে ত্রস্ত ভঙ্গীতে হাঁটেন আর মাঝে মাঝেই সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'হাওয়া ছাড়্'। কে যে তাঁর সামনের হাওয়া আটকে রেখেছে কে জানে?

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বাচ্চা ছেলেরা তাঁকে দেখলেই চেঁচিয়ে উঠে ফেউ লাগায়—'হাওয়া ছাড়্'। তিনিও বলেন, 'হাওয়া ছাড়্'।

কিন্তু এমন তো চিরকাল ছিলেন না মানুষটি। ফুনীচাঁদ বাবুর রসিকতা, তাঁর উক্তি, তাঁর তৈরি প্রবচনের বাক্য এ শহরকে জমিয়ে রাখতো সর্বদা। পথে ঘাটে ছিল তাঁর অবারিত ঠেক। সবাই ডাকতো 'ফুনীবাবু আসুন, বসুন। ফুটো একটা স্যাম্পল ছাড়ুন।' তাঁর মূল ঠেক ছিল অবশ্য শহরের পৌরসভার একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে। সেটা ছিল স্টোর রুম আর ফুনী ছিলেন স্টোর ক্লার্ক। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ঐ প্রায়ান্ধকার ঘরে। তাঁর পুরো নাম যে ফুনীচাঁদ পাল সে কথাও সেদিন প্রথম জানতে পারি।

রসিক মানুষটির সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিলাম, আজ সত্যি বলছি, চুটকি গল্পের লোভে। পরে ক্রমে ক্রমে গড়ে ওঠে দুজনের এক অসামান্য কিন্তু অসম সখ্য। অসম, কেননা আলাপের সময় তাঁর বয়স ছিল ষাটের কাছাকাছি, আর আমি বছর পঁচিশেকের ছোকরা। প্রথম দিনই সেকথা খেয়াল রেখে আমি প্রস্তাব দিই, 'আমাকে আর আপনি-আজ্ঞে করছেন কেন? স্বচ্ছন্দে তুমি বলুন।' কথাটা শুনেই বললেন, 'তাতে প্রণয় কিছু বাড়বে না।'

এবারে বললেন, 'প্রথম আলাপ হলো। একটু মিষ্টিমুখ করাই দাঁড়ান।' স্টোর রুমের এক কাঠের আলমারি খুলে বার করলেন মস্ত বোতল। তার থেকে একমুঠো হোমিওপ্যাথিক সুগার অফ মিল্ক বা গ্লোবিউল আমাকে দিলেন। মিষ্টি-মুখ বটে। বললেন, 'এবারে আমাকে ভাল ক'রে অবলোকন করুন।'

দেখলাম প্রায়ান্ধকার ঘরে এক নিকষ কালো মানুষ। কদমছাঁট চুল শাদা, দুদিনের না-কামানো দাড়ি, সেও গুঁড়ো গুঁড়ো শাদা। ঝ্যাঁটা গোঁফ শাদা। এ সবের সঙ্গে মিল রেখেই যেন শাদা আদ্দির হাফশার্ট আর মালকোঁচা-মারা ধুতি। ঘোর কালো মানুষের এমন শ্বেতশুভ্র কনট্রাস্ট লক্ষ করেছি কি না করেছি, তিনি আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ ক'রে বললেন, 'যা দেখছেন তা আসলে ফটোর নেগেটিভ। খোলতাই চেহারা। তবে আসল প্রিন্ট ক্রমে ক্রমে দেখতে পাবেন।'

আমার বিস্মিত হাসি থামিয়ে এরপরে বললেন, 'অধীনের নাম ফুনীচাঁদ পাল। পিতা নরকস্থ ৺ফণিচাঁদ পাল…'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলি, 'নরকস্থ কেন?'

: দুটি কারণে। প্রথমত, এমন অপদার্থ সন্তান যার তার কপালে অক্ষয় নরক। দ্বিতীয়ত, শুনেছি স্বর্গে গরীবদের স্থান নেই। পিতা ছিলেন মরা গরীব, নরকে গিয়ে বেঁচেছেন। কিন্তু আমার পরিচয়দান-পর্ব এখনও মেটেনি। আমার বর্তমান

বয়স আটান্ন বছর দুইশত একত্রিশ দিন। পেশা : পৌরসভার স্টোর ক্লার্ক, আগে ছিলাম স্টোর ক্লার্কের বেয়ারা। বিদ্যা : এম. এ. বি. এফ. ব্র্যাকেটে সি. আর।

: তার মানে ?

: এম. এ. বি. এফ. মানে ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ারড বাট ফেল্ড্। সি. আর মানে কুম্ভ রিটার্নড্।

: সেটা কি ?

: হজে গেলে হয় হাজি। আমি কুম্ভমেলা দেখে এসেছি হরিদ্বারে তাই কুম্ভ-রিটার্নড্। এখন উচ্চতর খেতাবের চেষ্টায় আছি, যার নাম কে. বি. আর। অর্থাৎ কেদার বদরী রিটার্নড। কেদার তো হরিদ্বারের চেয়ে উচ্চতর, নাকি ?

'কিন্তু মহাশয়ের নিবাস ?' আমি এবারে রসিকতায় উজিয়ে উঠি।

: নিবাস, পৌরসভার অন্তর্গত সতেরো নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত এগারো নং হোল্ডিং। রাস্তার নাম ট্যামারিন টেগোর লেন।

: ট্যামারিন টেগোর কে ?

: আজ্ঞে, আমাদের গলিতে একদা এক মহা পরাক্রমশালী সান্ধ্যস্মরণীয় বার-বণিতাদের দালাল থাকিতেন। তাঁহার নাম মহামান্য তেঁতুল ঠাকুর। তাঁহারই পুণ্য নামের স্মরণে পৌরসভাভুক্ত সকলে এই গলিকে তেঁতুল ঠাকুরের গলি কহে।

: চমৎকার। ঈদৃশ কাহিনী শ্রবণে কৃতকৃতার্থ হইলাম। এখন বলুন, হে মহাভাগ, আপনি কি বিবাহিত ?

: প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহিত নই। তবে কেন নই সে বিষয়ে একটি কিস্যা আছে। যৌবনের শুরু থেকে শৈশবে মাতৃহীন আমার জন্যে পাত্রী দেখতেন আমার পিতা-ঠাকুর। মাঝে মাঝে আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। কিন্তু তাঁর ছিল বেজায় নাক উঁচু। মাঝে দুয়েকটি পাত্রী আমার চোখে ধরেছিলো কিন্তু পিতার চোখে তারা অচল। আসলে ব্যাপার কি জানেন, বিয়েটা তো দুনীচাঁদের নয়, ফণিচাঁদের পুত্রের। ক্রমে বাবা দেহ রাখলেন। আমার আর বিয়ে করবার চাড় রইলো না। তারপরে বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স হ'লে বন্ধুদের উস্কানিতে আবার বিয়ের চাগাড় দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে খেল খতম।

: কেন ? কেন ?

: সেবার এক বন্ধুর সঙ্গে সেজেগুজে চুলে কলপ দিয়ে ভব্যিযুক্ত হয়ে মেয়ে দেখতে গেছি। মেয়ের মা মেয়েকে এনে সামনে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাত্র কে ?' যেই বললাম 'আমি' সঙ্গে সঙ্গে মহিলা তাঁর মেয়েকে হাত ধ'রে টেনে

বললেন, 'ওরে পালিয়ে আয়, এই অলপ্পেয়ে বুড়োটা একবার আমাকেও পছন্দ করতে এসেছিল ওর বাপের সঙ্গে'।

একগাল হেসে ঢুনীচাঁদ বললেন, 'সেই অপমানে আর বিয়ে করলাম না, বুঝেছেন?'

বললাম, 'বুঝেছি আপনি সাংঘাতিক গুল্পবাজ।'

অভিমানী কণ্ঠে ঢুনীবাবু বললেন, 'এটা গুল্প? বেশ, তাহলে সত্যি ঘটনা শুনুন। আমাদের সাবেক বাড়ির পাশে থাকেন গণেশবাবু। ছাপোষা লোক সেবার তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়েতে পাড়ায় সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন কেবল আমাকে বাদ। পরদিন সকালে আমাদের বহুকালের ঠিকে-ঝি পদ্মর মা কাজে এসে বলে 'হ্যাঁ গো দাদাবাবু, তোমাকে নেমন্তন্ন করেনি কেন গো? এর একটা বিহিত করতে হবে' ব'লে সে গাছকোমর বেঁধে গণেশবাবুর বাড়ি ছুটলো। তাকে থামাতে আমিও ছুটলাম। গিয়ে দেখি কি গণেশবাবু তাঁর নতুন বেয়াইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। আমার ঝি সেখানে গিয়ে বললে, 'হ্যাঁগা ভালমানুষের ছেলে, বলি তোমার আক্কেলখানা কেমনধারা?' গণেশবাবু কুটুমের সামনে লজ্জায় প'ড়ে বললেন, 'কেন? কি হয়েছে?' ঝি আমাকে দেখিয়ে বলে, 'কি হয়েছে বোঝোনি? এই যে আমার দাদাবাবু, শিবের মত মানুষ, মেয়ের বে' দিলে, তাকে নেমন্তন্নই করলে না? জানো, আমার দাদাবাবু যদি তেমন উজ্জুগী পুরুষ হ'তো তবে কি আর এমন হ'তো? দেখতে সে আজ নিজেই তোমার জামাই হয়ে এসে বস্‌তো। হ্যাঁ' ব'লে ঝি আমাকে হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এলো। এরও পরে, আপনিই বলুন, আর কেউ ছাঁদনাতলায় যায়?'

ঢুনীচাঁদের সঙ্গে এই হ'লো আমার আলাপের প্রথম পর্ব।

আলাপের পরের পর্ব ক্রমে জমে উঠলো কখনও শহরের ফুটবল মাঠে বাদাম চিবোতে চিবোতে, কখনও ঋষি-সাণ্ডেলের চায়ের দোকানের টেবিলে। ততদিনে তিনি আমাকে তুমি বলতে শুরু করে দিয়েছেন। সত্য মিথ্যা নানা গল্পের তিনি জোগানদার, টিপ্পনী কাটতে ওস্তাদ। ১৯৬৭ সালে যেবার পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস হারলো যুক্তফ্রণ্টের কাছে সেবার চায়ের দোকানে এক ছোকরা বললো, 'এ কেমন ব্যাপার হ'লো ঢুনীবাবু?'

ঢুনী বললেন, 'হুঁ হুঁ বাবা, এতো হবেই। এযে ক-য়ের সঙ্গে ক-য়ের লড়াই।'

'তার মানে?' কৌতূহলটা সমবেত।

: মানে খুব সরল। বহুকাল আগে, সেই দ্বাপরে হয়েছিল ক-য়ে ক-য়ে লড়াই, অর্থাৎ কৃষ্ণ আর কংস। সেবারে হয়েছিল যাকে বলে কংস ধ্বংস। তারপরে ত্রেতাযুগে র-য়ে র-য়ে অর্থাৎ রাম-রাবণে লড়াই। ব্যাস্ রাবণ ফৌৎ। কলিযুগে ইংরেজ আমলে আবার লড়াই বাধলো বুঝলে?

: সেবারে কিসে আর কিসে?

: আরে তাও জানো না? সেবারের লড়াই গ-য়ে গ-য়ে, মানে গান্ধী আর গবরমেণ্টে। ব্যাস্। ইংরেজ গবরমেণ্ট এদেশ থেকেই চম্পট। তো এবারকার ক-য়ে ক-য়েটা বুঝলে?

: হ্যাঁ, কম্যুনিস্ট আর কংগ্রেস।

'রাইট।' দুনী সাবাস দিলেন। 'তবে কি জানো, এখনও অনেক লড়াই হবে। আমরা হলাম বৃটিশ আমলের লোক তো! অনেক দেখেছি।'

এখানে ব'লে নেওয়া ভাল যে দুনীচাঁদ ফোকলা মানুষ। আবার ঠিক ফোকলা বলা যাবে না, কারণ দুটো দাঁত এখনো আছে। একদিন বললাম, 'দাঁতগুলো বাঁধিয়ে নিলেই তো পারেন।'

জিভ কেটে বললেন, 'ছি ছি, আমরা হলাম বৃটিশ আমলের লোক। সেই বৃটিশ আমলের এই দুটো দুর্লভ পিস আর আছে, থাক। এর সঙ্গে স্বাধীন ভারতের দুনম্বরী দাঁত খাপ খাবে না।'

যুক্তি অনবদ্য এবং মানুষটি ঝকঝকে। উপস্থিত বুদ্ধিতে শানিত, রসিকতায় উজ্জ্বল। মনে পড়ে দুনীচাঁদের চমৎকার সব জবাবদারি। যেমন একবার তাঁর সঙ্গে পৌরসভায় ঢুকছি। কে বুঝি খবর এনেছে সেদিন চেয়ারম্যান আসবেন না। ফলে অফিস ঢিলেঢালা। সবাই হাত পা ছড়িয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, চলছে টেবিলে টেবিলে খোস গপ্পো। কারা বুঝি কি নিয়ে তর্ক করছিলো। দুনীবাবুকে দেখে সাক্ষী মানলো, 'দুনীদা আপনি সাপের পাঁচ পা দেখেছেন?'

: হ্যাঁ। এই তো সামনেই দেখছি ব্রাদার।

: কি রকম?

: এই যে আজ চেয়ারম্যান আসেননি আর তোমরা সব সাপের পাঁচ পা দেখছো। তাই না?

শোনা যায় খোদ চেয়ারম্যানের সঙ্গেও তাঁর রসিকতার সম্পর্ক ছিল। অবশ্য চেয়ারম্যান বঙ্কিম দত্ত ছিলেন তাঁর বাল্যবন্ধু। তবে অফিসে ডেকোরাম মেনে

দুনীচাঁদ তাঁকে চেয়ারম্যানই বলতেন। কিন্তু বঙ্কিম দত্ত-র বাড়ি গেলে বলতেন 'ফ্রেণ্ড'।

একবার খবর পেলেন ফ্রেণ্ডের জ্বর হয়েছে। তাই গেলেন দেখতে। বঙ্কিম দত্ত বললেন, 'দুনী, শুয়ে সুখ পাচ্ছিনা। পাশ বালিশ দুখানা কেমন যেন নেতিয়ে গেছে, বড্ড যেন সরু।'

দুনী গম্ভীরভাবে চিন্তিত মুখে বললেন. 'তাইতো ফ্রেণ্ড, বুড়ো বয়সে পাশ-বালিশই একমাত্র ভরসা, সেটা তো মনোমত না হ'লে চলবে না। এই সুযোগে বরং দুখানা জাবদা পাশ বালিশ বানিয়ে নাও।'

: আরে তা কি আর ভাবিনি। লোক ডেকেছিলাম। তারা কত চাইলো ভাবতে পারো? নব্বুই টাকা।

: কি বললে? নব্বুই টাকায় দুটো পাশ বালিশ? এখন আমি একটা কথা বোলবো?

: বলো।

: ঐ নব্বুই টাকার ওপর আর দশটাকা যোগ ক'রে আমাকে দেবে?

: তাতে কি হবে?

: নব্বুই আর দশে একশো টাকা খরচ করলে, বুঝলে ফ্রেণ্ড, তোমার দুপাশে দুটো মেয়েমানুষ এনে দিতে পারি।

অট্টহাসিতে.চেয়ারম্যানের বোধ হয় জ্বর ছেড়ে গেল।

কিংবা ধরা যাক বঙ্কিম দত্তের আগের চেয়ারম্যান শক্তিনাথ মুখুজ্যের সঙ্গে দুনীচাঁদের সংলাপ: অতিবৃদ্ধ শক্তিনাথ তখন পঁচাশি। হঠাৎ তাঁর আশি বছরের স্ত্রী মারা গেলেন। খবর পেয়ে সবাই গেলেন সেই বিমূঢ় বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে। তিনি তখন শূন্য দৃষ্টিতে ব'সে আছেন। দুনীচাঁদ গিয়ে বসলেন তাঁর কাছ ঘেঁসে। বললেন গম্ভীরভাবে, 'আপনার নাকি স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে? খবর শুনে ছুটে এলাম। ভারী অসহায় অবস্থা, আহা।' তারপরে সমাগত সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'আহা, এইবয়সে স্ত্রীবিয়োগ? ইস্, এ যে আরেকবার মাতৃবিয়োগ।'

এসব গল্প আর ঘটনার সারাৎসার থেকে বোঝা যাবে ছোট শহরের নিজস্ব বাতাবরণে স্বতই গড়ে ওঠে নানা বিচিত্র সমন্বয়। ব্যক্তি সমাজ আর বিশেষ শাহরিক সমাবেশ গড়ে তোলে কতই রস রসিকতা। দুনীবাবুর মত মানুষ কেবল যে নিজে নানান গল্পের উৎস তাই নয়, তাঁর স্মৃতিতেও ধরা থাকে কত স্থানীয়

'গল্পকথা। তার কিছু শ্লীল কিছু অশ্লীল। শ্লীল পর্যায়ে এখানে মনে আসে দুটো উপাখ্যান যা দুনীবাবুর বলা।

যেমন এই শহরের রিটায়ার্ড সিভিল সার্জন নলিনী সান্যালের বাতিকের ঘটনা। সে ভদ্রলোকের সবই ছিল ভালো, কেবল স্নান করতেন না। উপরোধে অনুরোধে যদি বা করতেন সে ন'মাসে ছ'মাসে একবার। তাঁকে তাই দুনীবাবু একবার জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনি ডাক্তারমানুষ, স্বাস্থ্য সম্পর্কে সবাইকে উপদেশ দেন অথচ নিজে চান করেন না, এটা কেমন?'

রাশভারী নলিনীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'হুম, ইঁদারা দেখেছো?'

: হ্যাঁ।

: ইঁদারার দড়া দেখেছো?

: হ্যাঁ।

: ইঁদারার দড়া জল লেগে লেগে কি হয়? পচে যায় তো? তাহলেই বলো এমন চমৎকার শরীরটা চান ক'রে ক'রে জল লাগিয়ে লাগিয়ে পচিয়ে লাভ কি?

এরই পিঠোপিঠি গল্প স্থানীয় কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক রসরাজ বিশ্বাসের, তিনি আবার সম্বৎসর দাঁতই মাজতেন না। মানুষটি ছিলেন বাতিকগ্রস্ত। সিঙি মাগুর মাছ কিনে এনে পুকুরে ছেড়ে দিতেন। একটা এঁড়ে গরু ছিল তাঁর প্রাণপ্রিয়। সেটার দড়ি ধ'রে কলেজে আসতেন। কলেজের ধারের মাঠে একটা খোঁটায় এঁড়েটাকে বেঁধে রেখে কলেজে ঢুকতেন। আবার ছুটি হ'লে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু কথা হচ্ছিলো তাঁর দাঁত-মাজা নিয়ে।

দুনীবাবু বললেন, 'রসরাজবাবু ছিলেন মহাপণ্ডিত অথচ দাঁত মাজতেন না। তাঁকে সহকর্মীরা বোঝালেন, আপনি পণ্ডিত মানুষ, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। আপনাকে কিছু বোঝানো কি আমাদের সাজে? কিন্তু এটা তো বোঝেন যে দাঁত খারাপ হ'লে স্বাস্থ্য নষ্ট। কেন আপনি দাঁত মাজবেন না আমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝান।'

শুনে সারাদিন রসরাজ গুম মেরে থাকলেন। তারপরে ছুটির সময় বাড়ি যাবার আগে স্টাফরুমে ঢুকে জলদ স্বরে বললেন, 'বাঘের দাঁত কে মেজে দেয় শুনি?'

দুনীচাঁদের একটা আলাদা জগৎ, একটা রস রসিকতায় উজ্জ্বল জীবন ছিল এটা বোঝাতেই যে আমার গল্পকথার অবতারণা তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে পাঁচমিনিট কথা বললেই বোঝা যেতো একটা আলাদা বেঁচে-থাকার মজা। যেই বললাম, 'চলুন একদিন নবদ্বীপে বেড়িয়ে আসি'। সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'নবদ্বীপে?

তার মানে তো গঙ্গা পেরোতে হবে। না বাবা, দরকার নেই, জলে আমি একে-বারে পাথরবাটি।' একবার জিগ্যেস করলাম, 'দার্জিলিং গেছেন কখনও?' বললেন, 'যাইনি আবার। কী জায়গা, হাঁটলে হাঁপানি থামলে কাঁপুনি।'

তাঁকে কি বাচক বলা যাবে? অমন নিমেষে কথার যোগান দেওয়া কখনও শুনিনি। পৌরসভার যুবকরা কর্মচারী ইউনিয়ন ক'রে যখন দুনীকে ধরলো তাদের সদস্য হবার জন্যে, তিনি খুব বিনয় করে বললেন, 'আমাকে ছেড়ে দে, তোরা সব বড় বড় নয়া দশ পয়সা, তার পাশে আমাকে সেই সাবেক সিকি হয়ে থাকতে দে দিকি।'

এ গল্প শুনে আমি জিগ্যেস করলাম দুনীবাবুকে, 'আচ্ছা সত্যিই আপনি ইউনিয়নের মেম্বার হলেন না কেন?'

দুনী বললেন, 'ও সব ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন সমিতি-টমিতিতে আমার ভরসা নেই। ও সব কেমন জানো? সবসময় কেবল খ্যাঁক খ্যাঁক, চেহারাও সব তেমনই। আমাদের অফিসে এখন গেলে দেখবে সবসময় ছোঁড়াগুলো খ্যাঁক খ্যাঁক করছে—দিতে হবে, করতে হবে, মানছি না, মানবো না। ছ্যা ছ্যা। আসলে কি জানো ভায়া? আমি হলাম গিয়ে ক্যাপস্টান সিগারেট।

: সে আবার কি?

: কেন বিজ্ঞাপনে দ্যাখোনি? 'কত সিগারেট এলো, কত সিগারেট গেল, কিন্তু ক্যাপস্টান রইলো চিরকাল'। তেমনই কত চেয়ারম্যান গেল, কত চেয়ারম্যান এলো, কিন্তু দুনী পাল রইলো চিরকাল। তবে হ্যাঁ, আর নয়। সামনের বছর রিটায়ার। আসলে সিকি আধুলিও রিটায়ার করেছে তো! এখন হ'লো পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সার জমানা। দেখতে ভালো, গুণতেও অনেক, কিন্তু একতাড়া বিড়িও মিলবে না।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'এমন চমৎকার কথা বলেন কি ক'রে? তা আবার মুহূর্তের মধ্যে? অবসর সময়ে ভেবে রাখেন নাকি?'

দুনী বললেন, 'ব্যাচিলার তো, ভাবনার সময় অনেক।'

: কিন্তু ভাবনার এমন মৌলিকতা?

: সেতো হবেই। বিয়ে করিনি যে!

: সে কি? বিয়ে করলে কি মৌলিকতা চলে যায়?

'আলবৎ' উরুতে চাপড় মেরে দুনীচাঁদ বললেন, 'বিয়ে জিনিসটা কি ভেবে

দেখেছ ? একটা ফরেন এলিমেণ্টের সঙ্গে ওঠা বসা, খাওয়া দাওয়া, থাকা আর সবচেয়ে বড় কথা শোয়া। এই যে শোয়া এটাই ডেঞ্জারাস। কেন জানো ? উরে-ব্বাস, মেয়েমানুষ সাংঘাতিক প্রাণী। তারা পাশে শোয় আর কানে বলে। ভেবে দেখেছো, পৃথিবীর যত বিপর্যয় সব ঐ মেয়েমানুষের কানে মন্ত্রদান থেকে ? মেয়েরা যা কিছু বলার সে ঐ পুরুষের পাশে শুয়ে কানে কানে বলে। সত্যি ক'রে বলো, কোন্ পুরুষমানুষের সাধ্য যে পাশে-শোয়া বউয়ের কথা অগ্রাহ্যি করে ?'

হো হো হেসে উঠলাম। তারপরে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনি সর্বদাই এত যে ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন, সেকি অফিসেও ?'

দুনী বলেন, 'তা যদি বলো তবে আপিসে আমার প্রথম ঠাট্টা এই হাতল ছাড়া বসবার চেয়ারটা নিয়ে। ধরো বঙ্গেন্দু চাটুজ্যে যখন চেয়ারম্যান আমি তখন এখানে ঢুকি। তখন আমি ছিলাম স্টোর-ক্লার্কের বেয়ারা। ঘরের বাইরের একটা টুলে ব'সে থাকতে হ'তো। তারপরে যখন পদোন্নতি হয়ে পনেরো বছর পরে ঘরের মধ্যে হাতল দেওয়া চেয়ার জুটলো আমি তা নিলাম না।

: কেন ?

: অব্যেস খারাপ হয়ে যাবে না ?

: তখন কি করলেন ?

: জোগাড় করলাম একটা হাতলছাড়া চেয়ার। এই যে দেখছো, এইটে। তুমি ভাবছো ঠাট্টাটা কি রকম হ'লো তাই না ? তাহলে আমি উঠে দাঁড়াই, এবারে দ্যাখো। দেখলে ? কি দেখলে ?

: বসবার জায়গায় বেতের ছাউনি ছেঁড়া। মাঝখানটা বেবাক ফুটো।

: একেই বলে কমোডিয়াস চেয়ার। বুঝলে ভাই, 'কমোডিয়াস' শব্দটা আমাদের এক সাবেককালের ইংরিজি-জানা চেয়ারম্যান শিখিয়েছিলেন। বঙ্কিম দত্ত। আমার ফ্রেণ্ড।

আমি হেসে বললাম, 'বঙ্কিম দত্ত-র আগের চেয়ারম্যান সুধাবিন্দু সেনকে নাকি আপনি খুব ঘোল খাইয়েছিলেন শোনা যায়। ঘটনাটা কি ?'

: ঘটনাটার শুরু এমনি খুব নিরীহভাবে। তখন সবে সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয়েছে। মাগ্‌গি গণ্ডার বাজার। মাইনে পাই সাকুল্যে সাঁইত্রিশ টাকা বারো আনা। তাই সে বছরে মিউনিসিপ্যালিটির বাজেটের আগে আমরা কর্মচারীরা আলাদা আলাদা আবেদন করলাম বেতন বৃদ্ধির। কমিশনারদের নিয়ে বোর্ড মিটিং ক'রে চেয়ারম্যান সুধাবিন্দু সেন বললেন, 'দুঃখিত। পারলাম না।

এবারে বড় টানাটানি।' তখন আমি সব কর্মচারীদের সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'ভাইসব'—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'ভাইসব আবার কি সম্বোধন?'

: তখন তো সেটাই রেওয়াজ ছিল। তখন বেশিরেডদের আমল, কমরেডদের নয়। তাই বন্ধুগণ বলার রেওয়াজ হয়নি।

: বেশিরেডটা কি?

: কেন ইংরেজ? তারা গেল আর কমরেডরা এলো। তো যা বলছিলাম—সহকর্মীদের সব বললাম, 'ভাইসব, আমাদের পৌরসভার বোর্ড বলছেন দুঃখিত, কিছু করবার নেই। এ আর নতুন কথা কি। সভা কাকে বলে জানেন কি আপনারা? সভার সংজ্ঞা? সংজ্ঞা হলো—যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমবেত হয়ে ব'সে বহুক্ষণ আলোচনা ক'রে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেন কিছু করণীয় নেই। ওঁরাও সেই সিদ্ধান্তে এসেছেন।'

: খবর পেয়ে চেয়ারম্যান সেন খুব চটে গেলেন?

: সে আর কি এমন চটা, চটলেন তার পরের বছর, আমার অন্য প্যাঁচে। সেটা হ'লো অ্যালকালির ঘটনা।

: অ্যালকালি আবার কি?

: ও মূলেই তো তোমাকে বলা হয়নি। আমাদের আপিসে অনেকগুলো কালী। যথা কালী ভশ্চাজ হলো পুরুত কালী, কালী দত্ত তবলা বাজাতো তাই তবলা কালী, কালী বিশ্বাসের ছিল গা-ভর্তি লোম তাই চুল কালী, কালী গড়াইয়ের বাপ আগে তেল বেচতো তাই তেল কালী। আর আমাদের স্টোর সেকশনের কালী গুপ্ত ছিল পাঁড় মাতাল, তাকে সবাই বলতো অ্যালকালি। এই অ্যালকালিকে দিয়ে আমরা নানারকম কুকর্ম করাতাম। হাজার হলেও মাতালের সাতখুন মাপ।

: পরের বার কি কুকর্ম করালেন?

: করলাম কি জানো? পরের বারের বাজেট মিটিঙের আগে অ্যালকালিকে দিয়ে দুষ্টুমি ক'রে এক দরখাস্ত লেখালাম 'চেয়ারম্যান বরাবরেষু'। আমার ডিকটেশনে অ্যালকালি লিখলে,

হুজুর মা বাপ,

সম্বৎসর পৌরসভার হাল বড়ই শোচনীয় দেখিতে পাই। এবারে আবার ঘোরতর দুর্বৎসর। তাই অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, এ বৎসর

আমার বেতন দুই টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক। ঐ টাকা পৌরবোর্ডের চা-পানের খরচে ব্যয় হউক। ইতি

আপনাদের সামান্য সেবক

কালীশঙ্কর গুপ্ত

: তারপর কি কাণ্ড হ'লো ?

: যাকে বলে হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। বোর্ডের মেম্বাররা রেগে কাঁই। এত বড় সাহস আর আস্পর্দা কালী গুপ্তর ? জল্‌দি বোলাও। আমি অ্যালকালিকে টিয়া পাখির মত সব শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলাম বোর্ডে গিয়ে কি বলতে হবে। টেনশ্যনে সে এক পাত্তর চড়িয়েও রেখেছিলো। আমরা তাকে মিটিং রুমে ঠেলে দিলাম। সে সবাইকে নমস্কার ঠুকে হাত কচলে ন্যাকার মত বললে, 'হুজুরগণ, প্রতিবছর সন্তানাদি নিয়ে বহুকষ্টে সংসার প্রতিপালন ক'রে থাকি। তাই বাজেটের আগে যৎসামান্য বেতন বৃদ্ধির আশায় বছর বছর আর্জি পেশ করি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। আপনাদের সভায় ডাকও পড়ে না। কালী গুপ্ত মানুষটা যে কে, কেমন তাকে দেখতে, তাই বোধহয় কমিশনার বাবুরা কিংবা খোদ চেয়ারম্যান সাহেব জানেন না। তাই এবার উল্টো কাজ ক'রে দেখলাম। তাতে অন্তত এই লাভ হ'লো যে আপনারা ডাকলেন। এই চেহারাখানা দেখলেন। আমিও চাঁদের হাট দেখলাম। এখন মারুন, ধরুন, ফাইন করুন, যা খুশি। আপনারা হুজুর হলেন অন্নদাতা।'

দুনীচাঁদের জীবন ও কাহিনী এত ব্যাপক আর বিচিত্র যে শেষ করা মুস্কিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাঁর বিচিত্র জগতে শেষ কালটায় আমি এতটাই ঢুকে পড়েছিলাম যে মানুষটার ওপর একটা দারুণ টান, কিংবা বলা যায় মোহ এসে গিয়েছিল। তাঁর হাসকুটে জীবনের অন্দরে একটা সঞ্চয়ী পরিশ্রমী গভীর মানুষ বাস করতো। আলাদা ক'রে ভাবলে মনে হয়, আমাদের মত ছোট শহর বা অশহরই বুঝি নির্মাণ করতে পারে দুনীচাঁদের মত চরিত্র। দুনীচাঁদ যেন আমাদের পৌরসভারই অবিকল বিগ্রহ, তার স্খলন পতন হাসি পরিহাস সব মিলিয়ে। ছোট শহরের বদ্ধ একঘেয়ে পুরজীবনে তাঁর মত লোক যেন এক অলক্ষ ছন্দ রেখে যায়।

দুনীচাঁদকে দেখে আমার আর একটা বিস্ময় জেগেছে। ছোট শহরের একজন ছোট মাপের চাকুরে যে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসেন তাঁর জীবিকা এ আমি আগে ভাবিনি। তিনি যেন নিজের জীবনটাকেই লতার মত জড়িয়ে দিয়েছিলেন

পুরসভাগৃহের স্টোর রুমের অন্ধকার একখানা ঘরে। তার চেয়ারে টেবিলে আলমারিতে চাবির গুচ্ছে যেন আজও লেগে আছে দুনীবাবুর স্বেদ গন্ধ স্পর্শ। অফিসে তাঁর কি কাজ ছিল? সংক্ষেপে বলতে গেলে সারা অফিসের সব সেকশনে চাহিদামত তিনি সরবরাহ করতেন কালি, কলম, দোয়াত, পেপারওয়েট, পিন, নিব, ট্যাগ, সুতো, পেন্সিল, কার্বন, পিনকুশন, ক্লিপ, ব্লটিং পেপার, ফাইল, খাতা, সাদা কাগজ, রুলটানা কাগজ।

চল্লিশ বছর চাকরির মধ্যে শেষ পঁচিশ বছর এই সব জিনিসের সরবরাহের হিসেব তিনি তাঁর মুক্তাক্ষরে একটা জাব্‌দা খাতায় লিখে রাখতেন। আর কেউ না-জানুক আমি জানতাম এছাড়া দুনীচাঁদের একটা নিজস্ব বাঁধানো খাতা ছিল— তাতে প্রতিদিনই অফিস ছুটির পর লেখা হ'তো তাঁর নিজের জগতের খবর। এই



খাতাটি এখন আমার জিম্মায়। এটি আমাকে তাঁর ভালবাসার দান, অবসর নেবার আগের দিন। কিন্তু সে খাতার কথা পরে উঠবে।

অফিসে দুনীচাঁদের প্রকাশ্য জীবনের ক্রিয়াকলাপও কম বিচিত্র নয়।

অ্যাকাউন্টস্ বিভাগে বিল পাশে গড়িমসি হয় তাই দুনীচাঁদ সেখানে সাদা কাগজে লাল কালিতে 'Do it now' লিখে টাঙিয়ে দিয়েছেন। ভেহিকিল্স্ বিভাগে লেখা রয়েছে 'নিজের চরকায় তেল দিন'। বড়বাবুকে সবাই বিরক্ত করে, অকারণে তাঁর সামনে পাবলিক ব'সে ঘোঁট পাকায়, তাই দুনী সেখানে লিখে দিয়েছেন :

অত্র

আপনার কাজ মিটিয়া গেলে

চলিয়া যাইবেন যত্রতত্র

নিজের ঘরে আলমারিতে এক একটা পিচবোর্ডের বাক্সে অফিসের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো থাকে। যে বাক্সে রুলটানা কাগজ থাকে তাতে লিখে রেখেছেন 'টানা টানা চোখ'। সাদা কাগজের রিমের প্যাকে লেখা—'অলেখা কবিতা'। কার্বন পেপারের বাক্সে—'প্রতিচ্ছবি'। অ্যাটেনডেন্স রেজিস্ট্রার—'চিত্রগুপ্তের খাতা'। ব্লটিং পেপারের কার্টনে—'শোষক'। স্টোর ডিপার্টমেণ্টে মাঝে মাঝে চা হ'তো। তার চা থাকতো যে কৌটোয় তাতে লেবেল ছিল 'বিষ', চিনির শিশিতে লেখা-'মধুমেহ'। ঘরের টাইপরাইটার যন্ত্রের গায়ে লেখা 'সুলেখা যন্ত্র'। পেন্সিলের বাক্সে—'বাঙালির অস্ত্র'। অফিসের বিভিন্ন ঘরে যে পিওন বুকটা যায় তার নাম 'পাখি'।

এই একটা নাম নিয়ে খটকা ছিল, জিগ্যেস করেছিলাম, 'পাখি নাম কেন ?'

বলেছিলেন, 'পিওন বুকটা কেবলই এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে উড়ে যায়। মোটে দাঁড়ে বসে না, তাই ঐ নাম।'

এখন ভাবি কতখানি জীবনরস, কত বড় মাপের উদ্ভাবনী ক্ষমতা দুনীচাঁদের ছিল, যার বলে শুকনো একটা সামান্য চাকরিকে প্রাণে রসে তাপে ভ'রে তুলে-ছিলেন। অবিবাহিত মানুষটার ভালবাসার শক্তি ছিল উষ্ণ ও অপরিমাণ। মাইনে কতই বা পেতেন। তাই নিয়ে যদি-বা ব্যঙ্গ ছিল, ক্ষোভ ছিল না। পাঁচটায় অফিস ছুটির পরে সন্ধ্যে সাড়ে ছটা সাতটা পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব গোপন খাতায় কী সব আঁকিবুকি কাটতেন। কিছু ছড়া, সহকর্মীদের নিয়ে। কিছু খবর, যা দুনীচাঁদের সচল জগতের সঞ্চয়। কিছু মন্তব্য, তাঁর নিজস্ব কায়দায়। শেষপর্যন্ত বাড়ির পথ ধরতেন দারোয়ানের তাড়া খেয়ে। আমাকে বলতেন 'বাড়িতে কি টান আছে বলো ? সিদ্ধপুরুষের সংসার।'

এই একবার তাঁর আত্মপরিহাসে হাসতে পারিনি। বুঝেছিলাম একক জীবন কি মর্মান্তিক। চাকরি কতখানি আগলে রাখে মানুষটাকে। এই মানুষ একদিন অবসৃত হবে তো নিয়মমতো! সেদিন কি হবে?

দুনীচাঁদের কথা লিখছি আর আমাকে দেওয়া তাঁর নিজস্ব খাতাখানা সামনে খোলা প'ড়ে আছে। ইতস্তত ছিটোনো কিছু খবর সেখান থেকে এখানে তুলে দিচ্ছি সময়ের ক্রম না রেখে, বিনা মন্তব্যে, পাঠকদের অবগতির জন্যে। তাতে কিছুটা হয়তো ধরা পড়বে দুনীচাঁদের আশ্চর্য জগতের আভা।

জার্মান যুদ্ধে মিত্রশক্তির ১ কোটি ১৩ লক্ষ লোক নিহত হয়।
রুশবিপ্লব ১৯১৭, ৭ই নভেম্বর আরম্ভ।
মিউনিসিপ্যালিটির কাঁঠাল গাছটির জন্ম ১লা আগস্ট ১৯৬১
নয়া পয়সা চালু ১লা এপ্রিল ১৯৫৭
কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনবাবদ শহীদ ১১ জন ১৯. ৫. ১৯৬১
প্রিন্স অব ওয়েলস ভবানীপুর বকুলবাগানে জগদানন্দ মুখার্জির বাড়ি আসেন ১৮৭৬ সালে।
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ২৩।১।৬৫ হইতে ইস্পাত তৈয়ারি শুরু।
পৌরসভার ড্রাইভার গোপীনাথের হঠাৎ মৃত্যু ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫
রেভেনিউ স্ট্যাম্প নূতন রঙের হইল ১লা আগস্ট ১৯৬৩

অবাক লিখন যাকে বলে। রুশ বিপ্লব থেকে গোপীনাথ ড্রাইভার, প্রিন্স অব ওয়েলস্ থেকে পৌরসভার অশথগাছ, ইস্পাত কারখানা থেকে রেভেনিউ স্ট্যাম্পের বর্ণ পরিবর্তন—সবই তাঁর আশ্চর্য জগতে স্থান পেয়েছে? এমন স্পন্দমান আর স্পর্শপিয়াসী দুনীচাঁদের মনটাকে কি কেউ বুঝেছিল?

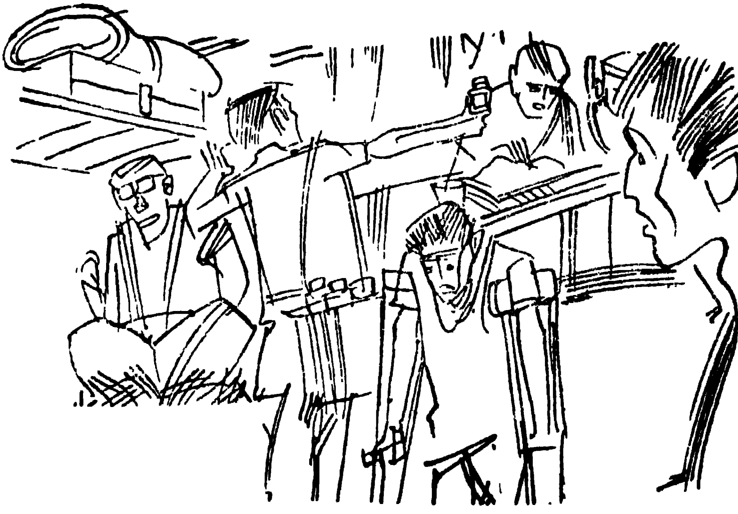
আমার শুধু বারে বারে মনে পড়ে তাঁর অবসর গ্রহণের দিনটার কথা। দুনী-চাঁদের কোন সহকর্মীর যদি অমন আশ্চর্য খাতা থাকতো তবে তাতে নিশ্চয়ই ধরা থাকতো এই সংবাদ: পৌরসভার স্টোর ক্লার্ক দুনীচাঁদ পালের অবসর গ্রহণ ৩০ শে জুলাই ১৯৭০! কিন্তু তাতেই কি বোঝা যেতো এ-ঘটনার গভীরতা? একজন জীবিকাপ্রেমী আমূল মানুষের উন্মীল সরসতা?

কেন যেন আমার কেবলই মনে হয়েছিল অফিসের ঐ প্রায়ান্ধকার কুঠুরি বরাবরের মত ছেড়ে আসতে দুনীচাঁদের মনে খুব কষ্ট হবে। কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে তাই সেদিন মানুষটার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম সর্বদা। তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই অবশ্য ছিলেন তাঁকে ঘিরে। নানা কথা বলছিলেন—সুখের, রঙ্গের, বুদ্ধির। টিফিন টাইম সেদিন একটু বাড়িয়ে তাঁর ফেয়ারওয়েলও বেশ সহজে উতরে গেল।

সহকর্মীদের সাদর উপহার ও ফুলের মালাও নিলেন। বললেনও দুয়েক কথা। ক্রমে দিনটা গড়িয়ে ঢং ঢং ক'রে পাঁচটার ঘণ্টা পড়লো পৌরসভার পেটানো ঘণ্টায়। হঠাৎ দুনীচাঁদের চোখে দেখলাম এক মায়ালোকের চকিত আলোর ঝিলিক, যা কোনদিন দেখিনি। ফিসফিস ক'রে আমাকে বললেন, 'এতদিন ধ'রে অনেক কষ্টে খুব গোপনে যা জমিয়েছি আজ তাই সবাইকে দিয়ে যাবো।' কি সেই জিনিস জানতে আগ্রহ হ'লো। ড্রয়ার খুলে সন্তর্পণে বার করলেন একটা প্যাকেট। সারা চাকরি জীবনে অফিসের ঘরে ঘরে যত পিনকুশন সরবরাহ করেছেন তিনি, নষ্ট হয়ে যাবার পরে তা ফিরিয়ে এনে সযত্নে তিলে তিলে সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন তার ভেতরকার কাঠের গুঁড়ো। কি আশ্চর্য! পলিথিনের বিরাট প্যাকেটে সেই অকিঞ্চিৎকর বস্তুর সঞ্চয় দেখে বললাম, 'এগুলো কি?'

হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ চোখে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দুনীচাঁদ বলে উঠলেন, 'এগুলো কি জানো না? পিন কুসুমের রেণু।' তারপরে সবাইকে সন্ত্রস্ত ক'রে পৌরসভা কাঁপিয়ে হা হা ক'রে প্রবল হেসে বিকট চিৎকারে বললেন, 'হাওয়া ছাড়্', ব'লেই ঝোড়ো হাওয়ার মত বেরিয়ে গেলেন পথে।

সেই শুরু। একান্তভাবে পুরসভার এক উজ্জ্বল মানুষ ছড়িয়ে গেলেন সারা পৌর এলাকায়। মানুষটিকে আর তাঁর বোধের সীমায় কোনদিন ধরতে পারিনি।



চেনা-অচেনা

সকাল সাতটা নাগাদ একটা লালগোলা প্যাসেঞ্জার এসে দাঁড়ায় জংশনে। ডিজেল ইঞ্জিন পাল্টিয়ে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন লাগিয়ে নবকলেবরে সেই গাড়ি ছাড়তে ঝাড়া চল্লিশ মিনিটের কারবার। ইতিমধ্যে সাতটা-পাঁচে ছাড়বে একটা লোকাল ট্রেন। কাজে কাজেই লালগোলার গাড়ি থেকে হুড়মুড়িয়ে যাত্রীরা নেমে লটবহর নিয়ে উঠবে লোকালে। একদল নানাবয়সী মেয়েছেলে অবশ্য নামবে গভীর ঔদাস্যে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে, হাই তুলে, গা চুলকে, ধীরেসুস্থে। এরা চালউলি। কোন্ আঁধার রাতে লালগোলা থেকে গাড়িতে উঠেছে। কোলে কাঁখে চালের বস্তা নিয়ে। গাড়ির নাম তাই মুখে-মুখে, লালগোলা নয়, চালগোলা। চালগোলা অবশ্য কৃষ্ণনগর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। এর পরেই রানাঘাট নৈহাটি দমদম এইসব স্টেশনে পুলিশবাহিনীর দাপটে ধুন্দুমার। কাজেই এখানে চালউলিরা নেমে পড়ে। আবার এরা উঠবে আটটার লোকালে। সেটা কেরানিবাহন ট্রেন। বাবুদের প্রশ্রয়ে পায়ের তলায় ফাঁকফোঁকরে চালের বস্তা গুঁজে এরা পার পেয়ে যাবে।

না না। এরা কেউই সে-অর্থে চালপাচারকারি নয়। বড়জোর এক কুইণ্টাল মাল। তাইই পাশ বালিশের মতো নানা সাইজে পুরে, সেলাই ক'রে, কোলে কাঁখে নিয়ে কোনোভাবে বাগমারি কিংবা দমদমের উন্মাদ আশ্রম ইস্তক পৌঁছানো।

ওখানে লোকাল ট্রেন বেআইনিভাবে একবার দাঁড়াবেই। খুচরো পয়সার লেনদেন আছে। ঝুপঝুপ পড়বে চালের বস্তা লাইনের ধারে। কাপড়চোপড় সামলে চাল-উলিরা নামবে লাফ মেরে। নিত্যযাত্রী কেরানি কানাই এইসব চালউলিকে বলে মাসী আর সেই সুবাদে এই চোরাগোপ্তা স্টপেজের নাম মুখে মুখে দাঁড়িয়েছে মাসী-ডাঙা। তাই বলে সবাই কি এদের মাসীর বয়সী? তা নয়। জমিলা, মহুয়া, সাবিত্রীকে যদি-বা মাসী বলা যায় কিন্তু রাবেয়া, আয়না কিংবা ঝুনু একেবারে ফুলকচি। কিন্তু কী এক অদৃশ্য প্রহারে, কোনো এক অজ্ঞাত গ্লানিমায় হয় এদের যৌবন ফোটে নি কিংবা ঢাকা আছে। নিত্যযাত্রী আর চালউলিদের সম্পর্ক, যাকে বলে, নেসেসারি ইভ্‌ল। টেরিকটন শোভিত নিত্যযাত্রীরা বলে, 'আবার এসেচ জ্বালাতে মাসী?' মাসীরা তাদের অনর্গল পান-খাওয়া কাঁইবিচির মতো দাঁত বার করে বলে, 'কোথায় যাবো বুনপো? ন্যাও, রাগ কোরুনি, এড্‌ডা পান খাও।'

বলতে গেলে জমিলারা ঐ পান খাইয়েই বশ করেছে নরম স্বভাবের যুবাদের। আর কিছু না থাক, আছে তাদের সরল নিষ্পাপ হাসি। আশ্চর্য যে, র‍্যাংক, স্ট্যাটাস বা ক্লাশ কোনো দিক থেকেই এদের সঙ্গে মিল নেই তবু যাত্রীরা কেন যেন এদের সম্বন্ধে নরম।

এদের ভুখা শ্রীহীন চেহারা, রুক্ষ আবহাওয়ার ঝাপটে অমার্জিত খড়ি-ওঠা গা, কানে-বেঁধা তীক্ষ্ণ গলার বেআন্দাজি কথাবার্তা, নোংরা কোঁচকানো পোশাক-আশাক, মাথাভর্তি উকুন এসব কোনোটাই সভ্য মানুষের বরদাস্ত করবার কথা নয়। তবু তারা পরম শত্রু পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে লোকাল ট্রেনে ওঠে, সিটের তলায় বস্তা লুকোয় অনুনয়-বিনয় ক'রে, পান কিনে খাওয়ায়, নিজেদের গল্প বলে এবং এমনকি কামরা ফাঁকা থাকলে কোমর বেঁকিয়ে মুসলমানী বিয়ের মেয়েলি নাচ গান করে। তাই ব'লে এরা সবাই মুসলমান নয়। একবার তাদের জাত জিগ্যেস করায় বলেছিল—'আমরা জেতে গরিব গো'। এরা ট্রেনকে বলে টেরেন, পুলিশকে বলে পুলুশ, চেকারকে বলে শকুন।

সকাল সাতটার চালগোলা গাড়ি থেকে নেমে এরা প্রথমে স্টেশনের চত্বরে একটু গা-গতরের ঝিমুনি ভাঙে। হাতে একঘণ্টা 'টাইম', তাই আস্তে সুস্থে কলের জলে মুখহাত ধোয়। তার পরে 'পেলাটফর্মে' বসে পুঁটলি খুলে শানকিতে ক'রে লালচালের ভাত আর মুলো-পালঙের ঘ্যাঁট খায় তারিয়ে তারিয়ে। কোন্ নিশিরাতে যখন লালগোলা থেকে রওনা হয় তখন বাড়ির লোক দিয়ে যায় এই শাকভাত। খেতে খেতে কত গল্প তাদের। যেন বেশ আছে। কিন্তু সত্যিই তো

বেশ নেই। পদে পদে বেইজ্জতি আর বেইমানি। ধরা পড়লেই পুলিশের হুজ্জত। তা ছাড়া বাগমারির উস্‌কো মস্তান পটল হামিদুল চিনটু আছে, তাদের ট্যাকসো দিতে হয়। দমদমের সিঁথি অঞ্চলে এদের কারবার। সেখানে 'তোলা' দিতে হয় মদনা মিন্টু আর পনাকে। এসব আমি জানতে পারি জমিলার দলের আয়নার কাছে। আমার মুখে সে নাকি তার মরা মামার আদল দেখেছে, তাই আমাকে মামা বলে ডাকে। আমার খুব ন্যাওটা এই আয়না। তার ভালোবাসার অত্যাচারে একদিন তার-আনা চালের রুটিও এমনকি আমাকে খেতে হয়েছিল খেজুর গুড়ের পাটালি দিয়ে। তার উপরোধে একদিন তাকে আমার বাড়িও নিয়ে যেতে হয়। কী না মামী আর বোনকে দেখবে সে।

বাড়িতে ঢুকে বিহ্বল চোখে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আয়না আমার গিন্নির দিকে। আঁচল থেকে বার করে দেয় পাটালি আর কুমড়োবড়ি। ঝুপ করে পেন্নাম ঠোকে তার মামীকে। বলে, 'মামীগো আমি তুমার আয়না দাসী'। আমার অবাক-হওয়া মেয়েকে দেখে বলে, 'ইডা কি আমার ছুটু বুন? আই মা, কী সোন্দর! যেন লতুন গুড়ের পারা সোনার বন্ন।' বলেই সবাইকে অপ্রতিভ করে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন ক'রে তার বুনকে সশব্দে চুমু খায়।

অথচ আশ্চর্য যে আয়নার এহেন ব্যবহারে কেউই চটে যাই না। জীবনের কোনো ঘনিষ্ঠ তাপ বরং ছুঁয়ে যায় আমাদের পরিবারকে। পাড়ার দোকান থেকে তার জন্যে মিষ্টি কিনে এনে দেখি ঐটুকু সময়ের মধ্যে আয়না জমিয়ে নিয়েছে বেশ। আমার মেয়ে তার কাছ থেকে অনেক খবরও জোগাড় ক'রে ফেলেছে এই ফাঁকে। আমি বাড়ি ঢুকতেই সে চোখ বড় বড় করে বলে, 'জানো বাবা, আয়নাদিদিরা এক মাস বাড়ি যায় নি। কী কষ্ট।'

: কেন?

: ও মামা, গত এক মাস তো টেরেনেই আপ-ডাউন করছি। রোজ শেষ রাতে পৌঁছুই লালগোলা। পেলাটফরমে গোসল সারি। গাঁয়ের ছেলেরা চালের বস্তা আনে। মেয়েরা আনে ভাত-তরকারি। বাসী কাপড় ছেড়ে কাচা কাপড় পরি। ছাড়া কাপড় আর ট্যাকা নিয়ে ওরা সুম্‌সারে ফিরে যায়।

মেয়ে জিগ্যেস করে, 'এত কষ্ট করে চাল তো নিয়ে যাও তারপরে পুলিশ যদি চালের বস্তা কেড়ে নেয়?'

আয়নার মুখচোখ ক্রোধে ফেটে পড়ে। মুর্শিদাবাদী লম্বা টানের উচ্চারণে বলে, 'ইল্লি-ই-ই, কেড়ে লিলিই হলো?'

: কাড়লে কি করবে ?

: কি কোরবো শোন্‌বা ? সুমুস্ত চাল এই টেরেনময় ছড়িয়ে দেবো শ্যাঁকালির মুখ খুলে, বুয়েচো বুন ?

: তার পরে ?

: তাপরে সুমুন্দির পোগুলো য্যাখন চলে যাবে ত্যাখন কুড়িয়ে বাড়িয়ে ঝেঁটিয়ে আবার শ্যাঁকালিতে তুলে লিব।

কিন্তু আসলে এ কাহিনী তো আয়নার কথা বলবার জন্যে নয়, আমি বলতে চাই আপেলের কথা। আপেলের সঙ্গে আয়নার একটা যোগ আছে অবশ্য। কেননা আমাদের বাড়িতে আপেলকে কাজে ঢুকিয়েছিল আয়না। আপেল নাকি এক সময়ে আয়নাদের সঙ্গেই চাল বইতো। এসব আমার গিন্নির কাছে ক্রমে ক্রমে শোনা। আপেল তার নামের মতোই ফর্সা টুকটুকে গোলগাল। তাতেই ঝঞ্ঝাট। হিন্দু-ঘরের কমবয়েসী বিধবা। তাকে দেখেই রেলপুলিশ পেছনে লাগে। চাল বওয়া কাজ তার নাকি হবার নয়। কাজেই লোকের বাড়ি ভাতে মাইনের কাজ। কিন্তু সেখানেও ছোঁক ছোঁক। তাই অনেক বুঝে শুনে দেখে আয়না তার মামীর হাতে তুলে দিলো আপেলকে। 'মন দিয়ে কাজ করলে জনম কেটে যাবে তুমার বুয়েচো ? শরীলটাই তোমারে মেরেচে। মনটারেও সামলে সুমলে লিবা বুয়েচো ?'—এইসব উপদেশ দিয়ে আয়না রেখে গেল আপেলকে। গিন্নি পেলেন স্বর্গ, মেয়ে পেল সঙ্গ।

আপেল চটপটে, হাসকুটে, খোসামুদে। সব কাজে এগিয়ে যায়। বললে বলে, 'জানেন মামা, আমার যে-বাড়ি বিয়ে হয়েলো সিখানে আমি ছিলাম সেজ বউ। তো সেজ বউয়ের ছড়া জানো বুন ? জানো না ? তবে শোনো—

সেজ বউ সেজুনি
সব কাজে এগুনি।'

আমি বললাম, 'আপেল তোর সামনের দিকের দুটো দাঁত ভাঙলো কি করে ?'

তাড়াতাড়ি দাঁত ঢেকে আপেল বলে, 'সে বড় দুঃখের কথা মামা। সেবারে সেই নৈহাটি ইস্টিশনে পুলুশ তাড়া করেলো। বস্তা নিয়ে পেলাটফর্মের অফসাইডে দেলাম ঝাঁপ। মুখ থুবড়ে পড়ে গ্যালাম। কী রক্ত কী রক্ত মামা। দাঁত দুটো গেল।'

মেয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'আপেলদিদি, তুমি যে কাল বললে তোমার শাশুড়ি নোড়ার বাড়ি মেরে দাঁত ছেঁচেছে ?'

আপেল তাড়াতাড়ি কার্যান্তরে গেল। গিন্নি চাপা গলায় বললেন, 'মেয়েটা জাতমিথ্যুক। সামলে থাকতে হবে।'

পরে বোঝা গেল যতটা মিথ্যাচারী তার চেয়ে বেশি হুজুগে মেয়েটা, খানিকটা খ্যাপাটেও বটে। তার পরে জানা গেল আপেল আসলে উদ্বাস্তু কিন্তু আয়নাদের সঙ্গে মিশে রপ্ত করেছে বাগড়ী অঞ্চলের উপভাষা। এইরকম ক'রে এক একটা খোলস ঝরে পড়ে শেষমেশ সারকথা এই দাঁড়ালো যে, আপেলের সাকিন নদে জেলার চামটা পি. এল. ক্যাম্প। বাড়িতে আছে বিধবা মা আর বখে-যাওয়া ভাই। আসলে কোথাও তার শিকড় নেই। তাই কোনো টানও নেই। তাই অচিরে একদিন ভোরে দুধের ক্যান নিয়ে আপেল হরিণঘাটার দুধ আনতে গেল এবং উধাও হয়ে গেল। আয়নাকে সে কথা জানাতে সে বললো, 'ওর কপালে সুখ নাই গো।'

আয়না এবারে জানালো আর একটু গূঢ় খবর। আপেলের স্বামী ফলিডল খেয়ে মরেছিলো। তার কারণ আপেলের ছোঁকছোঁক বাই। আয়না একগাল হেসে বললে, 'মেয়েছেলেটার বড্ডা কামের বাই গো। ওতেই ওর মরণ।'

গিন্নি ভাবলেন গেল একটা দুধের ক্যান। অবিশ্যি মাইনে নেয় নি আপেল এই যা ভরসা। যদি আসে কোনোদিন সেই টানে। সত্যিই এলো আপেল মাস তিনেক পরে। মেয়ে চেঁচিয়ে জানান দিলো, 'মা মা, আপেলদিদি এসেচে কিন্তু দুধের ক্যান আনে নি।'

তাকিয়ে দেখি ক্যান আনে নি, কিন্তু এনেছে এক যুবাকে। চাপা প্যাণ্ট আর টেরিকটনের পাঞ্জাবি পরনে, মাথায় ফ্যাকম-তোলা চুল। লাজুক ভঙ্গিতে যুবা আমায় প্রণাম করে। আপেল বলে, 'মামা এ আপনার ভাগ্নী-জামাই।'

ভাগ্নী-জামাইকে তোয়াজ করতে বসি বাইরের ঘরে, আপেল যায় অন্দরে। চোয়াড়ে চেহারার এই যুবা তা হলে আপেলের নবার্জিত দ্বিতীয় স্বামী। অনিচ্ছুক খেজুড়ে আলাপ চালাতেই হয় আনৃশান্ ব্যাপার নিয়ে মিনিট পনেরো। 'কি করা হয়?' আমার এই ভাববাচ্যের প্রশ্নের ফ্যাঁসফেসে কণ্ঠে জবাব আসে 'বিজনেস'। সে যে কী বিজনেস কে জানে! উপস্থিত শ্রীমান্ বিজনেসম্যান মিষ্টি আর সিঙাড়া খেয়ে যান। ফ্যাঁসফেসে গলা আরেকবার জানান দেয়, 'মুক্তা আপনাদের কথা বলে, তাই এলাম।'

মুক্তা? তার মানে আপেলের নাম মুক্তা? তা হবে। মুক্তাই তো, একেবারে বর্‌ন্ ফ্রি। আর তা-ছাড়া এমন বাঁদরের গলায় অমন মুক্তাই তো সাজে। নাঃ,

দিনটাই তেতো হয়ে গেল—এই যখন ভাবছি তখন ছোকরাই বাঁচালো বাইরে যেতে চেয়ে। তার মানে বিড়ি ইনটারভ্যাল্। উত্তেজনা কমাতে আমিও সিগারেট ধরাই এবং স্থড়ুৎ করে বাড়ি থেকে কেটে পড়ি।

কপাল ভালো বলতে হবে। কেননা দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখি আপদ বিদেয় হয়েছে। কী, না যুগলে গেছেন সিনেমা সন্দর্শনে। ভালো কথা। আবার ফিরবে না তো? গিন্নি সব দিক সামাল দেন। এক দিকে আমার হাইপারটেনশন কমান, অন্য দিকে বলেন, 'তা অন্যায়ই বা কি এমন করেছে? কাঁচা বয়স! কত বড় জীবন পড়ে রয়েছে বলো তো? আহা, ওদেরও তো সাধ-আহ্লাদ আছে।' মেয়ের কাছে আরেক বার্তা মিললো। সেই ফ্যাঁসফেসে ছোকরা তার হাতে পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে গেছে। কী অন্যায়। কেন? কেন?

নিত্যযাত্রীর জীবন একই ছন্দে চলে আমার। আয়নাকে ট্রেনে জানাই আপেলের নতুন বিয়ের খবর। 'মরণ' এই বহুভাবমেশানো অব্যয় সে ছুঁড়ে দেয় মুর্শিদাবাদী সুরে টেনে। 'ওর নাম বুঝি মুক্তো? বলিস্ নি তো?'

: মুক্তো না সুক্তো সে জেনে আমার কাজ.লাই।

ব্যস, মিটে গেল আপেল-পর্ব এই যখন ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েছি তখন একদিন সন্ধ্যেবেলা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরতে চা-জলখাবার দিলো আপেল। ভক্তিভরে পেন্নাম ঠুকলো। মাথায় ঘোমটা। ভাবলাম, যাক্ ছুঁড়ি তা হলে স্বামীর সংসারে সাধ্বী হতে পেরেছে। 'ভালো আছিস্ তো?' এই সাজানো প্রশ্নের বেসুরো উত্তর মিললো, 'আর মামা, আমাদের আর ভালো থাকা!'

রাতে রয়টার পাকা খবর দিলেন। আপেলের বিয়ে কেঁচে গেছে।

'ঘোমটা দেখলাম যে?' আমার ককিয়ে-ওঠা বিস্ময়ে জল ঢালা উত্তর পেলাম, 'কী ক'রে মুখ দেখায় তোমাকে কালামুখী? তাই ঘোমটা।'

ব্যাপার কি? আমার টি. ভি. দেখা মাথায় ওঠে। ব্যাপার অবশ্য খুবই সাধারণ। টি. ভি. সিরিয়ালের মতোই সংক্ষিপ্ত। নবদ্বীপে কণ্ঠীবদল ক'রে বিয়ে হয়েছিলো। ছোকরা বদ্‌মেজাজী তায় চুল্লুখোর। কাজেই চুরিচামারি ঝগড়াঝাঁটি মারধোর। তাই আপেল রাগ করে সিঁদুর মুছে চলে এসেছে।

আমি শেষ তৃণখণ্ড চেপে ধরে বললাম, 'একটা সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনে-ছিলাম যেন!'

: গোলমাল তো সেইটা নিয়েই। পুরুষমানুষের অত কৌতূহল কিসের ? কাল থেকেই দেখতে পাবে। আপেল আবার কাজে বহাল হয়েছে।

এক্ষেত্রে আমি দর্শক মাত্র। তবে কৌতূহল বড় পুরনো বাই। তাই বললাম, 'কিন্তু আবার ভাগ্নী-জামাইয়ের হ্যাঁপা সামলাতে হবে না তো ?'

'আপেলের কানের মাকড়ি আর গলার হার নিয়ে তিনি চম্পট দিয়েছেন, কাজেই এখন নিশ্চিন্তি ঘুমোও'—এই ছিল হোম মিনিস্টারের শেষ নির্দেশ।

নির্দেশ পালন করতে সচেষ্ট হই। টি. ভি. বন্ধ ক'রে, বাথরুম সেরে, নিদ্রা-দেবীকে ডাকি, কিন্তু, তাঁর বদলে চিন্তা দেবী দেখা দেন। আশ্চর্য, আমার চিন্তায় কী বা আসে যায় ! আপেলের মতো মেয়ের কোনোখানেই কোনো শিকড় নেই। দুধ আনতে গিয়ে দুধের ক্যান নিয়ে উধাও হতে তার যেমন লাগে, সিঁদুর মুছে সংসার ভাঙতেও তার চেয়ে বাড়তি বিবেচনা কিছু লাগে না। আপেলের মুখে ঘুরতে ফিরতে একটা প্রবাদবাক্যের মতো অমোঘ শব্দপুঞ্জ প্রায়ই শুনি—'ওসব নবদ্বীপের ব্যাপার মামা।'

তার মানে মহাপ্রভুর পদরজধন্য নবদ্বীপ এখন একটা ব্যাপারবিশেষ। ঝটিতি বিয়ে আর চকিতে সিঁদুর মোছা সেখানকার নিত্যক্রিয়া। তবে তাই হোক। আপেল শুদ্ধা না হলেও হোক মুক্তা।

সংসারের নিত্য দিনে আবার নৈপুণ্যের ছন্দ জাগে আপেলের কর্মিষ্ঠতায়। ভোরবেলা তার আদুরে গলার সুরেলা আওয়াজে ঘুম ভাঙে—'মামা, চা খ্যান্।' পাপিষ্ঠার মুখ দেখা যে উচিত নয় ভোরবেলা সে কথা মনে থাকে না। রান্নার পদে কিছু কিছু পূর্ববঙ্গীয় সংযোজন স্বাদে গন্ধে জমে ওঠে। টি. ভি. বিজ্ঞাপনের বাইরের বেশ কিছু বাংলা সিনেমার গান বাথরুম থেকে সাবান কাচার ফাঁকে ভেসে আসে। বলতেই হবে আপেলের গলাটি মিষ্টি। অচিরে আমার মেয়ে গত ক'মাসের লজ্‌ঝর-মার্কা বাংলা সিনেমার গল্প শোনায় আমাকে। কে বলেছে কে বলেছে আপেল বলেছে। হঠাৎ সুযোগ বুঝে গিন্নি পালান পিত্রালয়ে পনেরো দিনের কড়ারে। আপেলের সংসারিপনায় এমনি তো কোনো খুঁত নেই। ভোরে আমায় ট্রেনের ভাত দেওয়া, সঙ্গে টিফিন। মেয়েকে ইস্কুল দিয়ে-আসা নিয়ে-আসা। কোনো কাজেই পেছপা নয়।

অন্তর্ঘাত এল অবশ্যই অনিবার্যত এবং অতর্কিত। একদিন সহসা ট্রেনের গণ্ডগোলে নৈহাটি অবধি গিয়ে ফিরে আসতে হ'লো ভরদুপুরে। গিন্নি পিত্রালয়ে,

কন্যা বিদ্যাগৃহে। দরজা খোলা পেতে দেরি হ'লো। আপেল দরজা খুলে বললো, 'বাথরুমে ছিলাম মামা'।

আমি শয্যাগৃহে পোশাক পালটে সোফায় বসি। সামনের অ্যাসট্রেতে আধজলন্ত সিগ্রেট। আমার কৌতূহলের সামনে এক কাপ অযাচিত চা ধরে আপেল বললো, 'আমার এক দাদা এসেচে কলোনি থেকে—তিরনাথ সরকার।'

তিরনাথ অর্থাৎ ত্রিনাথ এবার মঞ্চে আসেন। ইনি দাদা কি আমার আরেক ভাবী ভাগ্নী-জামাই সেই চিন্তা কুরে খায়। এই দিবাভিসার কতদিনের এবং কোন্ মাত্রার সে ভাবনাও দিশেহারা করে। এই প্রথম খুব অসহায় লাগে নিজেকে এবং ধর্মপত্নীর অনুপস্থিতির মর্ম বুঝি। আপেল অবশ্য সব দিক সামলে দেয় তার অকুণ্ঠিত সাবলীলতায়। অবিলম্বে বিদায় নেন তিরনাথ এবং তার প্রতি বিদায়-কালীন সম্ভাষণগুলি আপেল আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই করে। যেমন—'মাকে বলিস্ চিন্তা না করতে। টাকা পাঠাবো। ভাইকে ল্যাখাপড়া করতে বলিস্। তুই মাসকাবারে এসে টাকা নিয়ে যাস্ মামীর কাছ থেকে।'

আমিও প্রচ্ছদ অকম্পিত রেখে বলি, 'কিছু খাইয়েছিস তো ওকে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে' বাক্যাংশ এতটাই সোচ্ছ্বাসে ব্যক্ত করলো আপেল যে ভরদুপুরে গায়ে কাঁটা দিলো।

দিন দুই পরে সাফল্যের হাসি মুখে টেনে গিন্নি ফিরলেন। প্রাথমিক অভ্যর্থনা, কুশল বিনিময় ইত্যাদির পর আসল কথাটি আমাকে পাড়তেই হলো নিভৃতে। একটু রসিকতা মিশিয়েই বললাম, 'তোমার মুক্তা আবার শুক্তির মধ্যে আত্মগোপন করবেন শিগ্গির। তৈরি থেকো।'

: তার মানে?

: তার মানে তার তৃতীয় পতি পূর্বাচলে উঁকি মেরেছেন। তার নামও অবশ্য ত্রিনাথ। নামটা বেশ দ্যোতক।

আমার রসিকতা মাঠে মারা গেল। কেননা গিন্নি গম্ভীর হলেন।

মন্দাক্রান্তা চালে সংসার চলতে লাগলো। আপেলের বাথরুম সং আর শোনা যায় না। গিন্নি তাকে কড়কেছেন। এ বাড়িতে বেচাল চলবে না—তাঁর হুলিয়া। তবু তো দিবাভিসারের খবরটুকু চেপে রেখেছি।

এই ভাবেই প্রত্যাশিত মাসকাবার এলো এবং একদিন বিকেল-সন্ধের সঙ্গমে আমার কোলাপসিব্‌ল্ গেটের সামনে রাজবতুন্নতধ্বনিতে গর্জে উঠলো একটি কাংস্য কণ্ঠ—'পাখি আছিস্ নাকি?'

'পাখি কে ?' মেয়ের অবোধ প্রশ্নের উত্তরে কী যে বলি ?

যেমন ত্রস্তে ছুটে এলো আপেল তাতে বুঝলাম এই বাঁশির ডাকের জন্যেই যেন সে কান পেতে ছিল। এও বুঝলাম, যে-চালপাচারকারী সে আপেল, যে-'নবদ্বীপের ব্যাপারে' জড়িত সে মুক্তা, আর কলোনিতে সে-ই পাখি। ত্রিনাথ আর পাখিকে মুখোমুখি করে আমি শয্যাগৃহে আশ্রয় নিলাম এবং টি. ভি-র শব্দগ্রাম বাড়িয়ে দিলাম। গিন্নি হঠাৎ তৎপর হলেন মেয়ের বকেয়া হোম টাস্কের কাজে পাশের ঘরে। অবিলম্বে টি. ভি.-র আওয়াজ ছাপিয়ে ভেসে ওঠে কন্যার কান্না। অথচ আশ্চর্য যে নীরবে সমাধা হয় পাখি-পর্ব। সে সপ্রতিভভাবে চা দিতেই জিগ্যেস করি, 'সে চলে গেছে ?

'কখন। টাকা নিতে এসেছিলো। মা-র অসুখ।' আবার শান্তি ফিরে এলো সংসারে। আবার গান। গিন্নির প্রসন্নতা ও আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। এবার সে নাকি পায়ে ধরে কথা দিয়েছে আর বিয়ে করবে না। অবশ্য তিরনাথ খুব ধরেছে। খুব গোঁয়ার আর একরোখা তো। কিন্তু শিক্ষা হয়ে গেছে। সে মামার সংসারই করবে।

নৈমিত্তিক জীবনের ছন্দে এইভাবেই শিকড় গজাতে লাগলো আপেলের এই নতুন সংসারে। কিন্তু শিকড়েরও নাকি ডানা থাকে। আর পাখির ডানায় নাকি থাকে জন্মগত উড়াল।

হঠাৎ সেদিন কর্মক্লান্ত মানুষটি বাড়ি ফিরে সুরেলা গলার 'মামা চা ন্যান্' ডাকটা শুনতে পেলো না। বরং সেণ্টার টেবিলে গিন্নির ঠক্ করে রাখা বেসুরো পেয়ালা পিরিচে বেজে উঠলো অব্যক্ত বিরক্তি। আপেল আবার চলে গেছে।

কারা এরা ? কেবলই ছন্দ ভাঙে, কেবলই প্রত্যাশা জাগায় আর টলায় ? সত্যিই এদের সঙ্গে আমাদের যোগ কতটুকু ? তবু কেন আমাদের ভাবনার দিগন্তকে এরা নড়বড়ে করে দেয় ক্ষণে ক্ষণে ?

কয়েক মাস পরে ট্রেনে আয়না যখন বলে, 'সেই লষ্ট মেয়েডা মরিছে। টেরেনের লাইনে মাথা দিয়েলো। মরণ। পেটে নাকি বাচ্চা ছিলো একরত্তি' তখন ভাবি সত্যিই কে আত্মহত্যা করেছে। আপেল, মুক্তা, পাখি, না অন্য কোনো নামের আড়ালে একটা নারী শরীর ?

* * * *

ছোটবেলা আমাদের যে মুড়ি দিতো তার নাম ছিল সুবাসী। আর আমাদের পাড়ার বাড়ি বাড়ি বাঁকে করে যে জল দিতো সেই গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার লোকটার

নাম ছিল মঙ্গল। মঙ্গল ছিল জাতে ওড়িয়া, প্রচুর পান খেত। সুবাসীকে আমি কোনোদিন সধবার পোশাকে দেখিনি। একদিন সকালে বাড়িতে মুড়ি ছিল না। মা আমাকে তাই মুড়ির টিন দিয়ে বলেছিলো সুবাসীর বাড়ি থেকে মুড়ি আনতে। সুবাসী তখন গরম গরম মুড়ি ভাজছিলো। আমাকে একমুঠো খেতে



দিয়ে কাঠায় করে মুড়ি মেপে টিনে ভরে দিলো। আমি ততক্ষণে বিস্ফারিত চোখে দেখলাম সুবাসীর তক্তপোষে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে মঙ্গল। বাড়ি এসে মাকে জিগ্যেস করলাম, 'মা, সুবাসীর ঘরে মঙ্গল ঘুমোচ্ছে কেন?'

মা উত্তরে ধমক দিয়ে পড়তে যেতে বলায় ব্যাপারটার সদুত্তর মেলে নি। বয়ঃসন্ধিকালের কৌতূহল তাই বলে তো আর বসে থাকতে পারে না। পাড়ার হাড়-বখাটে ছেলে ন্যাড়া জানিয়ে দিলো, 'তুমি একটা ক্যাবলা। ওদের বিয়ে হয় নি কিন্তু বর-বউয়ের মতো থাকে। ওদের ছেলে হলো প্রাণকেষ্ট।'

প্রাণকেষ্ট ? সেকি ? সে যে সুবাসীকে পিসি বলে ? আমার বিস্ময়ে ঠাণ্ডা জল ছুঁড়ে স্যাড়া চলে গেল।

নিম্নবর্গের খেটে-খাওয়া সমাজের রীতিনীতি যে অন্যরকম তা বুঝতে বুঝতে বয়স পাকে। কালক্রমে কবে মরে গেছে মঙ্গল আর সুবাসী কিন্তু তাদের অকর্মার ধাড়ি সন্তান প্রাণকেষ্ট এখনও সেই ভিটেয় আছে। তারও একটা জুটিয়ে-আনা বউ আছে। লোকের বাড়ি ঝি-গিরি করে অলপ্পেয়ে গেঁতো পুরুষটাকে সে পোষে। দিনরাত গালমন্দ ক'রে, মেরে ধ'রে সে প্রাণকেষ্টকে তবু কোনো কাজে লাগাতে পারে নি। আমাদের পাড়ার চায়ের দোকানে ব'সে প্রাণকেষ্ট প্রায় সময়েই পা নাচায়। তা বছর পঞ্চাশ বয়েস হ'লো তার। এহেন প্রাণকেষ্ট আমাকে বছরের একটা সময় খুব তোয়াজ ক'রে ঘোরাঘুরি শুরু করে ফি-বার।

যখন গাছে গাছে শিমুল পলাশ ফোটে, কাঞ্চন ফুলও উঁকি-ঝুঁকি মারে। কলেজের পাশের অ্যাভেনিউয়ে দেবদারু পাতার শবশয্যা পাতা হয়। গলির মোড়ের মৈত্র-বাড়ির বাতাবী ফুল জানান দেয় বসন্তের। বুঝতে পারি আমাদের এই শ্রীহীন ঘটনাহীন গঞ্জ-শহরেরও হ'তে চলেছে বাংলা বছরের সমাপন। তার মানেই এবারে একদিন আসবে প্রাণকেষ্ট। মাটির দিকে তাকিয়ে পায়ের নখ দিয়ে আঁকি-বুকি কাটতে কাটতে বলবে, 'মনে আছে তো ?'

ভোলবার কি উপায় আছে প্রাণকেষ্ট থাকতে ? নতুন বছরের জন্যে তার একটা বাংলা ক্যালেণ্ডার চাই। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাউণ্ডুলে নিষ্কর্মা এই মাঝবয়সী মানুষটার বাংলা ক্যালেণ্ডারের কি প্রয়োজন ? উত্তরে জীবনের কত যে মজাদার খবর জোটে। ১লা বৈশাখের হালখাতায় খুব চেষ্টা না ক'রলেও দু-একখানা বাংলা ক্যালেণ্ডার জুটেই যায়। আমাদের পরিবারের যা জীবনপ্রণালী তাতে বাংলা ক্যালেণ্ডার কীই-বা কাজে আসে ? প্রাণকেষ্ট তাই অনায়াসেই জিনিসটা পেয়ে যায় ফি-বছর আর খুব ধুম করে পেন্নাম ঠোকে। কেন ?

বলতে গেলে ঐ ক্যালেণ্ডারখানাই তো তার প্রাণভোমরা, তার উদরপূর্তির উপায়। তাই ক্যালেণ্ডারখানা হাতে পেয়েই খুব যত্ন করে লালকালিতে ঢ্যাড়া টানে সেই-সব তারিখে যাতে আছে বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন আর অন্যান্য পর্বের নির্দেশ। এইবার সারা বছর ধরে চলবে তার অভিযান। আমাদের এই গঞ্জ-শহরের উত্তরপূর্বাঞ্চলে সব ভোজকাজেই অনিবার্যভাবে দেখা যাবে প্রাণকেষ্টকে। খুবই সলাজ কুণ্ঠিত ভঙ্গি তার, তবে খুবই নিশ্চিত নিশানা। কোনো ভোজবাড়িতেই

তার নেমন্তন্ন থাকে না যদিও। সর্বত্রই সে রবাহূত। অদ্ভুত তৎপরতায় কাক চিল কুকুর আর মাছির মতো সে গন্ধে গন্ধে হাজির হয়।

বিচিত্র জীবিকার তাগিদে এই আশ্চর্য সমাজে প্রাণকেষ্টর চেনাজানার বৃত্ত যেমন চমকপ্রদ তেমনই সুনির্বাচিত। হালুইকর বামুন, মসলাবাটার পেটেল, ডেকরেটরের দোকান কর্মচারী, মাইকঅলা, লাইটের দোকানদার, মিষ্টির দোকান কর্মচারী, বাজারের মাটির গেলাসের বিক্রেতা, ভোজবাড়ির বাসনভাড়ার ঠিকেদার এমনকি দশকর্মা ভাণ্ডারের সেলস্‌ম্যান—এত রকম বিচিত্র বৃত্তির মানুষের সঙ্গে প্রাণকেষ্টর দোস্তি। এদের কারুর-না-কারুর কাছে সে ঠিকই আগাম খবর পায় শহরের কোন্ বাড়িতে সম্ভাব্য কী উৎসব আসন্ন: ক্যালেণ্ডারের বাইরে থাকে শ্রাদ্ধ, ভঁাকালো পাকা-দেখা কিংবা প্রথম বিবাহবার্ষিকীর ধুম। প্রাণকেষ্টর এইসব বন্ধুমণ্ডলীর কাউকে না জানিয়ে তো এখানে কোনো উৎসব বিশেষত ভোজকাজ হতেই পারে না। যেন গোয়েন্দাদের মতো তাদের বেড়াজাল পাতা। আর খবর পেলেই প্রাণকেষ্ট জানবে। এই জঘন্য লোভী মানুষটার ওপর একরকমের মায়াও জন্মে গেছে সকলের।

শহরের পুব দিকে নদী, দক্ষিণ দিকে নতুন-আসা উদ্বাস্তু সমাজ। প্রাণকেষ্ট ওদিকে যায় না। তার যত জোর আর জুলুম সাবেক পাড়াগুলোতে। তারা তো তাকে ফেলতে পারবে না। নাহয় বকবে, গাল দেবে, ব্যঙ্গ করবে। তা করুক। খাবার তো জুটবে। ওসব নাকি পেটে খেলে পিঠে সয়। সমাজে এমন এক-একটা উঞ্ছজীবী লোক বোধ হয় চিরকালই থাকে। সে কিছুতেই খেটে খাবে না। হালুই-করর। তাকে বলেছিল পেটেল হতে। প্রাণকেষ্ট শুনে বলে, 'ওরে বাপ, সে বড় ফৈজতের কাজ। শুধু দুটো খাবার জন্যে অত খাটনি?' এককালে কিছুদিন নাকি সে ছিল পতিতাপল্লীর হুকুমবরদার। ফুর্তির বাবুদের পানটা, মদটা, চাটটা এনে দিতো। তলানি পেতো তারই। একদিন পুলিস ধরে পেটালো। ব্যস, চম্পট। 'বড় ফৈজৎ ও-পাড়ায়।' তবে চলে আসবার আগে একটা কাজের কাজ করেছিলো প্রাণকেষ্ট। জানকীকে ফুসলে এনে নিজের ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলো। এইটাই তার জীবনের চরম বুদ্ধির কাজ। মুখ ঝামটাই দিক আর অবরে-সবরে গায়ে হাতই তুলুক জানকী তাকে খাওয়ায়।

তো আসল কথায় আসা যাক। প্রাণকেষ্ট তার দোস্তদের কাছ থেকে আগাম যেমনই জানতে পারে কোনো ভোজকাজের খবর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে প্রস্তুতিপর্ব। পোশাকী ধুতি আর টেরিকটনের শার্টখানা কেচে নেয়। তাতে লাগায় অ্যারারুটের

মাড়। লোহার ইস্ত্রিটা ঘাসের মাঠে ঘষে ঘষে প্লেন করে, তারপরে বউয়ের মুখ-ঝামটা কানে-না নিয়ে তার রান্নার উনুনে সেটা তাতিয়ে ইস্ত্রি সারে। বউয়ের সঙ্গে ন্যাকামি ক'রে, তোয়াজ ক'রে, জোগাড় করে একটা সিকি। ইটালিয়ান সেলুনে বসে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে একেবারে যাকে বলে ভদ্দরলোকের বাচ্চা। সন্ধের মুখে বীরদর্পে সে ঘোষণা রেখে যায়, 'আমার জন্যে যেন রেঁধুনি, আমি আজ রেতে খাবু নি। আজ মজা বেধে গেছে। আজ আমার নেমন্তন্ন।'

জানকী তেড়ে গাল দেয়, আবার মিটমিট করে হাসে।

এর পরে প্রাণকেষ্ট কী করে তা একদিন বিষণ্ণ মুখে বুঝিয়েছিল, 'ভাববেন না খুব সহজ কাজ। নেমন্তন্ন-করা লোকদের সঙ্গে চট করে মিশে যেতে হয় প্রথমেই। গম্ভীর মুখে বসে থাকতে হয় খানিক। একটু-আধটু আলাপ-সালাপ করতেই হয় কলিকালের গতিক কিংবা জিনিসপত্রের দরদাম নিয়ে। এখনকার ছোঁড়াছুঁড়িদের পোশাকপত্তরের ব্যাপারটাও জমে ভালো। তার পর যখন পাতা ক'রে ডাক দেয় 'আপনারা সব আসুন' তখন সুড়ুৎ করে পার্টির পেছন পেছন গিয়ে বসে পড়তে হয়। তার পরে লুচি ভেঙে ডাল মাখিয়ে মুখে পুরলে আর ঝঞ্ঝাট নেই। বুঝতে হবে এবারে মজা বেধে গিয়েছে, বুঝলেন?'

: তোমাকে তো অনেকেই চেনে, ধরে ফেলে না?

: বিলক্ষণ। তবে অনেক সময় খেয়াল করে না। আর ধরলেই বা করবেটা কি? আত্মীয় বন্ধু মানী কুটুম সাক্ষেতের সামনে গালমন্দ ক'রে তো তাড়িয়ে দিতে পারে না। বড়জোর বলে, 'প্রাণকৃষ্ণ তুমি একটু অপেক্ষা করে, পরে বোসো।' আমিও বলি 'বিলক্ষণ'। খাবার ব্যবস্থাটা তো পাকা হয়ে গেল, না কি বলেন?

: খুব অপমান লাগে না তখন?

: সয়ে গেছে। ঐ যে আপনাকে বলেছি পেটে খেলে পিঠে সয়।

: সত্যি সত্যি মার খেয়েছো নাকি কোনোদিন?

: খেয়েছি বৈকি, তবে তার পর পেটেও খেয়ে তবে ছেড়েছি। এমনকি মাগীর মানে ইস্তিরির তরে ছাঁদা বেঁধেও এনেছি।

: কী ঘটেছিল ব্যাপারটা?

: সেবারে ঘটকপাড়ায় এক শ্রাদ্ধবাড়িতে খুব মেরেছিল। তখন মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম রাস্তায়। মুখের ভাবখানা এমন করলাম যেন কতদিন খাই নি। শেষ পরে দয়া হলো যে মেরেছিল তারই। বললে, 'চলো, খাবে চলো। এত লোক খাচ্ছে আর তুমি চোখের জল ফেলবে? যে মরেছে তার আত্মার শান্তি

হবে না। চলো।' বিশ্বাস করবেন না, এত খেতে দিলে যে শেষ করতে পারলাম না। ছাঁদা বাঁধলাম দইয়ের খালি হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে। তবেই বুঝুন।

দাঁত বার করে প্রাণকেষ্ট হাসতে লাগলো। অবাক ব্যাপার। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই। চামড়া মোটা। বেপরোয়া।

আমি বললাম, 'ভোজকাজ তো রোজ থাকে না। সারাদিন তোমার কাটে কি করে ?'

ম্লান হেসে প্রাণকেষ্ট বলে, 'শুনেছেন তো আমি জাত-আল্‌সে। ভোরবেলা আমার বউ ঠিকে-কাজে যাবার আগে চা খাইয়ে যায়, অবিশ্যি খিস্তিও দেয়। আমি তার পরেও ঘণ্টা-খানেক মটকা মেরে পড়ে থাকি। অত তাড়াতাড়ি উঠে কি করবো ? দিনমানখানা কত বড় ভাবুন তো ? কাটাতে হবে তো ? যাই হোক এমনই করে বেলা দশটা বাজিয়ে ফেলি। তার পরে দুটো পান্তা মেরে বেরিয়ে পড়ি কাজে।'

: কাজে ?

: কাজে মানে খোঁজে। আমার ঠেকগুলো তো আপনাকে বলেছি। ডেকরেটর, দশকর্মা, হালুইকর এই সব। খবর জুটে যায় একটা না একটা। আজ নয় তো সাত দিন পরে। ব্যস, বুঝতে পারি মজা বেধে গিয়েছে। বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরে বউয়ের কাছে প্রথমে খানিকটা খিস্তি খাই। তার পরে গরম গরম দুটো ভাত জোটে। মাইরি বলছি এই আগুন ছুঁয়ে।

আগুন মানে এক্ষেত্রে প্রজ্বলন্ত বিড়ি। প্রাণকেষ্ট সর্বদাই বিড়িমধ্যস্থ অগ্নিদেবকে সাক্ষী মানে। শুনে আমি হেসে বলি, 'এই যে বউ বউ করছ, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে ?'

: কী যে বলেন ! এই বিড়ি হাতে একেবারে অগ্নি সাক্ষী ক'রে বিয়ে। বুঝলেন তো ?

: খুব বুঝেছি। তা তোমার দোস্তরা যে তোমাকে আগাম খবর দেয় এতে তাদের কি লাভ ? তুমি তাদের কি দাও ?

: আজ্ঞে ওদের বেগার খাটি। পান, বিড়ি, চা আনি। অবসরে রসের গল্প বলি। খিস্তির গান শোনাই। মন ভেজাতে হয়। মিনি মাগ্‌নায় কি কোনো কাজ হয় সংসারে ?

: লজ্জা করে না তোমার ? ঘেন্না ? নিজের ওপর ?

: তা হলে তো কার্যোদ্ধার হবে না আজ্ঞে। আমি যে ভালোমন্দ খেতে, খুব ভালোবাসি কিন্তু খ্যামতা নেই। ওসব লজ্জা অপমান আমি বুঝি না।

আমার মনে পড়লো সুবাসীর ঝাঁটার বাড়ি আর মঙ্গলের বাঁকের ঘা কোনোদিন সিধে করতে পারে নি প্রাণকেষ্টকে। সে মাটিতে মাথা গুঁজে মার খেতো। তবু ইস্কুল যেতো না।

আশ্চর্য যে প্রাণকেষ্টর মতো এমন একটা নির্লজ্জ বাউণ্ডুলে মানুষকে আমি খুব একটা অপছন্দ করতে পারি নি কোনোদিন। হতাশ হয়েছি কিন্তু নিবৃত্ত করি নি। বরং উলটে খানিকটা প্রশ্রয়ই বুঝি বছর বছর দিই ক্যালেণ্ডার জোগাড় করে। আবার ভাবি ইচ্ছে করলে সে তো অন্য কারুর কাছ থেকেও ক্যালেণ্ডার পেতে পারে, কিন্তু বেছে বেছে আমার কাছেই কেন নেয়? তবে সে কি তার জীবনযাপন সম্পর্কে সকলকেই জড়িয়ে রাখতে চায়? সে বোধ হয় ছকে রেখেছে যে, যেখানে আমার নেমন্তন্ন থাকবে সেখানে অন্তত সে বেইজ্জৎ হবে না। তার বুদ্ধির আমি তল পাই না।

তার বুদ্ধিকে কিন্তু টেক্কা দিতে এসে যায় আরেকজন নির্লজ্জ। তার নাম সহদেব। এ লোকটা উদ্বাস্তু অর্থাৎ শহরের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে আমদানি। সহদেব এবারে ভাগ বসায় প্রাণকেষ্টর একচেটে কারবারে। প্রথম প্রথম সে প্রাণকেষ্টর পিছু পিছু কিংবা পাশাপাশি নেমন্তন্ন-বাড়ি ঢুকতে থাকে। প্রাণকেষ্ট সেখানে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু বাইরে তম্বি করে, শাসায়। তার পতিতাপল্লীঘটিত একটা উজ্জ্বল অতীতের কথা জানায়। সহদেব দাঁত বার করে হাসে। সে আরও দু কান কাটা। তার ওপর সে আবার গরঠিকানা ভেসে-আসা মানুষ।

অবশেষে তাই সন্ধি। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মতো প্রাণকেষ্ট আর সহদেব সমঝোতা করলো দুজন দুজনকে খবর দেবে নিজের নিজের এলাকার এবং অভিযান হবে সর্বদাই যৌথ। এই মৈত্রীচুক্তিতে প্রাণকেষ্টই লাভবান হবে—সে হিসেব করে দেখলে। কেননা এখন থেকে গঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলেও তার ভোজের এলাকা প্রসারিত হবে। ভোজকাজের এই যৌথ খবরদারি ফলপ্রসূ হলো। কেননা সহদেব খবর দেয় প্রাণকেষ্টকে, প্রাণকেষ্ট সহদেবকে।

এসব জানতে পারি পাড়ার চায়ের দোকানের ঠেকে। অবশ্য চোখেও দেখা যেতে লাগলো আমাদের এই জনপদের ভোজেকাজে এই হা-ঘরে যুগল মূর্তির অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতি। সেই অ্যারারুটের মাড়-খসখসে পোশাক, সেই আপাত-কুণ্ঠিত পদক্ষেপ এবং চুপিসাড়ে একদল নিমন্ত্রিতের সঙ্গে তাদের অনিবার্য ও সুনিশ্চিত

অনুপ্রবেশ। তার পরে খাওয়ার শেষে এক সর্বজয়ী সাফল্যের হাসি আর প্রসন্নতার তীব্র উদ্‌গার ধ্বনি। পরদিন থেকে আবার গোয়েন্দা নিপুণতায় তাদের আঞ্চলিক ও চিহ্নিত ঘাঁটিগুলোয় ঘাই মারা এবং প্রাণকেষ্টর মুচকি হাসি যার অনুবাদ হ'লো 'মজা বেধে গেছে'।

এই ভাবেই তো চলছিল। ছন্দপতন হলো হঠাৎ। সেদিন বাড়ি ফেরার পথে চায়ের দোকানের সামনের চত্বরে প্রায়ান্ধকারে মনে হলো যেন দুই ষাঁড়ের লড়াই হচ্ছে। কথাবার্তা নেই কেবল ফোঁসফোঁসানি। সেই দুই হা-ঘরের নিঃশব্দ সংগ্রামে দর্শকরা একেবারে চুপচাপ। ভাবটা যেন লড়ুক ব্যাটারা, লড়ে মরুক। কিন্তু তা তো হ'তে দিতে পারা যায় না। কাজেই দুজনকে অতি কষ্টে বিচ্ছিন্ন করি। তখনও সহদেব ফুঁসছে, 'শালা হারামি, ভেবেচিস্ আমি জানবার পারব না? তরে আইজ খ্যাস্ করুম্। খুব লালচ্ তর। জন্মের শোধ খাওয়ামু তরে।'

মনুষ্যেতর মানুষের অস্তিত্বের লড়াই কি এমন নাছোড়? আমার চোখের সামনে যেন দুটো মানবসন্তান নয়, লড়ে যাচ্ছে অক্ষম দুই যুযুধান লোভ। রিক্ত আশাহত নির্লজ্জ বিবশ নগ্ন দুই প্রতারক সত্তা দুজনের চোখের দিকে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে চেয়ে রইলো। জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি?

ক্ষোভে ক্রোধে সহদেব বলে, 'ঐ শালা হারামির বাচ্চা কাইল রাইতে এগ্‌লা গিয়া সিংহী বাড়ি ভোজ মারিছে। কেন হারামজাদা আমারে বলে নাই জিগান শুয়ারডারে। ক বেজন্মা ক বাবুকে তর মতলবডা কি।'

ধূর্ত প্রাণকেষ্ট বোবা সেজে রইলো। অস্বস্তিকর নীরবতা।

এর সদুত্তর প্রাণকেষ্ট কি ক'রে দেবে? অসত্য পরিবেশে তার জন্ম, শঠতা তার রক্তে। তার জীবনসঙ্গিনী এক পতিতা। তার সর্বদা-সঙ্গী হলো সেই প্রতারক ইচ্ছা যা অন্যকে ধোঁকা দিয়ে আকণ্ঠ ভালোমন্দ খেতে চায়। অথচ যে কোনো-রকম শিষ্ট পথে চলবে না, ক্ষরণ করবে না শ্রমজনিত একবিন্দুও স্বেদ। তার বলবার কি থাকতে পারে? চারপাশের খেটে-খাওয়া মানুষগুলোও তো সত্যিই ভালোবাসে না এই নিষ্কর্মা ধান্দাবাজদের। তাই তারা চুপচাপ যে যার পথ দেখে। সংঘর্ষ থামিয়ে দুজনেই নিশ্চেষ্ট থাকে খানিক। তার মানে প্রাণকেষ্টর মাথায় নতুন কোনো ফন্দি আসছে না, সহদেবও ভাবছে এতখানি বিক্রম না দেখানোই ভালো ছিল বুঝি।

'তোমরা দুজনে আমার একটা কথা শুনবে?'—এই বলে তাদের দুজনকে এই প্রথম আহ্বান করে নিয়ে গেলাম আমার বসবার ঘরে।

সত্যিই কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে জড়োসড়ো হয়ে তারা বসলো বড় সোফার দুধারে। মাথা নিচু করে বসে থাকলো আমার ভয়ংকর ভৎর্সনার আশঙ্কায়। আমি বললাম, 'তোমরা আজ যে যার বাড়ি যাও। কাল রবিবার। দুপুরবেলায় আমাদের এখানে তোমরা দুজনে পেট পুরে মাংস ভাত খাবে কেমন? হ্যাঁ, তোমাদের নেমন্তন্ন রইলো।'

অবিশ্বাসী কিন্তু চকচকে চোখে চাইলো সহদেব। প্রাণকেষ্ট ককিয়ে উঠে বললো 'নেমন্তন্ন? আমাকে কেউ কোনোদিন নেমন্তন্ন করে নি।'

তার লুকানো মুখের আড়ালে চোখ ঢাকা পড়ে গেল। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সে কাঁদলো।

* * * *

প্রতিদিনের এই যে আমাদের ঘরবন্দী জীবন তা আমাদের কাছে আর কতটুকু সংবাদ এনে দিতে পারে? কর্মস্থলের কিছু হালকা ঠাট্টা ইয়ার্কি মন্তব্য, প্রতিবেশী-দের নিস্পৃহ জীবনের কিছু ছিটেফোঁটা বা বড়জোর ছেলেমেয়েদের বয়ে-আনা ইস্কুল-কলেজের খবর। এর সঙ্গে রসান দিতে মাঝে মাঝে জোটে অন্দরমহল পরিবেশিত নানা পরিবারের কাণ্ডকারখানা কিংবা হঠাৎ-ঘটে-যাওয়া কোনো আত্মহত্যা রহস্য বা মেয়ে-পালানো বিয়ের রোমাঞ্চ। ব্যস। এর বাইরে আমাদের জীবন চলে স্রেফ খবরের কাগজের বস্তুগত সংবাদে বা দূরদর্শনের ভেট থেকে। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় আজকাল অবশ্য বেরোয় সংবাদের ভেতরকার সংবাদ, কিন্তু তা মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৈরি কিংবা অর্থকেলেংকারি-ঘটিত। সজীব মানুষের সংবাদ পাওয়া কঠিন। প্রতিদিনকার সংগ্রাম আর স্বপ্ন, গ্লানি আর আর ক্রোধে জড়ানো সেই জীবন। জীবন যার অভ্যস্ত গতানুগতিকতায় মুখে এঁটে দেয় নি কোনো মুখোস, বাক্যে আনে নি বানানো সৌন্দর্যের ফুলকারি। প্রতিদিনের গতিশীল জীবন সজীব মানুষের মনকে রাখে সরস, ঘটনা সম্পর্কে রাখে সতর্ক ও সাহসী, লড়তে শেখায়, অনুভূতিশীল করে।

অনেকে ভাবেন নিত্যযাত্রীদের জীবন বুঝি খুব স্বাদু আর বিচিত্র। ঠিকই যে তাঁদের কেবলই মুখোমুখি হ'তে হয় নানা অপূর্বকল্পিত ঘটনার, সময়ের সঙ্গে নিজের একটা আততি থেকে যায়, তবু তাঁরা ছেঁকে নিতে পারেন কম। প্রতিদিনের এক-মুখী গতিপথ, একই সময়, একই সঙ্গ, এমন-কি কামরার একই স্বনির্দিষ্ট স্থান এক ধরনের মনের অসারতা আনতে বাধ্য। তাই পরস্পরের ব্যক্তিগত কুশল বিনিময়ের পর অনেক সময় আর কথা বাকি থাকে না। বড়জোর একজন জিগ্যেস করেন, 'কাল

আপনার 37 ডাউন কখন ইন করলো ?' উত্তর, 'সাড়ে দশটা'। তার মানে পনেরো মিনিট লেট দু পক্ষই বুঝলেন কিন্তু তা আর ব্যক্ত হলো না। অথবা 'আজ কীসে ফিরছেন ?' '30 আপ', 'ও, আচ্ছা, তা হলে দেখা হবে, জায়গা রাখবেন'।

এমনও দেখেছি যে, দীর্ঘদিন একসঙ্গে যাতায়াত ক'রেও অনেকে অনেকের নাম জানেন না। রায়দা কিংবা সান্যাল, চ্যাটার্জি অথবা ঘোষ এইভাবেই চলছে। ট্রেনে কালহরণের তাই দুটি জনপ্রিয় উপাদান হলো ঘুমোনো কিংবা তাস খেলা। এর কিছু ব্যতিক্রম আছে যুবক নিত্যযাত্রীদের মধ্যে। তারা চেঁচায়, গান করে. লোকের পেছনে লাগে, নানা অছিলায় গোলমাল পাকায়, হালকা ধরনের হাতাহাতিও হয় এবং অচিরে মিউচুয়াল। দু-একটা পল্‌কা আশনাই চলে, চলে শাসকদলের পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে ঝগড়া। সাম্বৎসরিক বনভোজন এমনকি ট্রেনের কামরায় 'রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী'-ও বিরল নয়। অবশ্য এসব ব্যতিক্রম।

আমি এক সময়ে যখন বছর সাতেক নিত্যযাত্রী ছিলাম তখন এসব লক্ষ করেছি। অবশ্য আমাকে ঠিক নিত্যযাত্রী বলা যাবে না, কেননা, সপ্তাহে চার দিন যেতাম। তা ছাড়াও বাদ যেতো গ্রীষ্ম আর পূজাবকাশের লম্বা কদিন। তাই নিত্য যাত্রার প্রহার আমার মধ্যে তেমন চেপে বসে নি। কিন্তু এখন বুঝি, বেশ কিছু অভ্যাস আর সংস্কার আমার মধ্যে এসে যাচ্ছিলো। যেমন আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকের মাইল দেড়েক দূর দিয়ে যে-নদী আর ব্রিজ তার ওপর দিয়ে যখন রাত্রের এক্সপ্রেস ট্রেন যায় তখন কখনও কখনও তার গমগম আওয়াজ ছোটবেলা থেকেই কানে আসে কিন্তু চেতনা সব সময়ে তা নিয়ে খেলা করে না। সাত বছরের ট্রেনযাত্রা ঐ প্রতিদিনের আওয়াজে একটা নতুন চিন্তা যোগ করে। এখন মনে না এসেই পারে না যে আজ ট্রেনটা রাইট টাইম না লেট। সত্যিই এ-চিন্তায় কিছু আসে যায় না। আমি ঐ ট্রেনে ব'সে নেই, নেই কোনো গন্তব্য, তবু চিন্তাটা আসে। হলফ করে বলতে পারি, জীবনের কোনো পর্যায়ে যে কোনোরকম নিত্য যাত্রী হয় নি তার মনে এমন চিন্তা আসতে পারে না।

কিংবা এমনও মনে হয় ট্রেন সম্পর্কে এই যে এক আলাদা চেতনা, কোমলতা, তার পেছনে হয়ত রয়ে গেছে কতকগুলি মানুষের মুখের আদল, তাদের সজীব স্মৃতি। রাত নটার এই আপ ট্রেনেই তো ঝিমোচ্ছেন বঙ্কুবাবু, যিনি বাড়ি ফিরে জড়বুদ্ধি ছেলেটিকে আদর করে ভাত খাওয়ালে তবে সে খাবে। অন্তত তার জন্যেই তো ট্রেনটার লেট করা চলে না। আবার মজার কথাও আছে বৈকি। আমাদের কামরার বদ্যিনাথের সঙ্গে তার স্ত্রীর শর্ত এই যে ঠিক সময়ে বাড়ি ঢুকলে সে-ই

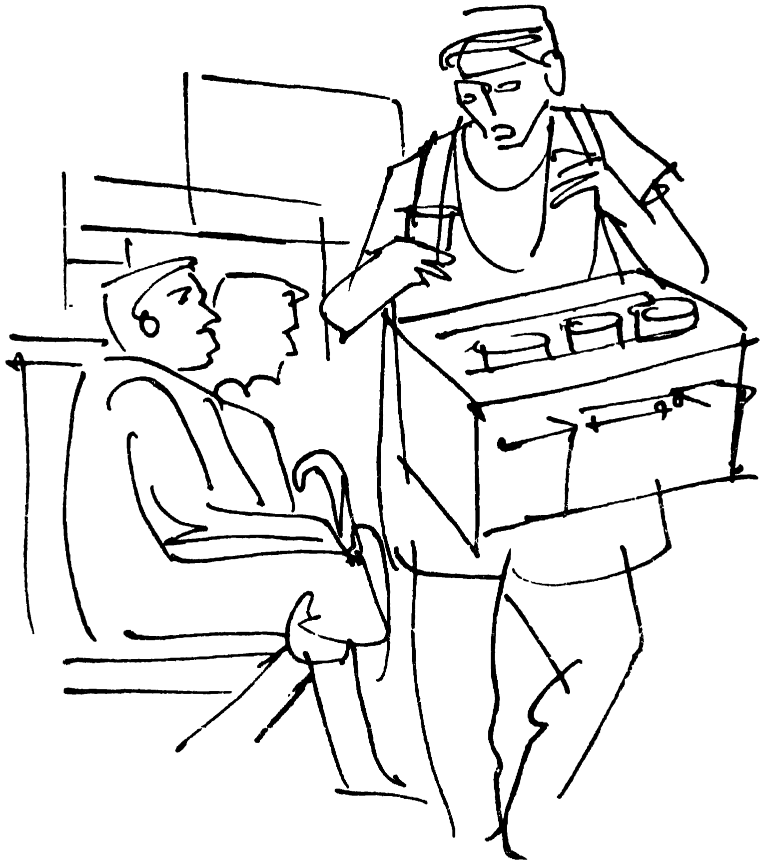
মশারি টাঙাবে, আর লেট হ'লে বদ্যিনাথকে টাঙাতে হবে। মাঝপথে ট্রেন দাঁড়ালে বদ্যিনাথকে কত দিন বলতে শুনেছি, 'ইস্ এত দাঁড়াচ্ছে আজকে? আজ সিওর মশারি টাঙাতে হবে।' এসব আর্দ্র কিংবা সরস ঘটনার পাশে একটা ব্যবহারিক দিকও আছে। যাঁরা সকালে বেরিয়েছেন তাঁরা যত সময়মতো ফেরেন ততই ভালো, কেননা তাঁদের তো পরদিন সকালে সময়মতোই যেতে হবে আবার। এমনতর বাড়তি সব চেতনা আমার সাত বছরে ট্রেন ভ্রমণের নিট লাভ। একদিক থেকে হয়ত এও একরকম প্রসারণ। ঘরবন্দী জীবনের আত্মসুখ, বইমুখো দৈনন্দিনের অচল বৃত্ত, পুরনো মুখের চোখ-পচে-যাওয়া দৃশ্য আর চেনা পরিবেশের ছক তো ভাঙতেই হবে সজীব মানুষকে।

আমার কাছে ট্রেন তাই আর নিছক পরিবহণ নয়। বাড়তি আরো অনেক কিছু। অনেক মানবিক বিবেচনা, অনেক শোচনীয়তা, অনেক প্রত্যাশা ও ব্যর্থতার দ্যোতক। এখনো তাই রাত নটা নাগাদ ব্রিজের ওপরে এক্সপ্রেসের আওয়াজ কখনো কখনো মনে আনে বিবেক সাধুখাঁ, নারায়ণ বসাক কিংবা বংশী দত্তর তপ্ত তেজালো মুখের রেখা।

বিবেক, নারায়ণ আর বংশী আসলে তিনজন হকার। তবে তারা ফেরি করতো তিনটে আলাদা জিনিস। তিনজনেরই বাড়ি বেলডাঙা স্টেশন থেকে হাঁটাপথে দু মাইল দূরের বেনাড্ডা গ্রামে। সকাল সাতটার ডাউন এক্সপ্রেসে এদের জীবিকার শুরু, ফিরতে সেই রাতের আপ ট্রেন। তার মানে রাত দশটা। এখন আমার জানা হয়ে গেছে, রাতের আপ ট্রেন বেলডাঙা ছাড়িয়ে গেলেই মাঠপ্রান্তের রেল-লাইনে তার ঝমঝম ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় কাছের বেনাড্ডা গ্রামে। এই প্রতিধ্বনি শোনবার জন্য গ্রামের তিনটে কুঁড়েঘরে জেগে বসে থাকে তিন বয়সের তিনজন নারী। বিবেকের মা, নারায়ণের বউ সত্যভামা আর বংশীর বিধবা বোন চাঁপা। এবারে তারা দাওয়ায় উঠে বসে লম্ফ জ্বালে। উনুনে শুকনো পাতা জ্বেলে খাবার গরম করে। ক্ষুধার্ত মানুষগুলো দিনান্তে দু মুঠো খাবে।

এদের মধ্যে নারায়ণ চল্লিশ পেরিয়েছে, বাকি দুজন বেকার যুবককে সে-ই নামিয়েছে এই হকারির লাইনে। নারায়ণের অভিজ্ঞতা বিশ বছরের। আমি আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন নিয়মিত যাতায়াত করতাম তখনই এদের সঙ্গে আলাপ হয়। সজীব মানবিক কৌতূহলে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারি। কিন্তু প্রথমে চমকে দিয়েছিলো বংশী তার বাক্য-ব্যবহারে। বস্তুত তার সঙ্গেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে।

সেদিন ছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা। ফেরার এক্সপ্রেস গাড়ি তাই ছিল ভিড়ে নীরন্ধ্র। তার মধ্যে পথ করে এগোচ্ছিলো বংশী তার মুড়ি-মসলার সরঞ্জাম নিয়ে। মাঝখানে এক ক্যানেস্তারা টিনে থাকে মুড়ি, তার চারপাশে গোল করে সাজানো ছোট কৌটোয় থাকে পেঁয়াজ-আদা-নারকোল লঙ্কার কুচি, ভাজা বাদাম আর ছোলাসেদ্ধ। একটা বোতলে থাকে সরষের তেল। বংশী সেই



লটবহর নিয়ে এগোচ্ছে আর বুকনি ঝাড়ছে, 'মাননীয়গণ এবারে এসে গেছে সেই বিখ্যাত বংশীর মুড়ি মসলা। নিজে খান অন্যকে খাওয়ান। দেখি দাদা একটু খেতে দিন। হ্যাঁ, এদিকে আর কে চাইলেন?'

'আজকে থাক বংশী। মাসের শেষ। আজ আর খাব না' বললেন কেউ।

বংশী বললে, 'তাতে কি ? ঠাকুর বলেছেন ছোটখাটো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতে নেই। খাবেন তো আট আনার মুড়িমসলা। মাইনে পেয়ে দাম দেবেন।'

খটাখট মুড়িমসলা তৈরির চামচের আওয়াজ শুনছি ভিড়ের মধ্যে। কেউই দৃশ্যমান নয়। হঠাৎ একজন বললে, 'উনি নাহয় মাসকাবারে মাইনে পেয়ে দাম দেবেন, কিন্তু আমি করবো কি ?'

: কেন ? আপনার কি কেস ?

: আমি বেকার।

: তাতে কি ? যখন বেকার-ভাতা পাবেন তখন দেবেন। হাসির কলরোলের মধ্যে একজন বললেন, 'বংশী এই রেটে ধার দিলে টাইট হয়ে যাবে যে !'

বংশী হেসে বললে, 'কী যে বলেন দাদা, স্বয়ং ভগবানই আমাকে টাইট দিতে পারে নি তো পাবলিক। বাপ-মা মরেচে, ঘরে বিধবা বোন, তাতেই টাইট হই নি।'

এইভাবেই ভিড়ের মধ্যে বংশী এগোচ্ছে আর ধ্বনিত হচ্ছে তার বাক্যাবলী। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'দাদারা. ভাইরা, উঃ আর ঠেলবেন না ! এবারে আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে যে।'

সচকিতে চেয়ে দেখলাম সেই সপ্রতিভ উজ্জ্বল যুবাকে। তার সঙ্গে জমতে আমার সময় লাগে নি এর পর। কিন্তু সেসব কথা বলবার আগে বিবেক আর নারায়ণের কথা বলে নিতে হয়। বিবেক সম্পর্কে বলবার তেমন কিছু নেই। বিশেষত্বহীন সাদামাটা ছেলে, ট্রেনে সেদ্ধ ডিম বেচে। তবে নারায়ণ খুব বর্ণময় চরিত্র। যখন প্রথম আলাপ তখন লজেন্স বেচতো এক টাকায় দশখানা, মুখে মুখে ছড়া বানাতো :

দাদা দশ, দামে দশ, টাকায় দশ।

কিংবা,

খান নারাণের লজেন্স
যাদের আছে সেন্স।

নারাণের বউয়ের নাম সত্যভামা এও এক আশ্চর্য। তাই লজেন্সের ব্যবসায় যখন মন্দা দেখা দিল যখন শুরু হলো চানাচুর বিক্রি। উদ্ভাবন হলো নতুনতর ছড়া :

সত্যনারায়ণের চানাচুর
নুন ঝালে ভরপুর।

তার পরে চললো কথকতা—'সত্যনারাণের চানাচুর। এ-জিনিস সত্য ভাজে নারাণ ব্যাচে।'

একজন বলল, 'তা সেই সত্যভামা কই ?'

: সত্য ঘরেতে নারাণ গাড়িতে। খান কত খাবেন। দাম অতি সস্তা এক টাকায় এক বস্তা।

হালকা লঘুচালে এমনই চলে ট্রেনের জীবন, তাই ব'লে এত ফুরফুরে নয় সব-কিছু। তাপ আছে, ঘাম আছে, আছে ক্লান্তি আর নৈরাশ্য। এক কথাই বার বার বলা, একই রসিকতা হয়ত। কিন্তু হাতে হাতে নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তিটুকু চাই অর্থাৎ বিক্রি। তার জন্যে দরকার রসান, চাই নিত্যনতুন উদ্‌ভাবন। যেমন এক সন্ধ্যায় বংশী বলেছিলো, 'আজ মুড়িমসলা সহযোগে আন্তর্জাতিক মৃত্যুবর্ষের সব চেয়ে শোচনীয় খবর শুনুন—মহানায়ক উত্তমকুমার আর নেই।' একবার সহযাত্রী অনুকূলবাবুর মরণোন্মুখ বৃদ্ধা মা-র খবর নিতে গিয়ে বংশী বলেছিলো, 'দিদিমাকে সব ডাক্তার সব ওষুধ দিয়েও আর বাঁচানো যাবে না। এবারে গঙ্গামাইসিন দিতে হবে।'

: গঙ্গামাইসিন আবার কি ?

'বিশুদ্ধ গঙ্গাজল', বংশী বলেছিলো, 'টেরিমাইসিন, ফ্লুরোসিন এ সব কিছুর চেয়ে পাওয়ারফুল গঙ্গামাইসিন। সোজা স্বর্গ।'

গত ক'বছরে আমার উত্তরবঙ্গে বদলি হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে যা হারিয়েছিলাম তা এই বংশীদের সঙ্গ। ডিসেম্বরে বড়দিনের বন্ধে ক'দিনের ছুটিতে বাড়ি আসছি। রেলের কামরায় সেই উত্তাপ যেন আর নেই। আসলে এই কামরায় নিত্যযাত্রীরাও তো আমার চেনা নয়। বসে আছি ডাঙায় তোলা করুণ মাছের মতো। খুব ভিড়। হঠাৎ সামনে একখানা ভিক্ষার হাত প্রসারিত হ'লো। পয়সা দিতে গিয়ে চোখ পড়লো ভিক্ষুকের মুখে। বংশী না ?

ঠিকই তাই—তবে একখানা পা কাটা, বগলে ক্রাচ। মুখে ম্লান বেদনার ছায়া। মনে পড়ে গেল তার উক্তি, 'ভগবানই আমাকে টাইট দিতে পারে নি।' বংশীর হাত ধ'রে জিগ্যেস করলাম, 'চিনতে পারছো ? এ কি হাল তোমার ?'

: সবই কপাল দাদা, পা কাটা গেছে।

: কী করে পা কাটা পড়লো ?

: মুড়োগাছা স্টেশনের পরে চলন্ত ট্রেনে যেমন রোজই এক কামরা থেকে

আরেক কামরা ঝুলতে ঝুলতে যাই তেমনই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মুড়ির টিনটা কোথায় যেন বেধে গিয়ে পড়ে গেলাম লাইনে। আর কিছু জানি না।

: তার পর ?

: তার পর জ্ঞান হতে দেখি হাসপাতালে। বাঁ পা কাটতে হয়েছে।

: কতদিন হ'লো এই ঘটনা ?

: তা আট মাস হ'লো।

কোনো বাক্যস্ফূর্তি হ'লো না। ভাবলাম একে কী সহানুভূতি জানাবো ? কোন্ ভাষায় ? ভগবান কি এমনই ক'রে টাইট দেন ? এমনই ক'রে কি স্বতঃস্ফূর্ত সরস জীবনধারার প্রবাহ যায় শুকিয়ে ?



আমার হাতে টপ ক'রে পড়লো বংশীর চোখের জল। এমন তো কথা ছিল না। বরাবর বংশীর রসিকতায় আমার চোখের জল পড়তো আনন্দে। আমি বিমূঢ় হয়ে

তার সজল চোখে চোখ রাখলাম ; তার করতলে অনেকে এগিয়ে দিলো খুচরো পয়সা। সে তো এই সত্যশোনা কাহিনীর অভিঘাতে। সবাই কি এত দেবে রোজই?

বংশী চোখ মুছে বললো, 'সকলের কাছে হাত পেতে কোনো রকমে এখন আমার দিন চলে দাদা। এ কী হলো আমার?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'তবু আস্তে আস্তে তোমাকে মেনে নিতে হবে এই অভিশাপ, মানিয়ে নিতে হবে। যেমন করে কাঠের ক্রাচটা মানিয়ে নিয়েছ।'

: বুঝি সবই। তবে চাঁপা বড় কাঁদে।

: মনে আছে বংশী কত রসিকতা করতে? কত রং তামাশা, কত আনন্দ দিয়েছ কতজনকে?

: মনে পড়ে বৈকি দাদা। তবে এই জীবনের শেষ রসিকতা আমি করেছি চাঁপার কাছে।

: কী বলেছিলে? কবে?

: যেদিন আমাকে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দিলো। ট্রেন থেকে নামিয়ে নারাণদা আর বিবেক ভ্যান গাড়ি ক'রে আমাকে বাড়ি আনলো। চাঁপা আছড়ে পড়ে কেঁদে বললো, 'দাদা এ কী হলো তোমার? পা-খান্ কোথায় রেখে এলে?' আমি বলেছিলাম, 'কাঁদিস্ নে, চাঁপা কাঁদিস্ নে, রেলকে আমার পা-খান্ দিয়ে এলাম। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধীবর্ষের উপহার।'

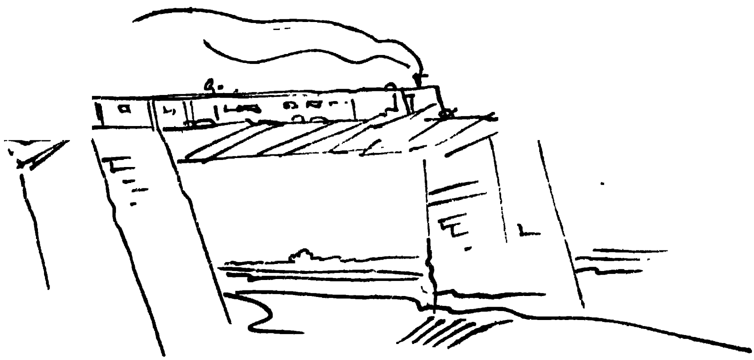
দ্রুতবেগে ট্রেন ছোটে, খুট খুট করে এগোয় বংশীর ক্রাচ।

*　　　*　　　*

সেই সাত বছরের রেলপথে যাতায়াতের সময় ছিল একটা রুপোলি রেখার নদী আর ব্রিজ। ব্রিজের ওপর দিয়ে যখন গমগম শব্দে ট্রেনটা ছুটতো তখন ঝিমন্ত নিত্যযাত্রীও এমনকি একবার চোখ মেলে দেখে নিতো স্রোতস্বিনী নদী, নদী পারের শ্যামলিমা। আমি তো আগে থেকেই তৈরি থাকতাম আরো কিছু দেখব বলে। দেখতাম : স্রোতের টানে দোল-খাওয়া ডিঙিনৌকার নাচ, আকাশের বিরাট নীলের মুকুরিত স্বরূপ নদীজলে। নিসর্গের টান বড় অপ্রতিরোধ্য। আরো দেখতাম গ্রীষ্মে নদীর গতর কমে, বর্ষায় বাড়ে, শরতে ফোটে কাশফুল দুপারে, শীতে মিহিন কুয়াশার চাদর থাকে জড়ানো। আবার সেবারে দেখেছিলাম, দারুণ বন্যায় নদী ফুলে ফেঁপে ঢেকে দিলো দুপাশের গ্রাম। জেগে থাকলো শুধু চালাঘরের মাথা আর বড় গাছের ওপরটুকু। তারপর জল সরে যেতে যখন ডাঙা জাগলো তখন নদীর দক্ষিণ চরে জমে-ওঠা পলিতে জোতজমির ওপর চললো

লাঙল। তার মানে এতদিনকার পতিত জমিতে এবার শস্য সম্ভাবনা। যে ভাঙে সেই গড়ে।

দেখতে দেখতে চৈতী ফসলে ভরে গেল মাঠ, আর সেই ফসলের পাহারাদারি করতে তৈরি হলো একটা কুঁড়েঘর। তাতে নিযুক্ত হলো একজন কালোকোলো কর্মঠ মানুষ। একটু-আধটু নিড়োয়, জমিতে কীটঘ্ন স্প্রে করে মানুষটা, আবার পাহারাও দেয়। ট্রেনে চেপে যখন যাই তখন দেখি হয় যুবকটি জমির কাজ করছে, নয়তো বসে আছে তার একান্তে ভিটের উঠোনে। বিহঙ্গচোখে দেখা : একপাশে বহতা নদী, চার পাশে প্রবর্ধমান ফসল আর মাঝখানে এক নিঃসঙ্গ মানুষ। একটু কি উদাস স্বভাবের নাকি নেহাতই গোঁয়ার-গোবিন্দ? ভাবনা হ'তো, কি করে লোকটা একা একা থাকে? ভয় করে না অমন খাঁ খাঁ নির্জনে? নদী পেরোলে তবে ওপারে একফালি জনপদ, ক'টা দোকান। এপারে তো সে একেবারে



একা। গ্রীষ্মের ভয়ংকর ঘামঝরানো কাঠদুপুরে কিংবা দিগন্ত-ভাসানো বাদলে লোকটার কেমন লাগে? অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে তো বটেই কিংবা যেদিন আকাশজুড়ে চাঁদ ওঠে মস্তবড়, সেই টালমাটালে এই মানুষটার বুকের মধ্যে বাষ্প জমে ওঠে না? ককিয়ে ওঠে না নিঃসঙ্গতা? কি জানি, খেটে-খাওয়া মানুষের হয়ত আমাদের মতো এমন সূক্ষ্ম মনের দায় নেই। সারাদিন ভূতখাটুনি খাটে। দুটো ফুটিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে। কিন্তু ঘুমোবেই বা কি ক'রে? রাত-পাহারা দিতে হবে যে। সেটাই তো তার কাজ। কে এই যুবক? নাম কি? বাড়ি কোথায়? আমার কল্পনাপ্রবণ মন এসব জানতে চায়। জানতে পারে না।

যতক্ষণ ট্রেনটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যায় হয়ত ততক্ষণই দেখি, বাকিটুকু ভাবি

শুধু অবসরে। মানুষটা আর তার আয়ত্তজমির প্রসারিত ক্যানভাস একটা প্রতিমার মতো চিত্ততলে জেগে থাকে। তার পর হঠাৎই একদিন বিস্মিত চোখ আবিষ্কার করে টিয়ারঙের শাড়ি-পরা এক ত্রস্তে-ছুটে-চলা অবগুণ্ঠিতাকে। মন তারিফ করে ওঠে, বাঃ বাঃ। যেন এতদিনে প্রতিমা তার পূর্ণতা পেলো। কিন্তু এত দূর থেকে অত নিচুতে যারা ঘুরছে ফিরছে কেমন করে বোঝা যাবে তাদের মুখের রেখা ? কেমন দেখতে বউটি ? যেমনই হোক, আহা সুখে থাক। লোকটার নিঃসঙ্গতা তো ঘুচুক।

কদিনেই চোখে পড়ে একটু শ্রীছাঁদের কল্যাণস্পর্শ। দাওয়াটা নিকোনো, উঠোনটা ঝাঁটানো। অবিন্যস্ত কুঁড়েঘর এবার প্রাণ পায়। এর মধ্যে লক্ষ্মীপুজো ছিল বুঝি, তাই একদিন দেখা গেল জ্যাবড়া আলপনার চিহ্ন। মাসখানেকের মধ্যে কুঁড়েঘরের চালে তরতর করে বেড়ে ওঠে লকলকে লাউয়ের চারা। কোথা থেকে জুটে যায় একটা দো-আঁশলা কুকুর।

এবার থেকে ঘন ঘনই ফাঁকি পড়ছে জমির কাজে। দেখা যায়, কর্মঠ যুবকটি গা এলিয়ে বেশ আলাপ জুড়েছে দাওয়ায় ব'সে। মুখে নিশ্চয়ই তৃপ্তির ছাপ ? ঘোমটার আড়ালে বউটির চোখে যে-বিদ্যুৎ খেলে যায় তা দেখবো কী ক'রে ? কিন্তু ক্বচিৎ কখনও হাসলে কালোমেয়ের সাদা দাঁতগুলো বেশ দেখা যেত। ভাবতাম, ওরা কি জানে একজন কত প্রত্যাশায় উঁচু থেকে ওদের প্রায়ই দেখে ? খোলা শস্যখেত, রহস্যময় নদী আর অবারিত বাতাসে তাদের অনাবিল মধুচন্দ্রিকার অন্তত একজন অকৃত্রিম শুভার্থী আছে যাকে তারা দেখেই নি কোনোদিন। ইচ্ছে করতো এককেদিন নেমে পড়ি নদী-পারের স্টেশনে। খেয়া পেরিয়ে যাই ওদের কাছে। একেবারে অবাক-হয়ে-যাওয়া নবদম্পতির কাছে দু-দণ্ড বসে আলাপ করি। ওদের কাছে চেয়ে নিই দুটো মুড়িগুড়।

এমন ইচ্ছার রূপ দেওয়া শক্ত তাই সবই হয় কিন্তু ঐটি আর হয়ে ওঠে না। দেখতে দেখতে বছর ঘোরে। জমির ফসল পাকে আবার নতুন লাঙল পড়ে। তারপর সেবার বড়দিনের পর যেদিন আবার কর্মস্থলে যাচ্ছি নতুন বছরে, অভ্যাস-বশে চোখ মেলে দেখি এ কী অবাক কাণ্ড! উঠোনের একপাশে যেমন হাসছে অগুনতি গাঁদা ফুল তেমনই দাওয়ায় শীতের মিঠে রোদে শোয়ানো রয়েছে এক-রত্তি গোলাপী শিশু। কী অভাবনীয় নববর্ষের উপহার! সদ্যোজাত শিশুকে আগলাচ্ছে সেই দো-আঁশলা কুকুর।

আর দেরি নয়। পরের দিনই নেমে পড়ি স্টেশনে। নদী পেরিয়ে বেশ খানিক

হেঁটে পেঁৗছে যাই খেতিজমির সীমানা বরাবর। আমি যত এগোই বিস্ময়ের ঘোর লাগা দুই যুবক-যুবতী ততই এগোতে থাকে আমার দিকে। কাছাকাছি আসতে প্রথমে চোখে পড়ে স্পষ্টত এক রুক্ষদর্শন মানুষকে, সারা গায়ে তার ঘাম আর মাটি। তার পেছনে ঘোমটাটানা বউটি বহুক্ষণ অপাঙ্গে আমাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ ঘোমটা ফেলে দিয়ে ছুটে এসে উদ্ভাসিত মুখে বলে, 'দাদা না?'

যেন বিস্মৃতির পানাপুকুরে পড়ে একটা ঢিল। জলের বৃত্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে। আমিও সোচ্ছ্বাসে বলে উঠি, 'তুই কি আমাদের সেই ছোট্ট ঝিনুক?'

হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে সবার মুখে। ঝিনুক তার রুক্ষদর্শন স্বামীকে হাত ধরে টেনে এনে আমার সামনে খাড়া করে বলে, 'পরনাম কর। এ হামার দাদা হচ্ছে।'

: মতলব?

: মতলব পরে বুঝবে। এখন পরনাম করো ভূত।

অপ্রতিভ এক শ্রমশীল বিগ্রহ আমাকে প্রণাম করে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর বলে, 'বৈঠিয়ে হুজুর।'

'বলো বসুন' ঝিনুক তার স্বামীকে বাংলা জবান শেখায়। আমাকে বলে, 'এই ভূত আমার জীবন ভাজা ভাজা করে দিলো। একদম বাংলা জানে না। বিহারীর মরণ!' স্বামীকে বললো, 'নাম বোলো তুমহার।'

: হেঁ হেঁ, হুজুর রামচরিত টিণ্ডেল। গরিব খেতি কিষাণ হচ্ছি। মকান আরা জিলা। বিহার।

আমি ঝিনুককে দেখি আর বলি, 'তুই সেই পুঁচকে ঝিনুক? সেই বাংগাল? তুই এত বড় হইছস্?'

ঝিনুক দাওয়া থেকে এক বিরাট ঘটি এনে হাসতে হাসতে বলে, 'দাদা, ঘটি নেবানে, ঘটি?' যেন সেই পনেরো ষোল বছর আগেকার বাতাস ফিরে আসে। জমিয়ে বসি তাদের দাওয়ায়। ট্রেন থেকে এতদিনের বৃত্তান্ত বলি। জানতে চাই ঝিনুকের মা-র খবর। রামচরিত ছোটে নদীপারের দোকান থেকে খাবার আনতে। আমি বারণ করি। ঝিনুক বলে, 'তাই কি হয়? কত ভাইগ্য আপনি আসছেন। কত খাইছি বৌদির কাছে। তারে আনলেন না ক্যান?'

যেন ফ্ল্যাশব্যাকের মতো আমার মনে পড়লো বছর পনেরো আগে আমাদের বাড়ি ঝিনুক কাজ করতে এসেছিল। তখন তার কাজ করার বয়স নয়। খুব জোর সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে, আমার ছোট মেয়ের সঙ্গে খেলতো বেশির ভাগ

আর হাতে হাতে সাহায্য করতো তার বৌদির নানা ফাটকি-নাটকি কাজে। একটা পারিবারিক বিপর্যয়েই তাকে কাজে লাগতে হয়েছিল। তার পূর্ব কথাটুকু এইরকম।

আমাদের শহরের পশ্চিম দিকে নদীর পারে ছিল এক জঙ্গল। হঠাৎ সেই জঙ্গল হাসিল করে একদল বাস্তুহারা সেখানে আশ্রয় নেয়। অনেকদিন পর্যন্ত জায়গাটাকে বলা হতো হঠাৎ কলোনি। সেইখানে আরো অনেকের সঙ্গে থাকতো ঝিনুকের বাবা-মা। ঝিনুকের জন্ম কলোনিতেই। তার বাবা ছিল জাতে জেলে। খ্যাপলা জালে মাছ ধ'রে বাজারে বেচতো, আর তার বউ বাঁধতো বিড়ি। এমনিতেই ভক্তিমান পরিবার। সপ্তাহে সপ্তাহে লক্ষ্মীপুজো, বারের পুজো, সত্য-নারাণের সিন্নি হতো। তার পর একদিন বিপর্যয় এলো সাত দিনের এপারে ওপারে।

সেবার বোশেখ মাসের গরমের রাতে ঝিনুক আর তার মা ঘুমোচ্ছিলো। একে গরম তায় মশারির মধ্যে মশা ঢুকেছিল। ঝিনুকের মা লম্ফ এনে মশা মেরে যেমনই লম্ফ বাইরে রাখতে বেরিয়েছে অমনই অসাবধানে তার আঁচলে আগুন লেগে যায়। ঝিনুক অকাতরে ঘুমোচ্ছে, তার বাবা গেছে মাছ ধরতে। বিশ্রি-ভাবে পুড়ে গেল মহিলা। প্রাথমিক চিকিৎসা করে হেলথ সেণ্টার থেকে ফিরে এসে শুয়ে রইলো। পেট বুক পোড়েনি তাই প্রাণে বাঁচলো কিন্তু চিরকালের মতো জুড়ে গেল ডান হাতের আঙুলগুলো, পুঁড়ে গেল গলা। এর পরের বিপদ এলো সাতদিনের মাথায়।

সে রাতে ঝিনুকের মা শুয়ে আছে আর ঝিনুকের বাবা শুয়েছে তার পাশে। রাতে দরকারে কখন কি লাগে সেই ভেবে। তা ছাড়া আগুনে-পোড়া মানুষটা তখনো নিজে হাতে কিছু করতে পারে না। ঝিনুককে নিয়ে রেখেছে তার প্রতিবেশীরা। সেই কালরাতে ঝিনুকের বাবার হাত অসাবধানে চলে গেল মশারির বাইরে। সেখানে লাগলো জাত সাপের ছোবল। জঙ্গুলে জমির মেঝে। বাস্তুহারা সাপের রাগ পড়লো গরিব মানুষটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ চিৎকার। ছুটে এল মানুষজন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় নি অসহায় ভাগ্যহত মানুষটাকে। মরণের খবর পেয়ে ঐ অসুস্থ অবস্থাতেই ঝিনুকের মা নদীর জলে আত্মঘাতী হতে যায়। পাড়াপড়শী তাকে বুঝিয়ে শান্ত করে। ঝিনুককে দেখিয়ে বলে, 'এ কোথায় যাবে। এর জন্যেই তোমাকে বাঁচতে হবে।' সেই পড়শীরাই আমাদের বাড়ি ঝিনুককে রেখে গেল।

সে কাজ সেরে দিনান্তে মা-র ভাত নিয়ে বাড়ি যেতো। বলতে গেলে আমাদের বাড়িতেই কেটেছে তার শৈশব। পরে তার যখন বছর দশ বারো বয়স তখন সম্পর্কিত এক কাকা তাদের নিয়ে যায় কাঁকিনাড়ায়। এইখানেই ঝিনুক-পর্বের ইতি। কিন্তু মনে আছে মেয়েটা ছিল হাসকুটে সরল। 'বাংগাল' ব'লে রাগালে একটা ঘটি এনে দেখাতো। বলতো, 'ও দাদা আমাগো বাড়ি অনেক ঘটি আছে, নেবানে?'

সেই স্মৃতির প্রান্তর কাঁপিয়ে পরিবেশ আবার শান্ত হ'তে আমি তাকিয়ে দেখি সহাস্য যুবতী ঝিনুক আর আড়ষ্ট রামচরিত। পেছনে কুঁড়েঘর আর এক চিলতে নদী। ঝিনুকের কাছ থেকে ক্রমে জানা যায় কাকাই ওর বিয়ে দিয়েছে। কাকার জুট মিলে রামচরিতের দাদা কাজ করে। সেখান থেকে যোগাযোগ। ফিসফিস ক'রে ঝিনুক বলে, 'কী কোরবো, মা কমন থেকে পণ পাবে? আমার কত বয়স হইছে না? তাই এই বিহারী ভূত।'

আমি হৈ হৈ করে বললাম, 'তাতে কি হয়েছে? মানুষটা তো ভালো। কিন্তু বাংগাল তুই বিহারী হইছস্? তো দাওয়ায় ওটা ছেলে না মেয়ে? কি নাম রাখলি?'

ঝিনুক লজ্জা পেয়ে বলল, 'পোলা হইছে। নাম আবার কি। ও কয় শিউ, আমি কই সুনা। কেমন নাম?'

হঠাৎ কেঁদে উঠল শিউ বা সোনা। চার দিকে পৌষের তকতকে রোদ, লক্ষীমন্ত বাতাস। শোনা যাচ্ছে দূরাগত নদীর কল্লোল। ঝিনুক এক ছুটে গিয়ে বাচ্চাকে বুকে নিলো। আনন্দে উদ্দীপনায় নতুন জননী তার স্তনবৃন্ত ধরলো শিশুর মুখে। স্বতোচ্ছল ধারায় ক্ষরিত হতে লাগলো অপরাজেয় জীবনের তাপ। এদিকে অপরাজিত দুই যুবক যুবতী আর সম্ভাবনার একরত্তি ফুল্ল কুসুম। ভাবি ছিন্নশিকড় এক উদ্বাস্তু পরিবারের ভাগ্যহত কন্যা নদীর জলে ধুয়ে নেবে তার বিষণ্ণ অতীত। এখন আর ব্রিজের উচ্চতা থেকে তাচ্ছিল্যভরা উদাসীন দেখা নয়, একই সমতলে দাঁড়িয়ে দেখছি জীবনের কবোষ্ণ প্রতিমা। কী দুর্জয় মানুষের বেঁচে থাকা আর কী অবারিত মাঠ নদী বাতাস।



ধর্ম-অধর্ম

কাকে বলে ধর্ম আর কাকে অধর্ম তা আমি এত বয়সে এসেও জানতে পারি নি। আমাদের দেশে যে বড় মুখ করে বলা হয় ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত তো সেই গুহাটাও আমি দেখিনি কোনোদিন। অবশ্য দেখবার চেষ্টাও যে খুব করেছি তা নয়। তবে গুহার বাইরে যাদের সর্বদাই চ'ড়ে-খুঁটে বেড়াতে দেখি তাদের সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের শেষ নেই। এমনতর মানুষদের এদেশে দুটো স্পষ্ট বিভাজন আছে: ধার্মিক আর অধার্মিক। আমি আবার ধার্মিক লোকদের একটু এড়িয়ে চলি। কেন চলি তা বলতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়।

বছর তিরিশ আগে আমি একা একাই একবার পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। অবশ্যই ধর্মার্থে নয়। দুদিন থেকে দেখলাম সমুদ্রেরও একঘেয়েমি আছে। তাই একদিন কনডাকটেড ট্যুর নিলাম। ঝাঁকিদর্শনে খণ্ডগিরি উদয়গিরি কোনারক ভুবনেশ্বর ইত্যাদি প্রভৃতি। তা সেবার লিঙ্গরাজ মন্দিরের বাইরে পাথরে-বানানো একটা রিলিফের গণেশমূর্তি দেখছি। পাশ থেকে দেখছেন এক দম্পতিও! তাদের সঙ্গে এক বছর-চারেকের বাচ্চা। কোত্থেকে উদয় হলো এক পাণ্ডা আর সেই দম্পতিকে বললো: 'গণেশের পূজা লাগাও দশ টাকা।' আমি তো অবাক!

মন্দিরের বাইরের কারুকাজ হিসেবে তৈরি একটা রিলিফ মূর্তি। কস্মিনকালে পুজো হয় নি। তার আবার প্রণামী কিসের? যুবকটিও ঝাঁকিয়ে উঠলো : 'ধর্মের নামে ব্যবসা ফেঁদেছ? বুজরুকি নাকি?' তার সুন্দরী বউ বললে, 'আঃ, ধর্মস্থানে চেঁচামেচি করছো কেন? দিয়ে দাও না একটা টাকা।'

: এক টাকা নয়, দশ টাকা।

পাণ্ডার আবদার শুনে মধ্যস্থ হয়ে আমি বললাম, 'কেন? দশ টাকা কেন?'

পাণ্ডা নির্লজ্জের মতো গণেশের পাথুরে ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, 'দেখছো না কত বড় পেট? এক টাকায় ভরবে?'

শুরু হয়ে গেল তর্কাতর্কি স্বামী-স্ত্রীতে। যুবকটি র‍্যাশনাল, যুবতী সেন্টিমেন্টাল। প্রতারিত হচ্ছে বুঝতে পেরে যুবকটি রুখে দাঁড়িয়েছে। ভাবটা যেন কভি নেহি গোছের। আমাকে সালিশি মানছে। অন্যের দাম্পত্য বিষয়ে আমি কদাপি নাক গলাই না। চুপচাপ তাই দেখছি। রাগও হচ্ছে বেশ। হঠাৎ পাণ্ডাঠাকুর সেই দম্পতির বাচ্চাটার মাথায় হাত রেখে বলল, 'যদি দশ টাকা না দাও তবে এই বাচ্চা মরে যাবে।'

ব্যস, মায়ের চোখে জল। সে সাপটে ধরলো ছেলেকে। প্রায় ককিয়ে বলতে লাগলো, 'দিয়ে দাও-না টাকাটা। অভিশাপ লাগবে যে।'

যুবক এবং আমি অপ্রতিভ, অবাক। এ যে ধর্মের নামে এক্সপ্লয়টেশনের চরম। যুবক নাছোড়, যুবতী সকাতর, আমি হতভম্ব, কেবল পাণ্ডা হাসিমুখ। কারণ এ গল্পের শেষ পাতা তার পড়া আছে। কিন্তু সেই গল্পের পরিণতি নাই বা শুনলেন। তবে সেই থেকে ধর্মস্থান আর ধার্মিকদের আমি এড়িয়ে বেড়াই।

কিন্তু অধার্মিকদের তো এড়াতে পারি না, কারণ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। চার দিকে তারা থিক থিক করছে। এমনই একজন অধার্মিকের কথা মনে এলো। তার নাম রাম সিং। জাতে বিহারী। তবে বহুদিন রয়েছে এদেশে। গাল-উপচানো গোঁফখানা দেখবার মতো। কিন্তু একই শহরে থেকেও কখনও তাকে দেখি নি। দেখলাম বড় বিচিত্র কারণে। সেবারে আমার বোন এসে রয়েছে আমাদের বাড়িতে। আসন্নপ্রসবা। যখন তখন প্রসববেদনা উঠতে পারে। নার্সিং হোমে বলা আছে ঠিকই কিন্তু হঠাৎ রাত-বিরেতে ব্যথা উঠলে কী হবে? এ তো কলকাতা নয়। ট্যাক্সি অমিল। শাঁসালো প্রতিবেশীও নেই যে গাড়ি পাবো। হন্যে হয়ে ভাবছি কী করি, উদ্ধার করল পাড়ার মুদী। 'চিন্তা করবেন না স্যার, রাম সিং আছে।'

: রাম সিং ? সে কে ?

: সে একজন রিক্সাঅলা। খুব দয়ালু, পরোপকারী। যখন-তখন ভাববেন জলে-ঝড়ে, রাতবিরেতে, বিপদে-আপদে। সে ঠিক রিক্সা নিয়ে হাজির হবে। তবে হ্যাঁ, তার ডেরাটা আপনাকে চিনে রাখতে হবে। আচ্ছা বলে দিচ্ছি। আপনার পাশের পাড়া ভট্টপল্লীতে একটা খুপরিতে রাম সিং থাকে, সবাই চেনে। নাম বললেই হাজির করে দেবে।

সত্যিই একদিন গেলাম। কাটখোট্টা দশাসই চেহারা, খাঁকি হাফশার্ট পরা। পালোয়ানদের মত মাথার চুলগুলো ছেঁটে নিকোনো। শরীর বড়, মুণ্ডু ছোট। কুৎকুতে চোখে হেসে বললে, 'আপনাকে তো বিলকুল চিনি। আপনি কালেজে পড়হান। কালেজিয়া।' এই কালেজিয়া শব্দটা অবশ্য আমার চেনা। যখন চন্দননগর কলেজে পড়াতে যেতাম তখন জগদ্দল ঘাটের দেহাতি পানসিঅলারা হাঁকতো, 'আস্থন কালেজিয়া বাবুলোক।' ইস্কুল যেতো যেসব বাচ্চা, তাদের ডাকতো 'ইস্কুলিয়া' বলে।

যাই হোক, সেবারে সত্যি সত্যিই মাঝরাতে ডাকতে হলো রাম সিংকে। প্রায় এক ডাকেই বেরিয়ে এলো সে। সঙ্গে অবগুণ্ঠিতা তার দেহাতী দোহারা বউ, হাতে কুপী। আমাকে দেখেই রাম সিং বললে, 'কি কালেজিয়া বাবু, ভাগ্‌মানের কী হুকুম হলো ? কী হোবে ? লেড়কা না লেড়কি ?'

শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই রাতেই শেষের দিকে নার্সিং হোমে জন্মালো আমার শ্রীমান ভাগিনেয়। দিনকয় পরে রিক্সাঅলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে মিষ্টি দিতে গেলাম তার ডেরায়। রাম সিং ছিল না। বেরিয়ে এলো তার অবগুণ্ঠিতা বউ। একটা তেলে সিঁদুরের মস্ত টিপ কপালে। তার হাতে মিষ্টির প্যাকেট ধরিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম প্রসন্ন মনে!

এবার থেকে বাড়তি যে-ঘটনা যোগ হলো তা এই যে, হঠাৎ-হঠাৎ রাস্তায় রিক্সা রুখে রাম সিং জানায় 'পরনাম' এবং জাতকের কুশল নেয়। মাঝে মাঝে পথে-ঘাটে বা বাজারের ভিড়ে তেলে-সিঁদুরের টিপ-পরা একটা হাস্যময়ী মুখ জানতে চায় 'বাবু কেমন আছেন ? বৌদি কেমন ? খোঁকিরা ?'

বুঝতে পারি বৌদি এবং খোঁকিদের খবর তার জানা। একদিন নাকি গিয়েছিল আমাদের বাড়ি। গিন্নি বলেছিলেন বুঝি। রাম সিং আর তার বউ সন্তানহীন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাই বউ বাচ্চাদের খবরদারি করে। এভাবেই গল্পটা শেষ হতে পারতো। কিন্তু বছর দশেক পরে হঠাৎ একদিন গিন্নি জানান

দিলেন রাম সিংয়ের বউ এসেছে। খবরটা দিয়ে তিনি চোখ মুছে নিষ্ক্রান্ত হলেন। কী ব্যাপার?

না, তেলে-সিঁদুরের টিপ নেই এবারে। দুধ-সাদা ঘোমটা, নতমুখ। রাম সিং নেই। তার ছরাদের জন্যে বাড়ি বাড়ি টাকা তুলছে তার বিধবা বউ। না, পরে জানা গেল বিধবা নয়, কেননা বউই নয়। রাম সিংয়ের এক দোস্ত্ হঠাৎ মারা গেলে তার অসহায় বিধবা বউকে রাম সিং ঘরে ঠাঁই দিয়েছিল। ধর্মত বিয়েই হয় নি। তার ঢং ছাখো এখন। সত্যিই সেই অধার্মিকের ঢং দেখেই যাচ্ছি আজও।

এখনও পথে-ঘাটে বাজারে হঠাৎ-হঠাৎ দেখা হয়ে যায় দুধ-সাদা কাপড়ের ঘোমটা-টানা বৃদ্ধার সঙ্গে। 'ভালো আছেন বাবু? বৌদি ভালো? খোঁকি শ্বশুরালে?' অধার্মিক নারীর কপালে দেখতে পাই জ্বলজ্বল করছে কাল্পনিক তেলে-সিঁদুরের টিপ। তার কোনো ম্লানতা নেই।

এই রকম সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার-স্যাপার দেখে ধর্মের কথায় ধন্দ কাটে না আমার। এই কথার পৃষ্ঠে আরেকটা গল্প মনে এলো। গল্পটা শুনেছিলাম রানাবন্দ গ্রামে। সেখানে গিয়েছিলাম দুশো বছরেরও পুরনো একটা ক্যাথলিক চার্চ দেখতে। আজকাল আবার ক্যাথলিক চার্চে বাঙালি বিশপ হচ্ছেন অনেকে। আগে শাদা চামড়া ছাড়া ঐ পদে কেউ ঠাঁই পেতেন না। রানাবন্দের বিশপের নাম পিউস বাড়ুই। পিউস কথাটা পায়াসের অপভ্রংশ, বাড়ুই মানে বারুজীবী। তিনি বিশুদ্ধ বরিশালী অ্যাকসেন্টে রানাবন্দের চার্চ প্রতিষ্ঠার আদ্যকালের বিবরণ দিলেন। তার মধ্যে খুব মজার গল্পটা প্রথম বিশপ মশাইয়ের। তিনি ছিলেন জাতিতে বেলজিয়ান। সময় আঠারো শতকের শেষ দশক। এ-দিগরে সেই প্রথম চার্চের পত্তন হয়। জন দশেক গরিব মাহিষ্য প্রথম ধর্মান্তরিত হয়। বড়দিনের আগের রাতে বিশপ সেই দশজন দীক্ষিতদের বললেন, 'আগামীকল্য মহা উৎসব, বৃহৎ পার্বণ। তুমরা বালো কাপ্ড়া পরিদান কইরিয়্যা আনন্দ করিবে ইখানে।'

পরদিনের কাণ্ড দেখে বিশপের তো আক্কেলগুড়ুম। ছাখেন, সেই দশ জন লোক নতুন প্যাণ্ট প'রে মহা উল্লাসে খোল কর্তাল বাজিয়ে গ্রামীণ কুঁড়ে-ঘরের চারপাশে নেচে কুঁদে প্রদক্ষিণ করছে আর গলদশ্রুধারে গাইছে: 'একবার গোবিন্দ বলো ভাই'।

'ঠামো ঠামো, সদাপ্রভুর নাম করো' বিশপ গর্জে ওঠেন। বলেন, 'প্রভু যিশুর জয় গাও। বলো: প্রিয় যিশু আমি শিশু পাপী অসহায়।'

তারা রুখে দাঁড়িয়ে বলে, 'তা বলবো ক্যানে ? কেরেস্তান হয়েছি বলে কি বাপ পিতেমোর ধম্ম ছাড়বো নাকিন ?'



বিশপ পিউস বাড়ুই হো হো করে হেসে বলেন, 'অশিক্ষিত সরল পল্লীবাসীদের কাণ্ডটা ভাবুন।'

আমি বললাম, 'শিক্ষিত জটিল শহুরে গপ্পো একটা শুনবেন নাকি ?'

'সে কি ধর্ম নিয়ে ?' বিশপ জিজ্ঞাসু।

: কি জানি মশাই ধর্ম-অধর্ম বুঝি না। তবে হ্যাঁ, যাকে নিয়ে গল্প সেই অর্পণা একজন প্রোটেস্ট্যাণ্ট পাদ্রির মেয়ে।

: অপর্ণা না অর্পণা ?

: অপর্ণা। অর্পণা মুখার্জি। কলেজে বি. এ. ক্লাসে আমাদের সহপাঠিনী

ছিলেন। বেশ মেধাবী এবং অত্যন্ত ভদ্র। এখানে ভদ্র মানে বিনয়ী শুধু নয়, সে কথায় কথায় বলতো 'ধন্যবাদ'।

: ওটা খৃস্টীয় সমাজের একটা লক্ষণ। সাহেবদের সংসর্গ থেকে শেখা সহবৎ আর কি! যা হোক, তা সেই অর্পণার কি হলো?

: কিছুই যে হলো না এটাই গল্প। ভাবছেন সে আবার কি, এই তো? তা হলে বলি শুনুন। আমরা তো বি. এ. পাস করে সব যে যার মতো ছিটকে পড়লাম চার দিকে। জীবিকার তাড়া, উচ্চশিক্ষার ঝোঁক; কে কার খোঁজ রাখে বলুন? তবে এটা ঠিক যে অর্পণা বি. এ.-তে ভালো করলেও এম. এ পড়ে নি আমাদের সঙ্গে এটা মনে আছে। কিংবা হয়তো প্রাইভেটে পড়েছিল কে জানে। মোট কথা বহুদিন আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তা ধরুন পনেরো বছর। তার পরে একদিন অবাক কাণ্ড। সরগুনা অঞ্চলে একদিন হঠাৎ একটা মিশনারী স্কুলে গিয়ে অর্পণার সঙ্গে দেখা। সে সেখানকার হেডমিস্ট্রেস। 'মিস এ. মুখার্জি' লেখা ছিলো বাইরের নেমপ্লেটে। তাই বলে বুঝবো কি করে যে এখানে 'এ' মানে অর্পণা। আর চেহারাটাও মশাই এক্কেবারে পালটে গেছে। ছিল বেত্রবতী, হয়েছে রাণী রাসমণি মার্কা। সেইসঙ্গে বেশ পাকা চুল। হাসিটা দেখে তবে ধরলাম।

: তারপরে? আসল গল্পটা কি?

: আসল গল্পটাই এবারে। প্রথমে তো চা-পান, খানাই-পানাই, কেমন আছ, সে কোথায়, অমুক কি করছে এইসব। তার পরে আমিই প্রশ্ন করি, 'কি ব্যাপার অর্পণা, মিস রয়ে গেলে যে? বিদ্যা আর রূপ কোনোটারই তো অভাব ছিল না। অসুবিধে কোনখানে হলো?' অর্পণা কি বললো জানেন? মুখখানা ম্লান ক'রে বললো, 'দ্যাখো, বাবা ছিল খুব গোঁড়া। জানো তো, আমাদের সমাজে ভালো ছেলে কম।' আমি বললাম, 'সে কি? প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে ভালো ছেলে নেই? তোমার কপালে ভালো ছেলেই জুটলো না?' অর্পণা মুখখানা কালো ক'রে বললে, 'শুধু প্রোটেস্ট্যাণ্ট আর ভালো ছেলে হলেই তো হবে না, কুলীন ক্রিশ্চান চাই যে। আমরা না মুখার্জি?'

এই অবধি বলে আমি বললাম, 'কি বিশপ মশাই? অশিক্ষিত পল্লীবাসীদের ধর্ম আর সংস্কারের গপ্পো বলছিলেন না? অর্পণা তো সুশিক্ষিত, তার বাবাও। তা তাঁদের অত কুলীন ক্রিশ্চান দরকার হলো কেন?'

বিশপ আর কি জবাব দেবেন? তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে সদাপ্রভুর

ধ্যান করতে লাগলেন। আর আমার সেদিন রাসাবন্দ থেকে ফেরার পথে মনে পড়লো বন্ধু লরেন্স শান্তনু হালদারের দুর্বিপাকের কাহিনী।

শান্তনু ছিল আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়। আমরা ডাকতাম 'শানু'। সে যে খৃস্টান এবং তার গালভরা লরেন্স ব'লে একটা খৃষ্টিয় নাম আছে তা প্রথম জানলাম স্কুলের প্রাইজের দিন। হেডমাস্টার হাঁকলেন: 'ক্লাস সেভেন। জেনারেল প্রফিসিয়েন্সি···ফার্স্ট লরেন্স শান্তনু হালদার'। পরে অবশ্য শানুদের বাড়ি অনেক গেছি। আমাদেরই মতো গেরস্থ বাড়ি। কেবল ওর বাবা দেখতাম সর্বদা গ্যালিস-লাগানো ট্রাউজার পরতেন আর মা'র হাতে থাকতো একটা চমৎকার ছোট্ট বাইবেল।

শানুর তেমন ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি ছিল না। লেখাপড়ায় মশগুল থাকতো। এম. এ.-তে ড্যাং ডেঙিয়ে ফার্স্ট হয়ে কলেজে মাস্টারি নিলো। মফঃস্বলের কলেজে ঐ রকম গমগমে গলার চোস্ত ইংরিজি উচ্চারণ, একজন ছাত্রী সামলাতে পারলো না। বেচারী সেই ছাত্রীর নাম শিবানী। নিপাট হিন্দু ব্রাহ্মণ, ঝকঝকে গৌরবর্ণের নিখুঁত সুন্দরী। শানুরও অবস্থা কাহিল। কিন্তু যেদিন সে জানাতে বাধ্য হলো যে আসলে তারা ক্রিশ্চান সেদিন তো শিবানী কেঁদেকেটে একসা। 'কেন আগে বলো নি?' 'বাবা মা-কে কি ক'রে এখন এ কথা বলবো?' 'হায় ভগবান, কেন এমন হলো?'

এক্ষেত্রে ভগবানের চেহারা কেমন কে জানে! সে কি পীতধড়া গোপীমোহন কৃষ্ণ নাকি পিণাকপাণি বৃষভবাহন শম্ভু? নাকি সুদর্শন স্লিম শ্মশ্রুগুম্ফসমন্বিত যিশুখৃস্ট অথবা অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি-মার্কা উত্তমকুমার? যাই হোক আমরা বন্ধুরা কেসটায় এনট্রি নিতে বাধ্য হলাম। শানুর গ্যালিস-পরা বাবাকে বোঝাতে অসুবিধে হলো না। বাইবেল-হস্তা মা-ও বিজয়িনীর হাসি হাসলেন। সুন্দরী শিবানীর ফটো তিনি আগে দেখেছিলেন।

কিন্তু মুশকিল বাধলো শিবানীর নাছোড় বাবাকে নিয়ে। তিনি কেবলই বলেন, 'আমরা ব্রাহ্মণ যে! একটা উচ্চ সমাজে বাস করি তো! আত্মীয়কুটুম্বকে কি বলবো?'

সহকর্মী বয়স্ক প্রফুল্লদা বললেন ভারিক্কি চালে 'আরে মশাই, কি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ করছেন? আমি নিজে তো সদ্‌ব্রাহ্মণ! আমি আপনাকে বলছি, শান্তনু আমার চেয়েও ভালো ব্রাহ্মণ। চমৎকার চেহারা, সৌম্যশান্ত, ধীরস্থির, পণ্ডিত আর বিনয়ী। ব্রাহ্মণের বৃত্তিই তো নিয়েছে···অধ্যাপনা। আবার কি চান মশাই?

শুধু ধন্ম ধন্ম করে কাঁদুনি গাইলে চলবে কেন ? শিবানীর দিকটাও তো ভাবতে হবে।'

ঘরের একপাশের কৌচে বসে শিবানীর মেসোমশাই একমনে পাইপ টানছিলেন আর পা দোলাচ্ছিলেন। তিনি দুঁদে ব্যুরোক্র্যাট। হঠাৎ পাইপের থুতু ঝেড়ে বললেন, 'একটা প্লাস পয়েন্ট আছে, ছেলেটার টাইটেল হালদার। তার মানে আমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে তো হালদারও আছে। একটা ক্যামোফ্লেজ করা যাবে। অলরাইট, এগ্রিড।'

প্রফুল্লদা বললেন, 'ক্যামোফ্লেজটা কি ?'

: সিম্প্‌ল্। ভেরি সিম্প্‌ল্। শান্তনু বাবাজি বিয়ের আসরে কেবল একগাছা পৈতে পরবে, ব্যস। দ্যাট সল্‌ভস্ দ্য প্রবলেম। আত্মীয়কুটুমরা চাক্ষুষ দেখলেন। আমরাও হালদার টাইটেলটাকে এক্সপ্লোর করলাম।

'রীতিমতো অপমানজনক' আমি ফুঁসে উঠলাম।

প্রফুল্লদা মধ্যস্থের ভঙ্গিতে বললেন, 'আহা, মেনে নাও। বাই অ্যাণ্ড লার্জ এটা একটা গুড সলিউশন। প্রেমের খাতিরে শানু এটা মানবে নিশ্চয়ই।'

শানু অবশ্য মানলো, তবে আনডার প্রোটেস্ট। যদিও এক্ষেত্রে বরকর্তা প্রফুল্লদা তাই প্রতিবাদ সরব হলো না। নেপথ্যে নাকি শিবানীর চোখের জলের অনুনয় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল শোনা যায়। মোট কথা শেষমেষ সব দিক রক্ষা করে বিয়েটা হলো। বিধর্মী পরিবারের খাঁচাকলে শিবানী গিয়ে পড়লো। সমস্যা বাধলো হনিমুন-পর্বের পরে একটু স্থিতু হতে না হতে। হঠাৎ শিবানীর মধ্যে সুপ্ত হিঁদুয়ানী ভর করলো। সে বাপের বাড়ির সোর্সে লক্ষ্মীর পাঁচালী, কোশাকুশি, গঙ্গাজল. শুদ্ধবস্ত্র, কুশের আসন আনালো। তার পরে এক বেস্পতিবারে সে শানুকে বললো, 'আজ সন্ধেয় তোমার ব্রিটিশ কাউন্সিল যাওয়া চলবে না।' চমকিয়ে উঠে শানু বললো, 'কেন ?'

শিবানী খুব ভক্তিনম্র কণ্ঠে গদ্‌গদ্ ভাবে বললো, 'আজ বেস্পতিবার জানো তো ? তার মানে লক্ষ্মীবার। আজ আমি সন্ধ্যেবেলা লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়বো।'

'অ' শানু খুব চিবিয়ে উন্নাসিকের মতো বললো। তার পরে বিদ্রূপের ঢঙে বললো, 'তোমার তো এসব ছিল না কখনও। তা প'ড়ো লক্ষ্মীর পাঁচালি। কারুর ধর্মবিশ্বাসে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাকে বাড়ি থাকতে হবে কেন ?'

অবিচলিতভাবে শিবানী বললো কর্তৃত্ব ফলিয়ে, 'বাড়ি থাকবে, কেননা আমি পাঁচালি পড়বো আর তুমি শুনবে।'

একটা ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারতো কিন্তু ঘটলো না দুটো কারণে
প্রথমত শানু স্বভাবত ধীরস্থির বিবেচক আর দ্বিতীয়ত তার মন তখন যৌবনরসে
টইটম্বুর, সে দীর্ঘশ্বাস গোপন ক'রে মেনে নিলো নবীনা স্ত্রীর ধর্মাচারের বাড়াবাড়ি

এ-গল্পের শেষাংশ বড় বেদনাবহ। কেননা প্রতি বেস্পতিবার শুদ্ধবস্ত্র প'রে
র‍্যাডিক্যাল শানু যখন ভক্তিমতীর মুদিতনেত্র পাঁচালি আবৃত্তি শুনতে বাধ্য হতে
তখন তার মধ্যে ফুঁসিয়ে উঠতো বিবেক। যৌবনরসে টইটম্বুর দিন তো বেশিদিন
টেঁকে না! সে একদিন শিবানীর কোশাকুশি পাঁচালি আর গঙ্গাজলে দুই লাথি
মেরে উঠে গেল। শিবানী আর্তি অপমান আর অপ্রতিভতায় আমূল কেঁপে
পিত্রালয়ে চলে গেল। তার বিজ্ঞ বাবা-মা রায় দিলেন, 'তখন শুনলি নে। ওরে
ধর্মাধর্ম বলে একটা কথা আছে বৈকি।'

আমাদের আসরে শানু বলে, 'ইন্‌করিজিব্‌ল্। সবকিছুর একটা সীমা আছে
রিলিজিয়াস আইডেনটিটি ক্রাইসিস বলে র‍্যাশনাল জগতে কিছু আছে কি? তোর
মানিস লক্ষ্মীর পাঁচালি?'

আমি বললাম, 'ধুস্, ওসব মেয়েলি ব্যাপার'।

'ঠিক তাই' শানু বলে, 'তবে কিনা তুই হিন্দু তাই বউকে ধুস্ বলতে পারিস
আমি ক্রিশ্চান তাই ধুস্ বললে হয়ে যাব বিধর্মী। কেন? শিবানীরই বা অত ধম্ম
ধম্ম কেন? কোনোদিন ও কি লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়েছে নিজের বাড়িতে? ও কেন
এমন ফ্যানাটিক হয়ে গেল বল্ তো?'

সত্যিই জীবনভর বুঝে পেলাম না ধর্মের অদৃশ্য ভাইরাস কাকে কখন কী ভাবে
আক্রমণ করে।

অথচ সেই অদৃশ্য ভাইরাস যে সবাইকে আক্রমণ করতে পারে তা নয়। আমার
দুটো ঘটনা মনে পড়ছে। তার একটা বইতে পড়া, আর-একটা চোখে-দেখা।
বইয়েরটাই আগে বলি। অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী 'স্মৃতিভারে' নামে একটা
আত্মস্মৃতি লিখে গেছেন। এ দেশে যেমন হয়, গল্প-উপন্যাসের তোড়ে সে বই খুব
কমজনই পড়েছেন। যা হোক, সে বইতে প্রথমে আছে খুলনার এক অজ গাঁয়ে
বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় জনার্দনবাবুর হাতেখড়ির বা কাগজ ধরার বৃত্তান্ত।
সে সময়ের গ্রামীণ পরিবেশ এতটাই উদার ছিল যে তাঁকে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন
একজন মৌলবী। বর্ণনাটা এইরকম। কলম দিয়ে কাগজে মৌলবী সাহেব প্রথমে
লিখলেন 'এলাহি ভরসা', তারপরে লিখলেন 'শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়'। এবারে
বিদ্যার্থীকে সস্নেহে বললেন: 'এর মধ্যে প্রথম কথাটা আমার আর দ্বিতীয় কথাটা

তোমার।' তার পর একটু থেমে বললেন: 'দুটো কথাই কিন্তু আসলে এক।'

বলাবাহুল্য, জনার্দনবাবুকে বাকি জীবন আর সাম্প্রদায়িকতার ভাইরাস আক্রমণ করে নি। তিনি স্বচ্ছন্দে লীগ আমলে মুসলিম-অধ্যুষিত চট্টগ্রামের কলেজে বৈষ্ণব পদাবলী পড়াতেন। মুসলিম সমাজ তাঁকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে সসম্ভ্রমে বলতেন, 'জনার্দন প্রোপেচর'।' অথচ তিনি ছিলেন সব অর্থেই শুদ্ধাচারী বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ। এমন কি এতদূর ভক্তিমান যে ক্লাসে যতবার বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বা অন্য মহাজনদের নাম উচ্চারণ করতেন ততবার তাঁদের বৈদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে যুক্ত করে প্রণাম ঠুকতেন। এ তো আমরাই দেখেছি।

তেমনই দেখেছি আমাদের মফস্বল শহরে সরোজবাবুকে। সরোজ সিংহ। তিনি অবশ্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন, তবে আমাদের শহরে যৌবনে সাড়া তুলেছিলেন এক যবনীর পাণিগ্রহণ করে। তাঁর স্ত্রী রাবেয়া খাতুন উকিলের কন্যা। বিয়ে হয়েছিলো রেজিস্ট্রী করে। সারা জীবন কেউ কারুর ধর্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলেন নি। এতখানি ঔদার্য সাধারণত আমরা বিশিষ্টদের মধ্যেই দেখতে অভ্যস্ত। অথচ সরোজ-রাবেয়া ছিলেন সব অর্থেই সাধারণ। রাবেয়া সংসার সামলাতেন, সরোজ করতেন দোকানদারি। তাঁদের একমাত্র সন্তান মণ্টু মাধ্যমিক পাস করে তখন আমাদের কলেজে ভর্তি হতে এলো। অ্যাডমিশন ফর্ম স্ক্রুটিনি করতে গিয়ে দেখি 'রেলিজিয়ন'-এর ঘরটি পূরণ করা হয় নি। তাকে ডেকে জিগ্যেস করতে খানিকক্ষণ মুখ নিচু ক'রে থেকে বলে, 'বাবা জানেন'। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরোজ সিংহ এলেন জবাবদিহি করতে। খুব বিশেষত্বহীন মানুষ, সাধারণ বেশবাস। প্রিন্সিপালকে খুব সহজ ভাষায় বললেন, 'ঐ ঘরটা পূরণ করা কি খুব জরুরি?'

প্রিন্সিপাল বললেন, 'আপত্তি আছে?'

: আপত্তির কথা নয়, কথাটা হলো অসুবিধার।

: কী রকম?

: দেখুন আমাদের ধর্মাধর্ম জাতপাত সম্পর্কে কোনো সংস্কার নেই। আমি জন্মসূত্রে হিন্দু, আমার স্ত্রী মুসলমান। কেউই ধর্ম পালন করি না। বিশ্বাস নেই বলতে পারেন। তাই আমরা চাই না আমাদের ছেলের ওপর কোনো রকম ধর্ম চাপিয়ে দিতে। রিলিজিয়নের ঘরটা ফাঁকাই থাক না। ও যখন বড় হবে, জ্ঞানবুদ্ধি হবে, তখন যদি মনে করে ও নিজেই ঠিক করবে।

: ঠিক আছে।

সরোজ সিংহ নিষ্ক্রান্ত হ'তেই প্রিন্সিপাল খুব তারিফ-চোখে জানতে চাইলেন ভদ্রলোক কি করেন। যখন জানলেন একজন সাধারণ দোকানদার তখন কেমন যেন হতাশ হলেন। তার থেকে আমার মনে হলো উদারতা বা মৌলিক চিন্তা কেবল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ বা শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই দেখাবেন এটাই বোধ হয় আমরা চাই। সাধারণ একজন মানুষ অসাধারণ একটা বিশ্বাস পোষণ করেন তা যেন আমরা বুঝতেই চাই না। এখানেই বুঝি আমাদের ভুল ঘটে।

ধর্ম নিয়ে সাধারণ মানুষ কতখানি নাকানি-চুবানি খাওয়াতে পারে ধর্মধ্বজীদের তা-ও আমি দেখেছি বৈকি। নতুন বিয়ের পর তখন আমরা বাসা বেঁধেছিলাম প্রোটেস্ট্যাণ্ট পাড়ায়। বাড়িউলি আশা বলে একটি পরিচারিকা ঠিক করে দিলেন। সে কর্মঠ নম্র নীরব, তবে চার-পাঁচটি সন্তান নিয়ে বড়ই গরিব। তার স্বামী তাকে ত্যাগ করেছে। কদিন পরে জানা গেল আশা একজন ক্যাথলিক খৃস্টান। অচিরে একদিন রবিবার সকালে সে ছুটি নিলো গির্জা করবে বলে। সেখান থেকে ফিরতে গিন্নি বললেন, 'আশা, তুমি বুঝি খুব ধন্মটম্ম মানো?' একগাল হেসে আশা বললে 'না বৌদি, ধন্মটম্ম করবার সময় কই? অভাবে খিদেয় মরে গেলাম। তাই গির্জে যাওয়া আর কি!'

: তার মানে?

: তার মানে গির্জে গেলাম, প্রার্থনা করলাম। তার পরে ফাদারকে বললাম, 'পাদ্রিবাবা সাহায্য চাই।'

: সাহায্য পেলে?

: ঐ পাঁচ টাকা আর দু-কিলো গমচুর প্যালাম।

: গেলেই পাও?

: তাই কি হয় বৌদি? কখনও দেয়, কখনও দেয় না। আবার প্যাঁচ মারতে হয়, তখন দেয়।

এবারে আমার কৌতূহল বাড়ে। আগ বাড়িয়ে বলি, 'প্যাঁচটা কি রকম?'

'সে দাদাবাবু কি শুনবেন?' আশা হেসে বলে, 'পাদ্রিবাবাকে বলি, ফাদার যেতি ট্যাকা না দ্যান তবে প্রোটেস্ট্যাণ্ট হয়ে যাবো হ্যাঁ।'

আমি হো হো করে হেসে বললাম, 'প্যাঁচটা ভালোই, কিন্তু বুদ্ধিটা দিল কে?'

: ঐ আপনার বাড়ির পেছনে পিটুলিতলায় থাকে সামুল বুড়ো। ওই দিয়েছে বুদ্ধিটা। একদিন ডেকে শুনবেন, অনেক শয়তানি ওর পেটে।

সামুল বুড়ো মানে স্যামুয়েল সরকার। পিটুলিতলায় থাকে, বাউণ্ডুলে। ডাকতে হলো না। নিজেই একদিন এসে বললো, 'যিশুপ্রণাম থুড়ি প্রাতঃপেন্নাম প্রোফেছারবাবু।' জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই বললো, 'সকাল থেকে আজ পেটে কিছু পড়ে নি, তাই ভাবলাম যাই প্রোফেছারবাবুর কাছে। জ্ঞানী মান্যমান মানুষ দেখলেও আনন্দ।'

গিন্নি এসে বললেন, 'রুটি তরকারি আর চা খাও।'

: খাবো বৈকি মা জননী। তবে তার আগে আপনাদের দুটো মায়ের গান শোনাবো।

: মায়ের গান? মা মেরীকে নিয়ে গান আছে নাকি?

: আজ্ঞে মা মেরী নন, মা কালী।

: তুমি না ক্রিশ্চান?

: ক্রিশ্চান হয়েছি। আসলে মূলে তো সেই হিন্দু। সরকার পদবীটা এলো ক'ন থেকে বলুন তো। মাহিষ্য হিন্দু। মোর ঠাকুরদা ক্রিশ্চান হয়েলো। তাতেই ক্রিশ্চান। আসলে হিন্দু না কি বলেন?

কি আর বলি? স্যামুয়েলের পেটে নাকি অনেক শয়তানি। দরকার নেই ঘাঁটিয়ে। দু-চারখানা শ্যামাসংগীত গায়। ভালো গলা, দরাজ। ভিড় করে শুনতে আসে সব খৃস্টান পল্লীবাসী। রুটি তরকারি খাওয়ার আগে সামুল বুড়ো খেঁকিয়ে উঠলো। 'যা যা ভাগ্। তোদের পাদ্রিবাবা শুনলে গোঁসা করবে। বলবে "হেঁদুদের গান শুনিয়াছ, পাপ হইয়াছে", যা যা ভাগ। প্রাচিত্তির করগা যা।'

আমাকে বলে, 'বাবু এরা অবোধ, জ্ঞানছাড়া। এদের যিশু দয়া করুন।'

মানুষটা যাকে বলে বেশ আকর্ষণীয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'চলে কি করে তোমার? এমন চমৎকার শ্যামাসংগীত শিখলে কোথা থেকে?'

'আর বাবু। কি যে বলেন' সামুল বুড়ো লজ্জার হাসি হেসে বললে, 'ভালো প্রশ্ন করেছেন বটে, চলে কি করে? চলে আর কই বলেন? চলে না। চেয়ে-চিন্তে মেগে খাওয়া দু-বেলা। অদ্ধেক দিন দূর ছাই অবস্থা। তবে হ্যাঁ মায়ের গান শিখেছি কোথায় এটা একটা ভালো কথা। সেটা শুনুন। ঐ যে কলেজ মাঠের পেছনে রামকেষ্ট মিশন, ওখানে এক স্বামীজি থাকতেন, তাঁর কাছেই গানের শিক্ষা।'

: তিনি তোমায় মা কালীর গান শেখালেন বুঝলাম। তিনি কি জানতেন তুমি খৃস্টান?

: পেরথমে জানতেন না। আমিও নাম ভাঁড়িয়েছিলাম তো।

: সে কি ? কি নাম নিয়েছিলে ?

: না না, সে এমন কিছু শক্ত নয়। স্যামুয়েলের বদলে কেবল শ্যামল সরকারই বহাল থাকলো। শ্যামল সরকার স্যামুয়েল সরকার, কি বাবু কানে কিছু তফাৎ ঠেকছে নাকিন ?

: নাঃ। তফাৎ নেই।

: সত্যিকারেরও কোনো তফাৎ নেই, বুঝলেন। গরিবের আবার জাত কি ? সকলের কাছেই তো মেগে খাওয়া। তা মজা মাঝে মাঝে এক-আধটা করি বটে।



: কী রকম ?

: এই ধরেন মাঝে মাঝে পাদ্রিবাবাকে বলি, 'বাবা নিত্যিদিনের জন্যে যদি একটা বিলি বন্দোবস্ত না করেন তবে ঐ শ্যামলই বনে যাবো পাকাপাকি। মিশনে গিয়ে মায়ের নাম করলে দু-বেলা কিছু কি জুটবে না ?'

: তখন পাদ্রিবাবা কি বলেন ?

: দ্যায়। সাহায্য দ্যায়। খেতেও দ্যায় কদিন। তবে কিনা বাবু, আমি হলাম গিয়ে জাত-খচ্চর। দো-আঁশলা তো ? বুঝলেন না বুঝি কথাটা ? আরে

আমার বাপ ক্রিশ্চান হ'লে হবে কি, মা তো ছিল হেঁদু। আমি তাই জাত-খচ্চর। সেইজন্যেই শয়তানী আমার পেটে পেটে। তো করি কি জানেন? দিন কয়েক পাদ্রিবাবার বাড়ি খেয়ে আবার যাই মিশনে সন্ন্যেসীবাবার কাছে। বলি, 'মায়ের নামের কী মহিমে। গান গেয়েও শান্তি। তা সাধুবাবা এখানে কদিন যদি অন্নপানের ব্যবস্থা করেন।' আরে ছিছি প্রোপেছার বাবু জীবনে ঘিন্না ধরে গেল। অধম একেবারে অধম।

আমি সেই আশ্চর্য দো-আঁশলা প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের আর তল পেতাম না। কিন্তু বুঝতাম, উচ্চসমাজে ধর্ম নিয়ে যতই আমরা মাতামাতি করি না কেন, একেবারে নিচু সমাজে ধর্ম যেন একটা ফুটবল। একবার লাথি মেরে ওপারে পাঠাচ্ছে আরেকবার এপারে।

কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি যে দ্বিজাতিতত্ত্ব সময়ে সময়ে কতখানি অসহায়তা এনে দিতে পারে। বুঝলাম আমার সহকর্মী অধ্যাপক নুরুল আমিনের মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু সেই মৃত্যুর গাঢ়তা বোঝাবার জন্য এখানে নুরুল সম্পর্কে একটু বলে নিতে হবে।

পুরো নাম সৈয়দ নুরুল আমিন। তার নাম আজ আপনারা শোনামাত্র চিনতে পারতেন কেননা তার জেনেটিকস্ বিষয়ে গবেষণা যুগান্তর আনতে পারতো। প্রাণীবিদ্যার সেই কৃতী ছাত্র আর অধ্যাপক মাত্র চল্লিশ বছরেই দেহ রাখে ক্যানসারে। সেকি দুরারোগ্য রোগযন্ত্রণা! তখন নুরুল আর আমি দুজনেই মফস্বলে কাজ করি। বিষয়ের মিল ছিল না। কিন্তু মনের মিল ছিল আমাদের। সহৃদয় মানবদরদী, উদারপন্থী। সহপাঠিনী শান্তাকে বিয়ে করেছিল। ওর ভাষায় 'দুঃসহপাঠিনী'। ভালোবাসার তোড়ে জীবন নাকি দুঃসহ করে তুলেছিল। আসলে শান্তার ছিল নুরুলের অসামান্য মেধার প্রতি আকর্ষণ। তার জন্য শান্তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। মুসলমান ছেলে, হলোই বা মেধাবী, ক-জন হিন্দু বাবা-মা তাকে জামাই বলে মেনে নিতে পারে? অবশ্য নুরুলের সৈয়দ বংশও মানে নি। তাদের খানদানেও বেধেছিল। তাই অগত্যা দুজনের নিঃসঙ্গ নীড়। একটা ভরসা ছিল সরকারি বদলি-নীতি। আজ কলকাতা, কাল দার্জিলিং আবার একদিন ঝাড়গ্রাম বা চন্দননগর। নুরুলদের জীবনে বৈচিত্র্য এনেছিল এই বদলির স্থান-বদল। ঈশ্বর তাদের সন্তান দেন নি। কিন্তু দিয়েছিলেন অপরিমিত বন্ধুতার স্বাদ। আমি তার একজন কাছের বন্ধু ছিলাম।

ঘনিষ্ঠতার কারণেই তাদের জীবনের নানা আনন্দ-বেদনার কথা আমি

জানতাম। গবেষণার স্তরে স্তরে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, শান্তার পিত্রালয়ের জন্যে নুরুলের সহানুভূতি (বাবাকে শান্তা খুব ভালোবাসতো), কোনোভাবে শান্তাকে মুসলিম সমাজে অস্বস্তিতে না ফেলা, নুরুলের সব অনুভূতি আমি জানতাম। শান্তাও জানিয়েছিল, সে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম নিয়েছিল। নুরুলকে ভালবাসে ব'লেই। তবে শর্ত ছিল একটাই। মুসলমানী রীতিকৃত্য সে পালন করতে পারবে না, কেননা কোনোরকম ধর্মাচারেই তার আস্থা ছিল না। নুরুলও ধর্মবিষয়ে উদারপন্থী ছিল কিন্তু নামাজ পড়তো। হজ রোজা জাকাত করতো না। সাধারণ-ভাবে গরীবদের দানধ্যানে মতি ছিল। তবে শান্তাকে সে কোনোদিন ধর্মাচারে বাধ্য করেনি।

ভালই চলছিল সবকিছু স্বচ্ছ সহজতায়। বাধ সাধলো ক্যানসার। তখন আমরা দুজনেই বারাসতে। এককালে দুজনেই ছিলাম দার্জিলিঙে। দশ বছরে সকলের চেহারা ও চরিত্রে কেবল কিছুটা পার্থক্য এসেছিলো, বন্ধুতায় কোনো গ্লানি আসেনি। ক্যানসার ধরা পড়বার পর প্রথম পর্যায়ের ছোটাছুটি, বায়াপ্‌সি, কেমিওথেরাপির পর মাস তিনেক পরে কলকাতার ডাক্তার বললেন রুগীকে বাড়ি নিয়ে যেতে। কোনো আশা নেই। শেষের কটা দিন প্রিয় পরিজনদের মধ্যেই থাকুক সে।

খাদ্যনালীতে কর্কট রোগ। দুঃসহ খিদে কিন্তু খাওয়ার সামর্থ্য নেই। ভয়ংকর সেই অবস্থা চোখে দেখাও মর্মন্তুদ। পরিজন পরিত্যক্ত নুরুল আর শান্তা। জলের মতো অর্থব্যয় হয়ে প্রায় নিঃস্ব। আছি একমাত্র আমরা কজন অসহায় সহকর্মী। নুরুলের শরীরের কষ্ট আর শান্তার মনের কষ্ট লাঘব করবার ক্ষমতা আমাদের কই? সেইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিন চ'লে ঘনিয়ে এলো অন্তিমের কটা ঘণ্টা। শান্তা বললো 'জানেন, শাশুড়ি চিঠি লিখেছেন আমি মুসলমান হয়েও নামাজ পড়িনা বলেই তাঁর ছেলের এমন হলো। আমি নামাজ পড়বো আজ। বাঁচবে না ও?'

কি উত্তর দেবো? কেবল আমার স্ত্রী বললেন, 'শান্তা, চলো। তোমার স্বামীর মাথার কাছে বসবে চলো। ওঁর গায়ে মাথায় একটু হাত বুলোলে উনি শান্তি পাবেন।'

'না, না' ককিয়ে উঠলো শান্তা, 'আমি শুধু নামাজ পড়বো'। তাকে বোঝানো গেল না। সে পাশের ঘরে জায়নামাজ পেতে নামাজ পড়তে বসলো। দুচোখে তার বন্যার ধারাস্রোত। রুগীর ঘরে আমরা প্রাণপণ ক'রে দেখছি নুরুলের অন্তিম শারীরিক আক্ষেপ। একসময় শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

ছুটে গিয়ে দেখলাম জায়নামাজে বসে শান্তা যেন চিত্রার্পিত স্থির। চোখ বন্ধ, দু গালে জলের ধারা। আমার স্ত্রী তাকে ধরে ঝাঁকাতেই বিকট কান্নায় ভেঙে পড়ে শান্তা বললো, 'পারলাম না দিদি গো, কিছুতেই পারলাম না। নামাজের মধ্যে দিয়ে আল্লার দোয়া পেলাম না। আমি যে কোনোদিন নামাজ পড়িনি। আমার চোখের সামনে কেউই ধরা দিলেন না। আমি শুধু নুরুলকেই দেখলাম।'

নিছক ধর্মকর্ম নিয়েই যে একটা জনপদ পুরোপুরি চলতে পারে তা আমি প্রথম বুঝতে পারি হরিদ্বারে একমাস বাস করে। না, সেখানেও আমি ধর্মার্থে যাইনি। গিয়েছিলাম যাকে বলে চেঞ্জে। প্রাকৃতিক বিপুলতা সেখানে দেখবার মতো। নয়নরম্য শিবালিক পাহাড়ের শ্রেণী আর স্রোতস্বিনী গঙ্গাধারা। সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা আর ভ্রমণকারীদের স্বচ্ছলতাও দেখবার মতো! এই দরিদ্র দেশে ধর্মের নামে কত টাকাই যে অপচয় হয়, ব্যথিত চিত্তে সেটাও দেখতাম। যেমন, পৃথুলা শেঠগিন্নী কোমরের গিঁটেবাত নিয়ে দুলে দুলে হাঁটছেন, তাঁর পিছনে আজ্ঞাবাহী ভৃত্য বয়ে নিয়ে চলেছে পুরী-কচৌরি-মিঠাই! গাইঘাটে এক-একটা ষাঁড় ধরে শেঠগিন্নী সেই সব সুখাদ্য জোর করে তার মুখ ব্যাদান করে পুরে দিচ্ছেন। এর নাম গো-ভোজন। অতীব পুণ্যকর্ম। স্বর্গ-কি-পৌরী মানে স্বর্গের সিঁড়ি তাতে তৈরি হয় নিশ্চিত।

আবার ভোলাগিরি আশ্রমে দেখতাম বিশাল এক পেতলের পরাতে অন্তত বিশ জনের মতো ঘি-ভাত, তরকারি, রাবড়ি, মালাই, বরফি ভর্তি করে 'জয় গঙ্গাজি' বলে নিবেদন করা হতো গঙ্গাগর্ভে! আজব দৃশ্য। তা ছাড়া যত পুণ্যার্থী ভ্রমণকারী দৈনিক আসেন তাঁরা সকলেই 'জয় গঙ্গাজি' বলে গঙ্গায় মুদ্রা ফেলেন ভক্তিভরে। গঙ্গাদেবীর এমন অর্থকরী নৈবেদ্য দেখলে চোখ চিক চিক করে। আমাদের দেশে খুচরো পয়সা যে এতটা অমিল হয়েছিল তার অতল অনুসন্ধান হয় নি।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা দেখে অবাক হতাম তা এই যে, সমগ্র হরিদ্বার আর তার আশপাশের মানুষজন বেঁচে আছে শুধু ধর্মের ওপর ভর ক'রে। অবশ্য সেই ধর্মের সূত্রে জাঁকিয়ে উঠেছে ব্যবসাও। পুণ্যার্থীরাই সেখানে ক্রেতা। দেখতে যাচ্ছে গঙ্গা কিন্তু কিনে ফিরছে কম্বল—এ যেন সুকুমার রায়ের ননসেন্স কবিতা।

সকাল, মানে অতি ভোরে সব কটা মন্দির আর দেবস্থানে বেজে ওঠে ঘণ্টা ও শঙ্খ। সেই সঙ্গে মাইকে উচ্চারিত হয় শ্লোক আর মন্ত্র। সারা শহরে ধূপের গন্ধ

ম ম করছে। সবাই পুণ্যকামী, সবাই ধর্মার্থী, সবাই সাধুতার অভিমানী। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে পুণ্য স্নান আর দান। স্তবপাঠ আর ভজনের আসর। যতত্র শাস্ত্রপাঠ আর পূজার নৈবেদ্য। ফুলের নির্মাল্য আর মিষ্টান্নপ্রসাদ। সেইসঙ্গে ইতিউতি মহেন্দ্র কাপুরের কণ্ঠে গঙ্গাস্তোত্রের ক্যাসেট বাদন। কেবল টাঙ্গা গাড়ির মনুষ্যেতর বাহক অশ্ববাহিনীর উৎকট মূত্রগন্ধ আর কুষ্ঠ রোগীদের ধারাবাহিক উপস্থিতি একটু রসাভাস ঘটায় এই যা। তবে সব রকমের বেমানান মানিয়ে যায় বহতা গঙ্গা আর রমতা সাধুদের দেখলে। এত সাধু? এত আশ্রম? সমাজে এত পরজীবীদের ঝাড়?

সাধুসন্নেসী দেখলেই আমার শরদিন্দু বাঁড়ুজ্যের সেই গল্পটা মনে পড়ে। খবরের কাগজে ছোট্ট একটা খবর পড়ছিলেন বেনারসের এক বৃদ্ধ বাঙালি সাধু।



খবরে প্রকাশ অমুক জেলার অমুক শহরের শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী দেহ রেখেছেন। সাধু সহর্ষে বললেন, 'যাক্ মাগী এতদিনে মরেছে। এবারে বাড়ি ফেরা যেতে পারে তা হ'লে।' গল্পের শেষে শরদিন্দুর চুটকি: 'ভারতের বিভিন্ন

স্থানে যে অসংখ্য সাধু আছেন, তাঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।'

শুধু বউ-খেদানো পুরুষ নয়। অনেক পলাতক আসামী, ঘরপালানো ছোঁড়া, স্বদেশী আমলের সন্ত্রাসবাদী, সাধু হয়ে লুকিয়ে আছেন উত্তরভারতে। তবে বাঙালি ব্রেন প্রবাসেও সক্রিয়। দেরাদুনে গেলে 'টপকেশ্বর' বলে এক গুহায় নিয়ে যায় টাঙাওয়ালা। সারা বছর সে গুহায় বরফের স্তর জমে থাকে আর টপ টপ করে একেক বিন্দু জল হয়ে ঝরে। তাই নাম টপকেশ্বর। সন্দেহ করলাম নিশ্চয়ই নামটা বাঙালির ব্রেন-চাইল্ড। ঠিক তাই। টপকেশ্বরের সন্ন্যেসী একজন পলাতক বাঙালি রাজবন্দী। সেই ইংরেজ আমল থেকে ঐ গুহায় থানা গেড়েছেন। বাবা টপকেশ্বরের দৌলতে যাত্রী আর নৈবেদ্যর অভাব নেই। একেই বলে রেকারিং ডিপোজিট ভাঙ্গিয়ে খাওয়া।

মনে আছে, বছর বিশেক আগে কংগ্রেস আমলে রাইটার্স বিল্ডিংস-এর শিক্ষাদপ্তরে ডি. পি. আই অফিসে একজন পদস্থ অফিসার তাঁর ঘরের পর্দার তলার দিকে একাধিক গেরুয়া লুঙ্গির অধোদেশ আর গেরুয়া ক্যাম্বিশের জুতার ঘোরা-ফেরা দেখে বলে উঠলেন, 'এই-রে সেরেচে।'

'কী হলো?' আমার সকাতর জিজ্ঞাসার জবাবে অফিসার বললেন, 'বুঝলেন না? তদ্বিরানন্দের দল এসে গেছেন।'

আমি তো অবাক! গেরুয়াধারী সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের কিনা তদ্বিরানন্দ বলা!

অথচ রাগ করতেও পারি না। সচল জীবনস্রোত আর মানুষের বিচিত্র সব দৃষ্টিভঙ্গি। আমারটাই যে সঠিক তা কে বলতে পারে? তবে সৃজনশীল মানব-স্বভাবকে কুর্নিস করতেই হয়। তাই তদ্বিরানন্দ শুনে গোঁসা করবার বদলে হো হো করে হেসে উঠি। এইরকম হেসেছিলাম যেবার হাওড়ার ডোমজুড় হয়ে হাই রোডে পড়তেই একটা মন্দির দেখলাম লেখা রয়েছে 'শ্রীশ্রী৺হাইরোডেশ্বর'। হাইরোডেশ্বর? তিনি শিব না শনি? মূর্তি দেখে ঠাওর হ'লো না। তাই নিয়ে একটু বেয়াড়া রসিকতা করেছি কি করিনি, ব্যাস, গাড়ির চাকা পাংচার। দেবতা নিয়ে রসিকতা? ফলং চাকা ফাটিতং। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অর্থদণ্ড দিয়ে গাড়ি যখন আবার চালু হ'লে আমি বললাম, 'শনি কি শম্ভু এখনও জানি না, তবে জয় বাবা হাইরোডেশ্বর।'

কিন্তু কথায় কথায় হরিদ্বার থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। কাজেই আবার

ফিরে যাই সেখানে। সেবার কনখলের এক পথের পাশে ব'সে নানা বর্গের রমতা সাধু দেখে বিস্ময় পোহাচ্ছি এমন সময় সাদা দাড়ি-গোঁফঅলা প্রসন্ন বয়ান এক সন্ন্যাসী সটান আমার পাশেই এসে বসলেন। সম্ভ্রম সহকারে স'রে তাঁকে বসতে দিতেই বললেন, 'আহা অত উতলা হবার কি আছে ?'

: আপনি বাঙালি ?

: হ্যাঁ, কেন এমন চিমড়ে চেহারা বাঙালি সাধু ছাড়া আর কার হবে ? উত্তর-ভারতের খাঁটি শৈব সাধু দেখছেন না সব ? ইয়া সব ঘিউ-দুধ-মাখখ্‌ন সাঁটানো চেহারা আর সব ভুঁড়িভাসানো রূপ।

দ্যাখো কাণ্ড ! যেমন আমার কপাল ! ধর্মস্থানে এসেও জুটে গেল একজন কিনা জলজ্যান্ত প্রতিবাদী সাধু। প্রতিবাদী না আত্মসমালোচক ?

ভাববার অবকাশ না দিয়েই (তখনও সাধুর নামটাই জানি না) সাধু বললেন, 'এত সাধুসন্ন্যেসী কেন বলুন তো ?'

আমার শরদিন্দুবাবুর গল্পটা মনে এসে গিয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গাম্ভীর্য সহকারে বললাম, 'কি করে আমি বলবো ? বরং আপনিই বলুন।'

'তা হলে শুনুন', সাধু বললেন, 'এ গল্প আমি একবার বলেছিলাম নৈমিষারণ্যে থাকতে প্রবচন করতে গিয়ে।'

: নৈমিষারণ্যে কেন ?

: ও গোড়ার কথাটাই তো বলা হয়নি। আরে মশাই, আমি পান্নাবাবুর আর.সি.পি.আই দলে ছিলাম। সেবারকার সেই ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা মনে আছে ? তাতে আমার নামে ওয়ারেন্ট হয়। আমি পালিয়ে নৈমিষারণ্যে এসে সাধু বনে যাই। এখন অবশ্য আর সেই ওয়ারেন্ট নেই কিন্তু এ ধারে জড়িয়ে পড়েছি।

: আগে কি করতেন কলকাতায় ? কি নাম ?

: ধুর মশাই, সাধু কি পূর্বাশ্রমের পরিচয় দেয় ? তবে এখনকার নামটা বলতে পারি। চিমড়ে চেহারা কিন্তু খুব গালভরা নাম : স্বামী স্বপনানন্দ। থাকি হরিদ্বারের কৈবল্য আশ্রমে। আসবেন একদিন। জমবে ভালো।

: কিন্তু নৈমিষারণ্যের প্রবচনের কথা বলছিলেন যে !

: হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তো আসল কথা। কথা হচ্ছিল এত সাধু কেন ? এরা আসেই বা কোথা থেকে ? সেবার নৈমিষারণ্যে সাধুদের সামনে প্রবচন করতে করতে কথাটা বোঝাতে গিয়ে একটা গল্প বানিয়েছিলাম। সেটাই বলি আপনাকে।

আমি ভবিষ্যযুক্ত হয়ে বসি। কার্তিক শেষ হবো-হবো। তার মানে হরিদ্বারে বেশ হিমেল ভাব। নাম-না-জানা বড় বড় গাছ। তিরতির করে ঠাণ্ডা নামছে। স্বপনানন্দ মুখখানা ঠাট্টায় ভ'রে বলেন, 'রাবণ যখন সীতাহরণ করেন তখন কীসের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন জানেন?'

: হ্যাঁ। রাবণ নিয়েছিলেন সন্ন্যাসীর বেশ।

: ঠিক। নিয়েছিলেন সন্ন্যেসীর বেশ। সীতা তাই তাঁকে চিনতে পারেনি রাবণ ব'লে। সন্ন্যেসীর বেশ দেখে সন্দেহও জাগেনি। কিন্তু ঘটলো সেটাই অর্থাৎ সন্ন্যেসী সেজে প্রতারণা। কাজটা কি ভালো?

: একেবারেই নয়। সন্ন্যাসীরা যাকে বলে বিয়ণ্ড ডাউট। তাঁদের কোনো খারাপ অভিসন্ধি থাকতেই পারে না।

: পারে না তো? কিন্তু পারলো! রাবণ সীতাহরণ করলেন সন্ন্যেসীবেশে। তখন সীতার কি হলো?

: তিনি ভির্মি খেলেন। মূর্চ্ছা গেলেন।

: সেটা পরে। আগে অবাক হয়ে হলেন। পরে অনুনয় করলেন। কাঁদলেন পায়ে ধ'রে। বললেন, 'ছেড়ে দাও সন্ন্যেসী'। সন্ন্যেসী বললে, 'আমি সন্ন্যেসী নই, রাজা রাবণ।'

: তারপর?

: তারপর সীতা বললে, 'কে তুমি? রাবণরাজা? ছি ছি. তুমি আমাকে সন্ন্যেসী সেজে ধোঁকা দিলে? ছিঃ। তোমাকে আমি অভিশাপ দেবো।'

: সে কি? এসব তো রামায়ণে নেই।

: আছে। কটা রামায়ণ পড়েছেন আপনি? এ কাহিনী মৎপ্রণীত রামায়ণে আছে। যার নাম 'স্বপন রামায়ণ।'

: ও আচ্ছা। আমারই ভুল। আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল আমার। হাজার হলেও বাঙালির স্বকপোলকল্পনা। তার স্বাদই আলাদা। বলুন বলুন। স্বপনানন্দ উঠে দাঁড়ালেন নাটকীয়ভাবে। এবারে তিনি সীতা সেজে অভিশাপ দেবেন। তার আগে বললেন, 'মশাই, আসলে আপনাকে পেয়ে একটু হেসে নিচ্ছি। ঘোরতর ধর্মের মধ্যে সর্বদা গম্ভীর হয়ে বসবাস করি। কত যে হাস্যকর ব্যাপার সাধুসন্ন্যিসিদের। কিন্তু হাসা চলবে না। আমরা সব ভগবানের বাচ্চা কিনা! তাই মাঝে মাঝে হরিদ্বারের পথ ছেড়ে ঐ নীলগঙ্গার ধারে ফাঁকা জায়গায়

দাঁড়িয়ে খুব হাসি। একটু হাসবো? আমার খুব হাসি পেয়েছে। হাসবো? হো হো হো হো…'

বহুবিস্তৃত শিবালিক রেনৃজ ধরে স্বপনানন্দের হাসি নয় অট্টহাসি যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকলো। মানুষটা পাগল নাকি? শুনেছি হটযোগে ভুল প্রক্রিয়া থেকে নাকি বায়ু কুপিত হয়।

আমার মুখে আশঙ্কা আর আতঙ্ক দেখে স্বপনানন্দ থামলেন। তবে সেই রকম নাটুকে ভঙ্গিতে আমার দিকে আঙুল তুলে বলতে লাগলেন, 'রাবণ, আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমাকে। তুমি সাধু-সন্ন্যিসির নামে কলঙ্ক লেপেছো। তোমার নিষ্কৃতি নেই।'

আমি ঘটনাচক্রে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললাম, 'কি অভিশাপ দেবী? আরো কোন্ সর্বনাশ আমার বংশে আসন্ন?'

স্বপনানন্দ বললেন, 'অরে অরে দুরাচারী রাবণ। জানিস আমি কে? আমি জনকর্নান্দনী সীতা, রঘুবংশের বধূ, আমার স্বামী আর্যপুত্র রাম। আমি অভিশাপ দিনু তোরে, যে সাধুসন্ন্যিসির বেশ ধ'রে আমাকে ধোঁকা দিলি, তোর বংশের সক্কলে সেই সন্ন্যিসির বেশে কলিকালে দেখা দেবে।'

আমি আনন্দে গদগদ হয়ে স্বপনানন্দের হাত ধ'রে বললাম 'বহুৎ আচ্ছা। জব্বর গল্প। ধন্য আমি।'

স্বপনানন্দ আসন পরিগ্রহ করে বললেন, 'এবার বুঝলেন তো কেন এত সাধু-সন্ন্যেসী?'

: খুব বুঝেছি। কিন্তু এই স্বপন-রামায়ণ শুনে নৈমিষারণ্যের সাধুরা চিমটে নিয়ে তেড়ে এলো না?

: কি করে আসবে? সব যে টিকি বাঁধা আমার কাছে। বেশির ভাগই মূর্খ। আমি যে তাদের চিঠি লিখে দেবার একমাত্র পড়ালিখা-জানা সাধু।

আমি বললাম, 'ঐ চিঠি লেখার ব্যাপারটা একটু খোলসা করুন।'

স্বপনানন্দ বললেন, 'বুঝলেন না? আগে তা হলে বুঝুন, সাধু থাকলেই শিষ্য থাকবে। কেন? না সাধুরা হলো ভগবানের এজেন্ট। আগুন জ্বাললেই যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা আসে সাধু থাকলেই শিষ্য আসবে। এই শিষ্যরা অনবরত সংসারে পাপতাপ করছে আর তার থেকে বাঁচবার জন্যে সাধু পাকড়ে তাকে ভেট চরাচ্ছে।'

: এর সঙ্গে চিঠির সম্পর্ক কি?

: সেইটাই হলো সহি বাত। সাধুরা মাঝে মাঝে শিষ্যকে খৎ, মানে চিঠি লিখে কুশল নেয়, তার পরে লেখে এবারে জব্বর ঠাণ্ডা পড়বে তুমি তুরন্ত গোটা চারেক কম্বল দান করো তোমার গুরুমহারাজকে. অওর দো চাদর দো পুলওভার।

: কেন? ওসব নেই তাদের?

: থাকলেই বা! আরও পেতে আপত্তি কোথায়? এবারে বুঝেছেন হরিদ্বারে কম্বল চাদর কেন এত সস্তা?

: তার মানে? আপনি কি বলতে চান···

: আমি বলতে চাই এই ভাবেই প্রত্যেক শীতের আগে সাধুসন্ন্যেসীরা দশবিশটা কম্বল চাদর জোগাড় করে। তাদের সঙ্গে হরিদ্বার মার্কেটের যোগ আছে। সেখানে বেচে দেয়। অবশ্য শুধু কম্বল চাদর নয়।

: আর কি কি?

: যেমন ধরুন ময়দা সুজি ঘিউ।

: সে কি? সাধুরা আশ্রমে খেতে পান না?

: ধুস্। আশ্রমে তো ডাল রুটি অউর জিলাবি কিংবা পুরি-তরকারি। তাতে অমন ভুঁড়ি ধসকে যাবে যে! এখানে এসব স্বাস্থ্যকর জায়গায় ঘড়ি-ঘড়ি খিদে পায় তা জানেন তো? সেইজন্যেই সাধুদের সব প্রাইভেট অ্যারেঞ্জমেণ্ট রাখতে হয়। আসবেন একদিন আমার চিড়িয়াখানায় দেখাবো সব।

: চিড়িয়াখানা মানে?

: কেন? সাধুদের চিড়িয়াখানা বুঝলেন না? সাধুরা এক একখানা চিড়িয়া জানেন তো? একদিন খুব ভোরে, ধরুন পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় চলে আসবেন। শোনাবো!

: শোনাবো মানে? চিড়িয়ার কিচিমিচি?

: না, সাধুদের বন্ধ ঘরের মধ্যে স্টোভের ঘরর্ ঘরর্ শব্দ। তার মানে উত্তম ঘিউ সহযোগে লুচি হালুয়া বানাচ্ছেন সাধুবাবা। পহেলা ভোজন পিছে ভজন। হো হো হো হো। তবে শুধু শুধু নিন্দে করবো না, আমাকেও মাঝে মাঝে কুঠরিতে ডেকে ভাগ দেয়। কেন? ঐ যে বললাম আমাকে দিয়ে খৎ লিখিয়ে শিষ্যদের পাঠায়। দামী দামী শিষ্য, ইংরাজিতে চিঠি লিখে ইম্প্রেস করতে হয় মশাই। গাড়ি চড়ে শিষ্য-শিষ্যারা গুরুজিকে সেবা চড়াতে আসে। আমি তখন নীলগঙ্গার ধারে এসে ফাঁকা জায়গা খুঁজি। তা আপনি কবে আসছেন চিড়িয়াখানায়?

কালই চলে আসুন দুপুরে। নিরিবিলিতে সাধুদর্শন হবে। জানেন তো সাধু-দর্শনেও বহোত পুণ্য। হো হো হো।

যেন শিবালিক রেন্‌জ্‌ আরেকবার কেঁপে উঠলো।

সত্যিসত্যিই ঠিক পরদিন গেলাম কৈবল্য আশ্রমে। শেষ কার্তিকের ঝিমন্ত দুপুর। একটা বিরাট মহানিম গাছের তলায় হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে ব'সে ছিলেন স্বপনানন্দ। প্রসন্ন হেসে আপ্যায়ন করে বললেন, 'আসুন আসুন। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই। ডাক সংস্করণের বাংলা কাগজ পড়ি এ সময়ে।'

'আশ্রম যে একেবারে সুনসান দেখছি', আমি জানতে চাইলাম।

'সাধুদের এখন বিশ্রামের সময়। কটা বাজে? দুটো? তিনটের পর সব উঠে পড়বে। সব চেয়ে আগে উঠবে কম্বলানন্দ তারপরে ভ্রমণানন্দ', বললেন সাধু।

ঠিক যেন পরশুরামের কোনো আজব গল্পের নাট্যরূপ শুনছি। অবাক হয়েই তাই বললাম, 'কম্বলানন্দ কিংবা ভ্রমণানন্দ কি সাধুদের নাম হতে পারে?'

: না না, ও তো আমার দেওয়া নাম। কম্বলানন্দ ভালোবাসেন কম্বল। ঐ দেখুন ঐ বেড়ার গায়ে সারে-সারে দশখানা নানারকম কম্বল রোদে মেলা রয়েছে। কম্বলানন্দের কারবার। রোজ নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করে আর হাত বুলোয়। তাই নাম দিয়েছি কম্বলানন্দ।

: আর ভ্রমণানন্দ?

: শুনেই বুঝছেন, খুব হাঁটতে ভালোবাসে। তিনটে বাজবে আর চা খেয়ে গেরুয়া কেডস প'রে হাঁটতে বেরোবে। সেই কাঁহা কাঁহা পথ। হৃষীকেশের রাস্তা ধরে কিংবা ঐ নীলগঙ্গা ছাড়িয়ে, কোনদিন বা চলে গেল কনখল ছাড়িয়ে জ্বালা-পুরের রাস্তায়। বোধ হয় গাঁধীর সঙ্গে ডাণ্ডি অভিযানে ছিল, কি বলেন?

হেসে জিগ্যেস করলাম, 'আপনার জানা সাধু-সন্ন্যাসী সকলেই কি একটু অদ্ভুত কিংবা খ্যাপাটে? ব্যাপারস্যাপার শুনে আমার তো ইচ্ছে করছে আপনার একটা নতুন নামকরণ করতে।'

: কী রকম সে নাম?

: অপ্রিয়সত্যানন্দ।

: বেশ বলেছেন। তবে কথা হচ্ছে ভালো সাধুও অনেক আছেন। এমনকি এখানে এই চিড়িয়াখানাতেও আছেন। তাঁরা থাকেন প্রচ্ছন্ন হয়ে, ভজন কুটিরে। সদা আত্মস্থ ধ্যানী। জানেন তো নিষ্ঠা তিনরকম—মন্ত্রনিষ্ঠা, গুরুনিষ্ঠা, ইষ্টনিষ্ঠা। যে-কোনো একরকম নিষ্ঠার পথেই সিদ্ধি আসতে পারে। তবে এখানকার

চিড়িয়াগুলোই ঝামেলা পাকায় আর কি। কেউ ভ্রমণনিষ্ঠ, কেউ ভোজননিষ্ঠ, কেউ কম্বলনিষ্ঠ। আর বেশির ভাগই শিষ্যনিষ্ঠ।

: সেটা কেমন ?

: এই যেমন ধরুন সাধুবাবা পথে পথে ঘুরছেন। হঠাৎ দেখলেন একটি নতুন পরিবার পুণ্যার্জনে এসেছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে শাঁসালো পার্টি। তারা সাধু দেখেই করলো দণ্ডবত। পরিবারের কর্তাটিকে সাধু তখন বেছে নিয়ে বলবে : 'আরে বেটা, পরলোক অউর পরমাত্মাকে লিয়ে কুছ তো কোরনে হোগা জরুর !' অর্থাৎ শিষ্য হও। ব্যস, একবার শিষ্য হলেই কামাল কর দিয়া। কম্বল ভেজো গুরুকে, ঘিউ অউর মেওয়া। 'গুরু কৌন্ হ্যায় তুম সমঝা ? তব শুনো। গুরু হ্যায় মোক্স্কা কাণ্ডারী। গুরুহি সাক্সাৎ ব্রহ্ম'।

আমি বললাম, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু শিষ্যরা সাধুদের নানা শীতবস্ত্র ঘি ময়দা মেওয়া সব যে উজাড় করে দেয় তার কারণ কি ? আপনিই তো বলেন নাইন্টি পারসেন্ট সাধুই নাকি গো-মুখ্যু। তবে ?'

: এর কারণ খুব সহজ। শিষ্যদের মধ্যে আবার নাইন্টি পারসেন্ট হ'লো জোচ্চর, ভণ্ড, ঘুষখোর আর চোরাকারবারী। তারা জানে একজন গুরু পাকড়ে সেবা করলেই সব পাপ ধুয়ে যাবে। আরে মশাই 'গুরু' কথার মানে বোঝেন ? চল্তি কথায় বলে 'গু' মানে অন্ধকার 'রু' মানে আলো। যিনি অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে আলোর ইশারা দেন। আর কথাটার মৎকৃত ব্যাখ্যা বা স্বপন-ভাষ্য হলো শিষ্যর ব্ল্যাক মানিকে যে হোয়াইট করে সেই গুরু। উঁহু হাসবেন না। চুউপ। এটা আশ্রম। ঐ দেখুন সাধুরা ঘর থেকে বেরোচ্ছে। এখন টি-টাইম।

আশ্রমেও আবার টি-টাইম থাকে জানতাম না। যাই হোক, দেখতে লাগলাম ছোট ছোট কুঠুরি থেকে তামার গেলাস হাতে একেক জন সাধু বেরিয়ে খুব মৌজ করে চা পান করছেন। আমার আর স্বপনানন্দের চা জুটলো। বোঝাই যাচ্ছে এখানে স্বপনানন্দের আলাদা খাতির। কেননা চা তাঁর কাছে এলো।

এবারে দেখা গেল কম্বলানন্দকে। বেড়ার গা থেকে এক ডাঁই কম্বল তুলে ঘরে ঢুকলেন। তারপরে লম্বা লম্বা পা ফেলে যিনি প্রসন্ন মুখে আশ্রম থেকে পথে পা দিলেন আমি বুঝে নিলাম তিনিই ভ্রমণানন্দ। আরেকজন চুপচাপ বসে রইলেন আশ্রম চত্বরে। কানে ফিসফিস করে বললেন স্বপনানন্দ : 'উনি নীরবানন্দ'।

এইভাবেই দেখা গেল হাস্যানন্দকে, যিনি আপনমনে ফিক ফিক ক'রে কেবল

হাসেন ! নাঙ্গা-গা ল্যাঙ্গট পরা কুৎসিতানন্দ কিংবা সদাই চোখ-পাকানো রুষ্টানন্দ এক একটা আর্কিটাইপ। কিন্তু যিনি শনৈঃ শনৈঃ আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে চাইছিলেন তিনি কি সন্দেহানন্দ ? জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল : 'উনি অসূয়ানন্দ। এই যে আপনাতে-আমাতে খোস গল্প করছি তাই দেখে ওঁর হিংসে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'এই আশ্রমের সব বেয়াড়া সাধুরই কি নামকরণ সাঙ্গ করে ফেলেছেন নাকি ?

'না রে মশাই' সাধু বললেন, 'নিত্যি নতুন সাধুর আমদানি। বহুদিন অবজারভেসনে রাখতে হয়, তবে নামকরণ।'

: নামকরণ তো সোজা। স্বভাব বা ক্রিয়ার সঙ্গে একটা আনন্দ সন্ধি করে দিলেই মিটে গেল। কেবল একটা ন্দ-য়ের ব্যাপার বৈ তো নয়।

: অত সোজা নয়। ব্যঞ্জন সন্ধিতে স্ট্রং হওয়া দরকার। বলুন তো 'মুখখিস্তি করে আনন্দ যার' কি হবে ?

: এটা তো সন্ধি নয়, সমাস।

: আহা, সন্ধি বিচ্ছেদই করুন না মশাই।

: কঠিন। তবে পারবো। মুখখিস্ত্যানন্দ।

: উফ বাঁচালেন। আমিও মনে মনে ঐ রকমই মক্‌সো করে রেখেছি। এক ব্যাটার নাম দিতে হবে।

হাল্‌কা চালের কথা ছেড়ে এবারে আমি জিজ্ঞাসু হই। বুঝতে বাকি থাকে না যে স্বপনানন্দ আসলে পরিহাসের আড়ালে নিজেকেই প্রচ্ছন্ন রাখেন। সত্যি-কারের তত্ত্বজ্ঞানী। নইলে এতবড় কৈবল্য আশ্রমে ওঁর যা মান্যতা সে কি নিছক কটা চিঠি লিখে দেন ব'লে ? তা হতেই পারে না। সত্যি কথা বলতে কি, সাধু-সমাজ সম্পর্কে আমরা অল্পই জানি। কুম্ভমেলা বা গঙ্গাসাগরে সাধু সমাবেশের খবর বা ফটো দেখি মাঝে মাঝে। জানা যায় তাদের অপ্রতিহত প্রভাবের কথা। সাংবাদিকদের ঝলক-প্রতিবেদন থেকে এমনও শোনা যায় যে, সাধুরা নাকি খুব বিলাসী হয়ে পড়েছেন আজকাল। কুম্ভমেলা গঙ্গাসাগরে তাঁদের ক্যাম্পে নাকি স্টিরিও টু-ইন-ওয়ান থাকে। তাঁরা বসে থাকেন ডানলোপিলো গদিতে। দু-একজন বিদেশিনী শিষ্যাও দেখা যায়। বেশির ভাগ সাধুই নাকি কর্কশ পরুষ-ভাষী।

আসলে সাধুসন্ন্যেসীদের নিয়ে কোনো সমাজবিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা হয় না, কেননা তাঁদের সমাজপ্রবাহের মূল স্রোতের বাইরে আমরা রেখে দিয়েছি।

আমরা মানুষকে ভাবতে চাই তিনভাবে—সামাজিক, অসামাজিক, সমাজবিরোধী। সাধুরা এই তিন বৃত্তের বাইরের স্তরে থাকেন। তাঁদের নাকি কোনো ঐহিক বাসনা নেই, ভোগস্পৃহা নেই, উচ্চাশা নেই। অথচ উল্টোটাও তো অনবরত দেখি। তবে কি তাঁরা বৃহত্তর সমাজের আনুকূল্যে একরকম গা-ভাসানো জীবন-প্রণালী পেয়ে গেছেন? সবাই নিশ্চয়ই পরজীবী নন তাঁরা। সর্বস্বত্যাগী নগ্ন গুহাবাসী সাধুও অনেক আছেন বৈকি। তবু সুবিধাভোগী সাধুও কম নেই। খাওয়া দাওয়ার ভাবনা নেই, সন্তান পালনের দায় নেই, স্পষ্ট কোনো সামাজিক কর্তব্য বা কষ্টও নেই। ভক্তিমান ভারতীয় সমাজ সুদীর্ঘকাল এদের জীবনযাপনের দায় নিয়েছেন। তবু এটা ঠিক যে সন্ন্যাস আগে ছিল একটা ব্রত, এখন অনেকে বলেন সাধুগিরি। 'গিরি' একটা পার্সী প্রত্যয়। বাবুগিরি, মিস্ত্রিগিরি, দালালগিরির পাশে সন্ন্যাসীগিরি কথাটা খাপ খায় কি?

স্বপনানন্দ আমার ভাবনার কথাটা বুঝে বলেন, 'সকলেই সাধু নয়, কেউ কেউ সাধু। আপনাদের ঠিকে ভুল হয় এই জায়গাটায়। প্রকৃত সাধু হঠাৎ পাবেন না দেখতে। তাঁরা মৃগেল মাছের মতো জলের গভীরে পাঁকে থাকেন। কেবল ওপরের সমাজে তাঁদের ফুটটুকু এসে পৌঁছোয়। আর সদা সর্বদাই আমাদের মতো যত শফরী ফরফরায়তে দেখছেন সবই হয় ভণ্ড, নয় অর্গানাইজার, নয় প্রচ্ছন্ন-ভোগী। গেরুয়া হ'লো একটা ইণ্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট আর কমণ্ডলু হলো পরজীবী পরিশ্রমহীন জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

: তা হ'লে বলতে চান, সন্ন্যাস এখন আর নিবৃত্তিমার্গ নয়?

: সন্ন্যাস তো নিশ্চয়ই নিবৃত্তিমার্গ কিন্তু সৎ সন্ন্যাসীর চেয়ে ভেজাল সন্ন্যাসী এখন সংখ্যায় বেশি। তাই সন্ন্যেসিগিরি এখন স্রেফ একটা প্রোফেসন। কমণ্ডলু বড় সর্বনেশে বস্তু মশাই। একবার যে কমণ্ডলু থেকে খাবার অভ্যেস করেছে তাকে আর জীবনে কিছু ক'রে খেতে হবে না।

: কিন্তু কমণ্ডলু থেকে খাওয়া বলতে কি বুঝছেন? কমণ্ডলু তো পেতলের তৈরি একটা ছোট্ট জিনিস। তাতে জল থাকে।

: ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সাধুর কমণ্ডলু বলতে বোঝায় কাঠের তৈরি একটা বড় কন্‌টেনার। সেইটে হাতে ঝুলিয়ে সাধু-সন্ন্যেসীরা মাধুকরী করে। তাতেই ভোজ্যদ্রব্য ভ'রে দেয় শিষ্য বা ভক্তিমান গৃহীজন। আপনি সেই সাধু আর কমণ্ডলুর গল্প শোনেন নি বুঝি?

আমার বিস্মিত মুখ দেখে স্বপনানন্দ বললেন, 'বিকেল ফুরিয়ে এলো। এখনই

সন্ধ্যারতির ডাক আসবে। তার আগে গল্পটা বলে নিই শুনুন। ঘটনাস্থল রাজস্থানের এক জনপদ। দুপুরে বারোটা নাগাদ সুনসান পথ দিয়ে চলেছেন এক সাধু কমণ্ডলু হাতে। তার মানে মাধুকরী ব্রত তাঁর। এখন এক মাড়োয়ারী শেঠগিন্নি সকাল থেকে সঙ্কল্প ক'রে জানলায় ব'সে আছেন সাধুসেবা করাবেন বলে। সাধু আর তাঁর চোখে পড়ে না। এমন সময় হঠাৎ আমাদের গল্পের এই সাধু চলেছেন। তাড়াতাড়ি শেঠগিন্নি চাকরকে দিয়ে সাধুকে ডাকেন। তারপর মনের আনন্দে তাঁর কমণ্ডলু ভরে দেন পুরি-হালুয়া-মিঠাই-রাবড়ি। সাধুকে গড় হয়ে প্রণাম ক'রে বলেন তাঁর বাগানের চত্বরে বসেই সেবা লাগাতে। সাধু বলেন, ভজন ভোজন আর শয়ন সকলের সামনে করতে নেই। নিজের ডেরায় ফিরে সেবা করবেন।

: তার পর ?

: তার পর সাধুর মনে তো খুব খোস। কমণ্ডলু-ভরা অজস্র ভালো খাবার। ডেরায় ফেরার পথে এক জলাশয় দেখে ভাবলেন আরেকবার স্নান সেরে নেওয়া যাক। জানেন তো রাজস্থান খুব রুখু জায়গা। সেই কোন্ ভোরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্নান করেছেন। রোদের তাতে শরীর জ্বলতে লেগেছে। সাধু তাই করলেন কি, কমণ্ডলুর হ্যাণ্ডেলটা এক গাছের শাখায় টাঙিয়ে দিলেন। কেন বলুন তো ?

: কাক চিল কুকুর মুখ দিতে পারে মাটিতে রাখলে

: ঠিক বলেছেন। তা সাধু মনের আনন্দে স্নান করছেন শ্লোক আউড়ে। এমন সময় একটা···

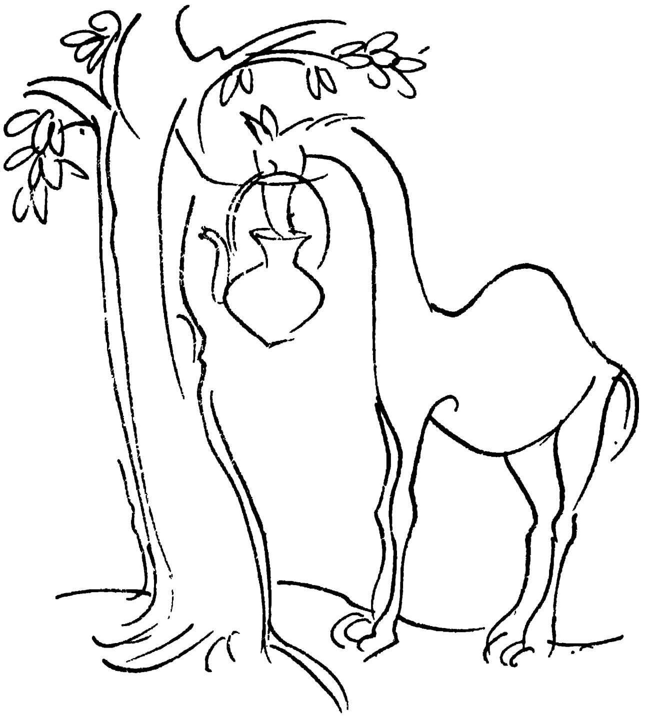
'কি কি ? কাক-চিল-কুকুর তো আসতে পারে না', আমি বললাম।

'জায়গাটা রাজস্থান খেয়াল রাখবেন। অতএব উট। জলাশয়ের একধারে একজন ধোপা কাপড় কাচছিল, উটটা তার কাপড়ের মোট বয়।' স্বপনানন্দ খুব জমিয়ে বলতে লাগলেন, 'এখন সেই উট রমতা সাধুর মতো আপনমনে ঘুরতে ঘুরতে সেই গাছটার কাছে এসেছে যেখানে এক-কমণ্ডলু খাবার আর ফল উপচে পড়ছে। কেউই খেয়াল করেনি। হঠাৎ সাধু গা মুছতে মুছতে দেখেন উট তাঁর কমণ্ডলুর খাবার খাচ্ছে। হৈ হৈ করে ছুটে এলেন। স্নানার্থী দুয়েক জনও রে রে করে ধেয়ে এলো। ধোপাও ছুটে এলো কাপড়-টাঙানো বাঁশের খোঁটা হাতে।'

: তার পর ?

: তার পর কথা নেই বার্তা নেই ধোপা উটটাকে বেদম পেটাতে লাগল সেই বাঁশের খোঁটা দিয়ে। 'আহাহা করো কি করো কি থামো থামো' সবাই বললে।

কারুর কথা কানে নেয় না ধোপা। পেটাতে পেটাতে একেবারে রক্তগঙ্গা। তখন এমনকি সাধু এসে চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'আরে রোখো রোখো। করছো কি!



অবোলা জীব হত্যা করবে নাকি? ও কি জানে যে সাধুর কমণ্ডলুতে মুখ দিতে নেই?' ধোপা তখন ক্ষান্ত হলো, ঘাম মুছলো গামছা দিয়ে। তার পর কি বললো জানেন? বললো, 'সাধুজি সেজন্যে ওকে আমি মারি নি। কেন মারলাম জানেন? ওকে তো আমি কাপড়ের মোট বইবার জন্যে কিনেছি। কিন্তু এই যে আজ ব্যাটা কমণ্ডলু থেকে খাওয়ার অভ্যেস করলো আর কি ও কাজ করবে? তাই মনের দুঃখে মারছি। আমি গরিব লোক, আমার উটটাও সাধুদের মতো হয়ে গেল। হায় হায়।'

আশ্রম থেকে বেরোতে পা বাড়িয়েছি। স্বপনানন্দ বললেন, 'কোথায় চললেন,?' আমি বললাম, 'নীলগঙ্গার ধারে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজতে।'

মফঃস্বলে ফুলস্ক্যাপ সাইজের চার পৃষ্ঠার এক রকম পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্র বের হয়। জেলা তথ্য বিভাগ এদের সরকারি বিজ্ঞাপন দেন। আদালত দেয় নীলাম ইস্তাহারের বিজ্ঞপ্তি। এছাড়া থাকে নানা ধরনের কৃষিবীজ, কীটনাশক ও সারের বিজ্ঞাপন। এই-সব সূত্র থেকে যে টাকা জোটে তাতে নির্ভর ক'রে মোটামুটি কাগজগুলি চলে যায়। গ্রাম গ্রামান্তরের কিছু কিছু খবর এমন কাগজে থাকে। যেমন ডাকাতির খবর, নারীহরণ বা হেল্‌থ্‌ সেণ্টারে অবৈধ কাণ্ডকারখানা, রাজনৈতিক নেতার আগমনসংবাদ অথবা লোকসংস্কৃতি উৎসবের ফলাও বিবরণ। এ-সব কাগজে একটা ছোটখাটো সম্পাদকীয় থাকে। তাতে অগ্রাধিকার পায় স্থানীয় সমস্যা। যথা, সড়ক ও পরিবহনের সংকট, সীমান্তে চোরাচালানি, মস্তানি ও চুল্লুবিরোধী মনোভাব, শস্যহানি ও পশুখাদ্যের সমস্যা এমনকি পঞ্চায়েতে শাসকদলের ব্যর্থতাও। আমি অবশ্য লোমহর্ষক সম্পাদকীয় একটা পড়েছিলাম যা সর্বকালের রেকর্ড। তাতে বলা হয়েছিল: 'এ বছর উচ্ছের বাজার দর খুব উঠিয়াছে। যাহারা উচ্ছের চাষ করিয়াছিল তাহাদের বিলক্ষণ লাভ হইল।'

যাই হোক, খুব একটা অবজ্ঞার মনোভাব না রেখে কাগজগুলি পড়লে হঠাৎ-হঠাৎ একটা-দুটো চমৎকার সংবাদ মেলে বৈকি। যেমন সেবার আগস্ট মাসে 'নদীয়া বাজার' কাগজে একটা খবর ছিল যার সার কথা হলো: চারাতলা নামে এক মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামে মাত্র এক ঘর হিন্দু ছিল। সেই হিন্দু পরিবারের কর্তা হঠাৎ মারা গেলে গ্রামবাসী মুসলমানরা ম্যাটাডোর ভ্যানে ক'রে তার মৃতদেহ হরিধ্বনি দিয়ে নবদ্বীপ ঘাটে নিয়ে গিয়ে দাহ করেছেন এবং নিজেরা চাঁদা তুলে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করেছেন।

খবরটা প'ড়ে চমকাতেই হয় এবং খবরের মধ্যেকার খবরগুলো জানতে মন আঁকুপাঁকু করতে থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরই তো সর্বদা খবরের কাগজে পড়ি। ধর্মসংহতির এমন চমৎকার খবর জাতীয় দৈনিকগুলিতে স্থান পায় না ভেবে ক্ষোভ হয়। কিন্তু পরের ওপর ক্ষোভ পুষে রেখে লাভ কি? বরং নিজেই যতটুকু পারি তাই করি এমন ভেবে রওনা হই চারাতলার দিকে অক্টোবরের এক সকালে। এখন পশ্চিমবঙ্গের যে-কোনো গ্রামে অচেনা-অজানা ব্যক্তির প্রবেশ খুব বিপজ্জনক এবং নিতান্ত অবাঞ্ছিত। তেমন তেমন হলে গণধোলাই ও মৃত্যু অবধারিত। এ ক্ষেত্রে তাই প্রথমে সঙ্গী জোগাড় করি সুকুমারবাবুকে। তিনি আমার এক ছাত্রীর পিতা। আসলে চারাতলা গ্রামে সুকুমারবাবুর চেনাজানা আছে। এবারে অকুতোভয়ে চারাতলা গ্রামে ঢুকে পড়ি বাস থেকে নেমে মিনিট দশেক হেঁটে।

ঐ দিগরে চারি দিকে শুধু ধু ধু করতো নাকি কেবল ঢ্যালা মাটির পতিত জমি। তার মধ্যে কেমন করে যেন জন্মেছিল এক বটের চারা। তাই থেকে নাকি চারাতলা নাম হয়েছে গ্রামের। সুকুমারবাবু ভূমিরাজস্ব আর জরীপ বিভাগের কর্মী। তাই তাঁর কাছ থেকে মৌখিকভাবেই জানা যায় : গ্রাম চারাতলা, মৌজা লক্ষ্মীগাছা, জে. এল নং ২৬। উত্তরে লক্ষ্মীগাছা, দক্ষিণে পীতাম্বরপুর, পূর্বে বৃত্তিহুদা, পশ্চিমে আড়ংসরিষা।

বাস থেকে নেমে গ্রামে যাবার হাঁটা-পথে জুটে যায় রমজান নামে একজন চাষি। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সঙ্গ নেয় আর আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি করে। প্রশ্নোত্তর হয় এবম্বিধ।

: গ্রামে মানুষ থাকে ক'ঘর ?

: আজ্ঞে তা ধরেন ৮০০ ঘর।

: তার মধ্যে হিন্দু কি একঘর শুধু ?

: জি। ঐ যিনি দেহ রাখলেন। নাম শিশির কর্মকার। তবে দু বছর আগে আরেক ঘর হিঁদু ছিলেন। তেনার নাম সত্যেনবাবু, সত্যেন পরামাণিক।

এখানে বলে রাখি, সদর শহর থেকে আসবার সময় বাসের কণ্ডাকটারকে যখন বললাম চারাতলার ঘটনা, সে বলল, 'শুনেছি'। জানতে চাইলাম, 'এ কথা কি সত্যি যে গ্রামের সবাই মুসলমান আর একঘর হিন্দু ?' কণ্ডাকটর বললে, 'নিশ্চয়ই সে জাতে কামার।' আমি বললাম, 'ঠিক তাই। কিন্তু কি করে অনুমান করলে ?' কণ্ডাকটর বললে, 'মুসলমানরা হাপর দিয়ে কামারের কাজ জানে না। অথচ কাস্তে, ছুরি-কাঁচি, দা-কুড়ুল, কোদাল, পাশি, ফাল আর গো-গাড়ির চাকার লোহা তাদের লাগবেই। তাই তাদের কাছে কামারদের খুব আদর।'

আপাতত রমজানের মুখে চারাতলার আরেক হিন্দু সত্যেন প্রামাণিকের নাম শুনে ভাবলাম তিনিও বোধ হয় জাত ব্যবসার কারণে মুসলমান সমাজে সমাদৃত। জিগ্যেস করতে সুকুমারবাবু ভুল ভাঙিয়ে বললেন : 'সত্যেন পরামাণিক নাপিত নয়, জাতে তাঁতি। ওনার ঠাকুরদাদা এসেছিলেন চারাতলায় ডাক্তারি করতে। নাম ছিল গিরিন ডাক্তার।'

আমি জানতে চাইলাম মৃত শিশির কর্মকারের বিষয়ে। রমজান বললে, 'আজ্ঞে ওনার পিতা ৺হরিদাস কর্মকার পেরথমে চারাতলা আসেন অনেক বছর আগে। জাত ব্যবসাই করতেন। শিশির কর্মকারও জাত ব্যবসা করতো তবে এ গ্রামে নয়। নিকটে আড়ংসরষে গ্রামে। মানুষটা ভালো ছিল।'

কথা এগোচ্ছে, আমরাও এগোচ্ছি শিশির কর্মকারের ভিটের দিকে। মানুষটা নাকি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। রমজান বলে, 'তেনার মরণ হলে আড়ংসর যে থেকে চারাতলা পর্যন্ত অসাগর মানুষে পথ ভরে উঠেছিল। মেয়েমানুষগুলো তো কেঁদেই সারা।'

: শিশিরবাবুর বাড়িতে আর কে আছেন ?

: আজ্ঞে, ওনার বিধবা পরিবার, নাবালক ছেলে আর মেয়ে। একটা ছেলে একটু ডাগর হয়েছে। সে বাড়িতেই এখন সারের দোকান দিয়েছে একখানা।

: শিশিরবাবুর বাবার কি নাম ছিল ?

: তেনার নাম ছিল হরিদাস কর্মকার। হুদোগ্রামের ঐ দিকে কোথায় ভিটে ছিল তাঁর ব'লে শুনেছি।

: তা এখানে চারাতলায় এলেন কেন ?

: জাত ব্যবসার সুবিধে হবে বলেই এসেছিলেন মনে লয়। তবে আরেকটা টান ছিল। এ গাঁয়ে হিঁদু-মুসলমানে মোহব্বৎ বরাবরই বেশি তো। তা বাদেও একটা বস্তু ছিল।

: সেটা কি ?

: হরিদাস কামার তো ভূতের রোজা ছিল। এ দিগরে সব গ্রামেই তেনার ডাক আসতো। কিন্তুক মারা গেলেন সেই ভূতেরই হাতে।

এতক্ষণে সেই অকৃত্রিম গ্রামবাংলা ধরা পড়ল রমজানের বাক্যে। নইলে চারাতলা ঢোকার রাস্তার দু ধারে দেখছি সুফলা ইউরিয়াসেবিত শস্যসমৃদ্ধি আর দূর থেকে কানে ভেসে আসছে শ্যালো মেসিনের ভটভটি। রমজান কিন্তু পরম উৎসাহেই বলে চলে, 'সাপের রোজা মরে সাপের দংশনে আর ভূতের রোজা মরে ভূতের হাতে, এ বাবু আমাদের গ্রামের মুখ-চল্‌তি কথা। তবে স্বচক্ষে দেখলাম আজ্ঞে হরিদাস কামারের মিত্যুতে।'

'কেমন ক'রে মোলো ?' জানতে চাইলেন সুকুমারবাবু।

'সেবার তেনার ডাক পড়লো তালুকহুদোয়। একটা সধবা মেয়েছেলেকে ভর করেছিলো এক বেহ্মদত্যি। তাকে ঝাড়াতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমনই বিস্মরণ যে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ঘরবন্ধন করে যান নি। ত্যাখন কি হলো জানেন ? বেহ্মদত্যি সধবাকে ছেড়ে দিয়ে হরিদাসের বাড়িতে ঢুকে বসলো। তার পর যেই তালুকহুদো থেকে এসে ভিটেয় পা রাখা অমনি মুখে রক্ত উঠে ত্যাখনই মিত্যু।'

'সেরিব্রাল হেমারেজ' আমি সুকুমারবাবুকে বোঝাই। ততক্ষণে চারাতলা গ্রামে ঢুকে পড়েছি। রমজান একটা দালান বাড়ি দেখিয়ে বলে, 'বাবু আমরা কিন্তুক কর্মকার বাড়ি এসে গেছি।'

উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠলাম। বাইরে থেকে ভদ্রলোক এসেছেন, কাজেই কাঁঠাল কাঠের চেয়ার পাতা হ'লো। তদ্বির করতে লাগলো শিশির কর্মকারের ছেলে শ্যামল। জানা গেল, শ্যামলের সঞ্জয় নামে এক ভাই আছে, কল্পনা নামে আছে এক বোন। আর দুই বোন মিনতি আর চিন্ময়ীর বিয়ে দিয়ে গেছেন শিশিরবাবু। পল্লীগ্রামে যেমন হয়, শহর থেকে মানুষ এসেছে খবর পেয়ে গুটি গুটি গ্রামবাসীরা জুটতে থাকে। একথা থেকে ওকথা। সুকুমারবাবু জানান আমাদের আসার উদ্দেশ্য। 'সে আর জানবার মতো এমন কি আর কথা' বেশির ভাগ মানুষেরই এই হ'লো মত। ভাবখানা যেন এই যে, মানুষ একজন মরেছে তাই গাঁয়ের সবাই মিলে তার সৎকার করেছে! এর মধ্যে হিন্দু মুসলমানের কি আছে? কথাটা হয়ত বলতে বা শুনতে ঠিকই, কিন্তু কাজে করা তো বেশ কঠিন। আমি ব্যাপারটা উলটে নিয়ে ভাবি, যদি হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামে একঘর মুসলমান থাকতো তবে কি হিন্দুরা সবাই মিলে মৃত্যুর পর মুসলমানী রীতিকৃত্য মেনে তার কবর করতো? নাকি ভিন্ গ্রাম থেকে ডেকে আনতো মুসলমানদেরই?

অবশ্য এটা ঠিকই যে কর্মকাররা এ গ্রামে জনপ্রিয় তবে গরিব। তাদের যে কোনো আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই এ কথাও সত্য। তাই মুসলমান প্রতিবেশীরাই যা করবার করেছে। কিন্তু তবু কিছু কথা বাকি থাকে। সেটা তাদের সহৃদয়তার কথা, মুক্তবুদ্ধির কথা। ইচ্ছে করলেই তারা আড়ংসরিষা কি পীতাম্বরপুর থেকে হিন্দুদের ডেকে সৎকার করাতে পারতো। খরচটা না হয় চাঁদা তুলেই দিলো। কিন্তু কেন তারা দায়িত্বটা নিলো?

চটু নামে এক বৃদ্ধকে প্রশ্নটা করতে সে অবাক হয়ে বললে, 'ভিন গেরামের নোক ডাকতে যাবো ক্যানে বলুন তো? আমরা কি মরেছি? তা ছাড়া ধরুন ব্যাকা (শিশিরের ডাকনাম) তো সারাজীবন আমাদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে, আমাদের জন্যে সব লোহার দ্রব্য গড়েছে, মরণের পরে তাকে গঙ্গা দেওয়া তো আমাদেরই কাজ। বিশেষ তার ছেলের মাথার ওপর মুরুব্বি নেই, তেমন টাকাপয়সার জোর নেই, তার বেধবা অসহায় হয়ে কাঁদছে। সেখানে পাঁচজনে পরামর্শ ক'রে যা করবার তাই করেছি। তা এমন কি কাজ যে খবরের কাগজে সে খবর আবার ছেপেছে আপনারা এইসেচেন? বোঝো কারবার।'

একজন গ্রামবাসী বলল, 'এই চটু বুড়োই তাকে পুড়িয়েছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে চটু খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে বললে, 'আমি একা নই বাবু। গবরা আর সিরাজও হাত লাগিয়েছিল। তবে কিনা কাজটা কঠিন। কখনও মড়া পুড়াই নি তো। আমাদের কব্বর দেবারই নিয়ম। তা বাদে ধরেন হরিদাস কামারের ছেলে ব্যাঁকাকে তো কোলে পিঠে করে ঘুরেছি কত। কাকা ব'লে ডাকতো। তা সেই ব্যাঁকাকে নিজে হাতে পুড়ানো কঠিন কাজ। কিছু মনে করবেন না বাবু, আপনাদের ধম্মটা বড্ডা নিদ্দয়।'

কথাটা মানতে হয়। কিন্তু আসল কথাটাই এখনও জানা হয় নি। শ্যামলকে বললাম, 'শিশিরবাবু মানে তোমার বাবা কবে মারা গেছেন?'

শ্যামলের মাথায় এখনও ভালো করে চুল ওঠে নি। সেই মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'সঠিক স্মরণ হচ্ছে না, মাস কয়েক হ'লো।'



চটু বলে, 'আষাঢ় শ্রাবণ হবে। ব্যাঁকাকে যখন চিতেয় তুলে দি তখন আকাশ ঢেলে জল থই থই। তাতেই তো পুড়োতে নাকানি চুবোনি।'

অপ্রতিভ শ্যামলকে সুকুমারবাবু লজ্জা দিয়ে বললেন, 'সে কি গো, নিজের

বাপের মৃত্যু কবে বলতে পারছ না ?' অন্দর মহল থেকে নারী কণ্ঠ ভেসে এল, '২৮শে শ্রাবণ বুধবার।'

: তা মারা গেলেন কোথায় ? হয়েছিল কি ?

শ্যামল বলল, 'বাবার পেটে আলসার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন বাড়াবাড়ি খুব হ'লো তখন কল্যাণীর গান্ধী হাসপাতালে দিয়েছিলাম। দিন পনেরো ভর্তি ছিলেন।'

: মৃত্যুকালে হাজির ছিলে ?

: না। আগের দিনও ভালো মানুষ দেখে এলাম। তার পরে ঐ বুধবারে যখন গেলাম তখন হাসপাতালে ঢুকতেই কেমন যেন গা বেজে উঠলো। মনটা কেমন ক'রে উঠলো। গিয়ে দেখি বেডে অন্য রুগী। বাবা ভোর রাতে মারা গেছেন।

: তখন কি করলে ?

: একটা ম্যাটাডোর ভাড়া ক'রে ডেড বডি চারাতলা আনলাম। কিছু টাকা তো আমাদের ছিল। তার পরে যা করবার সব ওরাই করেছে।

চটু বলল, 'বাদ দাও দিদি ওসব কথা। কিছুই করি নি। সব তেনার খেলা।'

এবারে হঠাৎ হৈ হৈ করে জনকয়েক লোক উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠলেন। পরনে তাঁদের লুঙ্গি আর গেঞ্জি। একজন ঘোষণা করলেন, 'এই যে রঞ্চল পেরধান এসে গেছেন। যা জিজ্ঞেস করার ওনারেই করুন।'

রঞ্চল পেরধান মানে অঞ্চল প্রধান বুঝলাম। কিন্তু আমি সরকারি সফরে আসিনি যে অঞ্চল প্রধানের কাছে খবর নিতে হবে। তবে অঞ্চল প্রধান এমনই খুব বলিয়ে-কইয়ে ব্যক্তি। নিজেই জানান দিলেন যে তিনি একজন প্রাইমারি শিক্ষক এবং তাঁর পাশে-বসা ব্যক্তিটি তাঁর ভাই, 'টিচারি' করেন। এবারে তাঁর জিজ্ঞাস্য : 'চা বিস্কুট দেওয়া হয়েছে ? ব্যবস্থা করো। রিপোর্টার এসেছেন। তা আপনি কোন্ কাগজের লোক ? আনন্দবাজার না আজকাল ? ক্যামেরা এনেছেন তো ?'

আমি দেখলাম 'না' বললে এখানে কার্যোদ্ধার হবে না। তাই গাম্ভীর্য রেখে বললাম, 'বেরোবে। ভালো জায়গাতেই খবর বেরোবে। তবে খবর আগে সব জোগাড় হোক।'

'সব খবর পাবেন স্যার' অঞ্চল প্রধান নিশ্চিন্ত ক'রে বলেন, 'ডিটেলে পাবেন। আমি সব পয়েন্ট আউট করে রেখেছি।'

বুঝলাম প্রধানের ইংরাজি নিয়ে কিছু বিপাক আছে কপালে। কপাল ঠুকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি তো অঞ্চল প্রধান। এটা কোন্ অঞ্চলের অধীনে ?'

: লিখে নিন। বৃত্তিহুদা অঞ্চল। গ্রাম চারাতলা। জনসংখ্যা ১৭০০।

: ৮০০ ঘর অথচ মানুষ মাত্র ১৭০০ জন ?

: আজ্ঞে না ১৭০০ ভোটার। পঞ্চায়েত ভোটার লিস্ট অ্যাকর্ডিংলি বলছি।

: শিশির কর্মকারের মৃত্যুতে কত খরচ হয়েছে ?

: আমার পার্সোনালিটি খরচের হিসেব নেই। অঞ্চল ফাণ্ড থেকে গ্র্যান্ট দিয়েছি দুশো টাকা। পাবলিক কনট্রিবিশন দু হাজার।

: এত টাকা উঠলো ?

: সংগঠনের গুণ স্যার। তা ছাড়া হ্যাভক লোক হয়েছিল তো ! সবাই চাঁদা দিয়েছিল। কেমন লোক হয়েছিল বল না গো তোমরা।

দাদার দিকে তাকিয়ে ভাই সগর্বে বললো, 'খুব গ্যাদারেশন হয়েছিলো। এই উঠোন থেকে আড়ংসরষে পজ্জন্ত টাইট গ্যাদারেশন।'

: আপনাদের গ্রামে তা হলে বেশ সম্প্রীতির ভাব দেখছি।

: তা ধরুন হিন্দু-মুসলমান ফ্র্যাকশন আমাদের চারাতলায় কোনোদিনই ছিল না। আজও নেই। তবে যেখানেই শুনবেন ফ্র্যাকশন বুঝবেন পরগাছার ব্যাপার।

: পরগাছা বলতে ?

: ধরুন এখানে আমরা যে ক-ঘর বাস করছি সব হেরিডিটারি ভাবে বাস ক'রে আসছি। এর মধ্যে হঠাৎ ভিন্ জায়গার একটা আননোন পার্সন লোক এসে জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে থাকতে লাগলো। এরাই ধরুন পরগাছা। এরাই অশান্তি বাধায়।

: তা হলে চারাতলায় অন্তত পরগাছা নেই। শিশিরবাবুরাও বেশ সহজেই এখানে থাকতেন বা এখনও থাকেন।

: আজ্ঞে হ্যাঁ। আনটাচেবিলিটি আমাদের নেই।

মনে হ'লো ভয়ংকর ইংরাজির তোড়ে ভেসে না যাই। তবে সে-সব বাদেও একটা অনুভব আমাকে স্পর্শ ক'রে গেল যে এখানে সকলে স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষ না হলেও অসাম্প্রদায়িক। সেটা একটা বড় অর্জন। ধর্ম আর অধর্মের যা দড়ি-টানাটানি চলছে সব দিকে। বাবরি মসজিদ আর রাম জন্মভূমির যে-আশঙ্কিত কোঁদল তার মধ্যে চারাতলা এক আদর্শরকম ব্যতিক্রম। প্রশ্ন হ'লো এখানে সেকুলারিজমের কি কোনো সামাজিক ভিত্তিগত বিশেষত্ব আছে, নাকি নিছক

কাকতালীয়। সে খবরে যাবার আগে জেনে নেওয়া গেল গ্রামে কোনো পাঠাগার নেই, খবরের কাগজ দুখানা আসে, একটা প্রাইমারি স্কুল আছে তাতে তেমন ছাত্র নেই। গ্রামের সবাই প্রায় কৃষিজীবী। মাত্র দশ জন শিক্ষাজীবী। এই তথ্য থেকে সারা গ্রামের ধর্মগত ঔদার্যের কোনো দিশা মেলে না। শিশির ওরফে ব্যাঁকা খুব জনপ্রিয় ছিল, তাতেই কি এতটা বিবেচনা জাগতে পারে?

যাক গে, সে-প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে সৎকারের বিবরণ চাই অন্য একজনের কাছে। তার নাম সাত্তার। অঞ্চল প্রধানের ইংরিজি হেকে বাঁচবার সেটাই পথ। সাত্তার একটা বস্তুগত বিবরণ দিলো। যার থেকে জানা গেল, ব্যাঁকার শবযাত্রায় শ-তিনেক লোক যোগ দিতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয় সাতাশি জনকে। দুটো ট্রাক ভাড়া ক'রে সবাই যায়। গ্রামের এক বৃদ্ধ বুঝিয়ে দেন যে শবযাত্রায় বেশি খরচ ক'রে ফেললে শ্রাদ্ধশান্তির খরচে টান পড়বে। তাতেই সাতাশি জন যাবার সাব্যস্ত হয়। ব্যাঁকার ছেলে শ্যামলকে সবাই সান্ত্বনা দিয়ে সঙ্গে নেয়, তাকে দিয়েই মুখাগ্নি করায়। তবে পোড়ানোর কাজ গ্রামবাসীই করেন।

এই পর্যন্ত শুনে আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'এ কথা কি সত্যি যে আপনারা মরা নিয়ে যাবার সময় হরিধ্বনি দিয়েছিলেন?'

: হ্যাঁ, হরিধ্বনি দিয়েছিলাম।

: কিন্তু ভেতর থেকে বাধা আসে নি? মানে আপনাদের ধর্মে যখন কল্‌মা নিয়েছেন তখন হরির নাম করা তো নিষেধ।

একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখুন বাবু, ধর্মের দিকটা আমরা ভাবি নি। আমরা তো মোল্লাও নই, মৌলবীও নই। আমাদের সঙ্গে কোনো খতিবও ছিল না। আমরা শুধু ব্যাঁকা ভাইয়ের গঙ্গার কথা ভেবেছি। শুনেছি আপনাদের মুর্দা নিয়ে যাবার সময় হরিনাম করতে হয়, তাই করেছি। তাতে আল্লা গোস্তাকি নেবেন না।'

চটু বললো, 'কীর্ত্তনের কথাটাও বল।'

'হ্যাঁ', সাত্তার বলল, 'ব্যাঁকা চাচার পরিবারের খুব ইচ্ছে জেগেছিল যে চাচার ছাদ্দে এটুস কীর্ত্তন হয়। তো সে ইচ্ছাও আমরা অপূর্ণ রাখি নি। ছাদ্দের দিন সেই তেহট্ট থেকে কীর্ত্তনের দল এনে গাওনা করিয়েছি। চাচি, তোমার মনে শান্তি পেয়েছো তো?'

শিশিরের অবগুণ্ঠিতা বিধবা ঘাড় নাড়েন। পরিতৃপ্তির একটা অনুভূতি আমাকেও ছুঁয়ে যায়। আমি এবারে বলি 'শ্যামলের ভবিষ্যৎ কি এখন?'

এতক্ষণের দমিত অঞ্চল প্রধান সুযোগ পেয়ে বলে, 'পঞ্চায়েত থেকে ব্লক লেভেল, সেখান থেকে ডিসটিক্‌ট্ লেভেল। ধরেন সব দিকে অল রাউণ্ড চেষ্টা করে আমরা রিফিউজ হয়েছি। এখন ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে শ্যামলকে একটা সারের দোকান করে দেওয়া গেছে। হাজার হলেও সে তো আমাদের ব্যাঁকা ভাইয়ের পুত। তার সঙ্গে আমাদের মোহব্বতের কানেকশন।'

চটু বলল, 'সেটা বড় কথা নয়। আসলে আমাদের সব্বাই যতি শ্যামলের দুকান থেকে সার কিনি একচেটে ভাবে, তবে তার কুন্নুরকমে চলবে। ধারটার শুধ হবে। নাকি বলো তোমরা?'

সবাই সায় দিল।

এমন সময় সেই নাম-না-জানা বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'আমরা চেষ্টা তো করেছি বাবু। এখন সবই দীনদয়ালের ইচ্ছা।'

'দীনদয়ালের ইচ্ছা' কথাটা যেন মন্ত্রশক্তির মতো কানে ঢুকে সারা শরীরে আমার ঝাপট মারলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো চারাতলা গ্রামের এক মাইলের মধ্যে বৃত্তিহুদা গ্রাম, যেখানে সাহেবধনী লোকধর্ম সম্প্রদায়ের গুরু চরণ পালের ভিটে। আঠার শতকের শেষে চরণ পাল নামে এক নিম্নবর্গের মানুষ সেখানে হিন্দু-মুসলমানকে একত্র করে একটা ধর্মধারণার সৃষ্টি করেছিলেন, যা সমন্বয়বাদী ও উদার। তাদের উপাস্য আল্লাও নয়, হরিও নয়। তাঁর নাম দীনদয়াল। সেই থেকে এই সম্প্রদায়কে বলে দীনদয়ালের ঘর। যারা দীনদয়ালের ধর্মে মতিমান তারা বাহ্যত হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম আচার পালন করে, কিন্তু বিশ্বাসে তারা সমন্বয়বাদী সেকুলার। দীনদয়ালের ঘরে হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য যেমন থাকে তেমনই মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য থাকে। এদের সাধনভজন আহার-বিহার সব একত্রে। সমন্বয়বাদী উদার মানবধর্মের অনেক গানও এরা গায়। সে-সব গান দুশো বছর আগে বেঁধে গেছেন, কুবির সরকার বলে একজন ভক্ত। একসময় সে-সব গান সংগ্রহ করতে আর দীনদয়ালের ঘরের সত্য পরিচয় জানতে আমি বৃত্তিহুদা গ্রামে অনেক গেছি। সে গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই কথার মধ্যে মাঝে মাঝেই 'জয় দীনদয়াল' কিংবা 'দীনদয়ালের ইচ্ছা' বলে।

এখন এই চারাতলা গ্রামের বৃদ্ধের মুখে 'দীনদয়ালের ইচ্ছা' শুনে এক মুহূর্তে সব ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এদের ঔদার্য, সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে যে বহুদিন-প্রবাহিত এক লোকধর্মের মানবিক শিক্ষা তা স্পষ্ট বোঝা গেল। ধর্ম মানে যে এক রকমের ধারণ তাও বুঝলাম আমি। চারাতলা

গ্রামের অজস্র মানুষকে ধারণ করে আছে এক শক্তপোক্ত ধর্মবোধ। এই লোক-ধর্মের গানেই তো বলা হয়েছে :

কেউ বলে কৃষ্ণ রাধা
কেউ বলে আল্লা খোদা
থাকে না তেষ্টা ক্ষুধা
ঘুচে যায় জঠরজ্বালা।
মনে ভেবে দ্যাখো এক সকলে
পরো রে এক নামের মালা।

এদেরই আরেকটা গানে আছে :

আল্লা মহম্মদ রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ একাত্মা সার।

আমি এবার যেন পায়ের তলায় খানিকটা মাটি পেয়ে বললাম, 'তোমাদের গাঁয়ের অনেকে বুঝি দীনদয়ালের ঘরের লোক?'

চটু একমুখ হেসে বললে, 'বাবুর কাছে শেষপজ্জন্ত হার হলো। আপনি কি দীনদয়ালের খবর জানেন?'

আমি আবৃত্তি করলাম কুবির সরকারের গান :

ওরে বৃন্দাবন হতে বড়
শ্রীপাট হুদা গ্রাম।
যেথা দিবানিশি শুনি
দীনদয়ালের নাম॥

চটু বলল, 'তবে আমিও একটা গান বলি শোনেন—

জানি আল্লা আর রসুল বিভিন্ন নয়,
যুগলরূপ রাধাকৃষ্ণ স্পষ্ট সর্ব ঘটেপটে রয়।
হিন্দু-মুসলমানে সবাই মানে বোঝে না ভাবের নির্ণয়॥
সৃষ্টিকর্তা এক নিরঞ্জন—
হিন্দু-যবন জাত নিরূপণ দুই কিসের কারণ?
পুরুষের লক্ষণ প্রকৃতি আশ্রয়।
হলো যুগলেতে জন্ম সবার মর্ম বোঝো মহাশয়॥'

আমি বললাম, 'এবাবে বোঝা গেল তোমাদের মতিগতি। তোমরা তা হলে হুদোর পালবাড়ির শিষ্য? সব দীনদয়ালের ঘর?'

: একেবারে একচেটিয়া। আমরা সবাই দীনদয়ালকে মানি। তেনার কথা

বুঝতে চেষ্টা করি। তিনি বলেছেন: 'মানুষে বিশ্বাস করো মন, তবে পাবে বস্তুধন।'

আমার মধ্যে রঙ্গপ্রিয়তা জেগে উঠলো। অঞ্চল প্রধানকে লক্ষ ক'রে বললাম, 'আপনি তো রাজনীতি করেন। আবার দীনদয়ালও মানেন?'

অপ্রতিরোধ্য প্রধান বলে, 'দুটোই এক। দুটোই হিউম্যান স্ট্যাডি নাকি বলেন? তবে আমাদের গাঁয়ে বোথ পার্টি দীনদয়ালকে মানে।'

এবারে ভরা মনে চারাতলা ত্যাগের উদ্যোগ নিই স্বকুমারবাবুর সঙ্গে। মধ্যাহ্ন ভোজের আমন্ত্রণ নিতে পারি না কারণ সে ব্যবস্থা স্বকুমারবাবুর বাড়িতে আগে থেকেই ধার্য রয়েছে। বাস-রাস্তার কাছাকাছি পর্যন্ত কিছু গ্রামবাসী এগিয়ে দিলো। রোদের তাপ বেশ চড়েছে। একটা পাকুড় গাছর তলায় বাঁধানো বেদিতে ক্ষণ-বিশ্রাম নিচ্ছি। 'বাস আসতে দেরি হবে। এ লাইনে দুপুরে বাস কমে যায়', স্বকুমারবাবু বললেন।

এমন সময় বাস-রাস্তা ধরে একজন সাইকেল চড়ে এসে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে বলল, 'বাবু, এখানে যে? আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেন?'

'আরে ইয়াকুব তুমি?' আমি চমকিত হয়ে বলি।

'এই তো আমাদের গাঁ বাবু', বিনয়ের সঙ্গে বলে ইয়াকুব। 'এখানে কি আর দেখবেন বাবু, মাটির ঢেলা আর অমানুষের দেশ। গরিব আর অধম।'

ইয়াকুব গ্রামগ্রামান্তর থেকে ডিম সংগ্রহ ক'রে আমাদের শহরের বাজারে বেচে। তার কাছ থেকে আমি মাঝে মাঝে ডিম কিনি। কিন্তু সে যে চারাতলার মানুষ তা কি করে জানবো? যা হোক, তাকে আমার ভ্রমণ-বিবরণ দিয়ে একটু উস্‌কেও দিই। বলি, 'ইয়াকুব, ব্যাঁকাবাবুর ডেড বডি নিয়ে যে সাতাশি জন নবদ্বীপ গিয়েছিল, তুমি তাতে ছিলে?'

: আজ্ঞে, ছিলাম বৈকি?

: এ কথা সত্যি যে তোমরা হরিধ্বনি দিয়েছিলে?

: আজ্ঞে বাবু, সে কথাডাও সত্যি।

: তোমরা কল্‌মা নেওয়া মুসলমান। জাত গেল না?

: আজ্ঞে হ্যাঁ, যদি তা বলেন তবে জাতডাও গেল বৈকি। ছিলাম পুরুষ, হলাম মেয়েছেলে।

সকৌতুকে বললাম, 'সেটা কী রকম?'

ইয়াকুব তার সদ্য পানখাওয়া লাল দাঁত মেলে বললো, 'আজ্ঞে, ভগবানের তৈরি জাত তো মোট দুখানা—পুরুষ আর স্ত্রীলোক। সেটাই থাকবে। আর যা সব জাতাজাতি দেখছেন সব মানুষের তৈরি। কোনোটাই শেষ পজ্জন্ত টিঁকবে না। আপনি কি বলেন?'

আমি আর কি বলবো? মধ্য দুপুরে এক অশিক্ষিত ডিমঅলা আমাকে ধর্ম আর অধর্মের মাঝখানের অস্বস্তিকর দ্বন্দ্বে ফেলে হাসতে হাসতে চ'লে গেল।



জীবন-জীবিকা

জীবন আর জীবিকা কথা দুটো এখন যেমন গায়ে গায়ে জড়িয়ে গেছে আগে তেমন ছিল না। আগে বলতে বছর ত্রিশ চল্লিশ আগেও জীবনের একটা নিজস্ব চলন ছিল, ছিল ছন্দ। আজ যে আর তা নেই সেকথা বোঝাতে খুব অসুবিধা হবে না। কেননা এখন সর্বদাই দিকে দিকে জীবিকার হাঁ-মুখে আটকে-পড়া জীবনের ছটফটানি নিত্যি দেখি, যেমন দেখি দেওয়ালে টিকটিকির ব্যাদানে আরশোলার লম্ফঝম্প। অবশ্য তফাৎ আছে। কারণ টিকটিকির মুখে আরশোলা ক্রমে ক্রমে নির্জীব নিথর হয়ে যায়। মুস্কিল যে, জীবিকার ফাঁদে প'ড়ে জীবন ঠিক নিথর হয় না, বদলে যায়। ছটফটানি কমে গিয়ে একটা রক্তহীন অস্তিত্ব কেবলই মেনে নেয় জীবিকার ছক। তখন আর মনে থাকে না যে জীবনেবও একটা স্বতোচ্ছল স্বভাব আছে, আছে ছক-ভাঙবার প্রবৃত্তি।

কথাটা হঠাৎই সেদিন উঠলো বাস টারমিনাসের অফিস ঘরে। একটা গালভরা নামের সাইনবোর্ড টাঙানো : 'বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'। ভেতরে প্রায়ান্ধকারে ব'সে ছিলেন মনোরঞ্জন সেন ওরফে মনাদা। মফস্বলের এই জেলা শহরে

মনাদা'র একখানা বাস আছে। সেই সুবাদে তিনি একজন বাস-ওনার বৈকি, এমনকি বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের রীতিমত অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ। যদিও ওঁর বাস ওঁর জীবনের মতই লঝ্ঝর মার্কা। আজ অ্যাকসেল খারাপ, কাল টায়ার পালটাতে হবে, পরশু ব্রেক ফেল করছে। নানারকম শিরপ্যাঁচ খেলিয়ে তবে বাস-চালানো। কেননা ওটাই মনাদা'র রুজি, ওঁর জীবিকা। তাই একেকদিন এমনও হয়, যে, মনাদা নিজেই হয়ত ব'সে পড়লেন ষ্টিয়ারিঙে। কী, না পাইলট আসে নি। এহেন মনাদা অ্যাসোসিয়েশনের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে চত্বরে দুটো টুল পেতে একটায় নিজে বসেন, একটায় আমায় বসান। ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়িটায় এমন নিষ্পেষণ পড়ে যেন পারলে মনাদা জীবনটাকেই চিবিয়ে খেতো। এত রাগ।

'এত গরম কেন?' আমার এই জিজ্ঞাসু কথার জবাবে মনাদা বলে, 'আর বলো কেন ব্রাদার। সকাল বেলায় পক্ষীরাজকে রওনা ক'রে ব'সে আছি, একটু আগে ফোন এলো যে তিনি পোড়াদহের কাছে একটা বাচ্চা চাপা দিয়েছেন। বাচ্চাটা মরে নি অবশ্য, তবে কিনা পাবলিক গরম। বোঝো কারবার। এখন এই শালা মালিককে যেতে হবে। টাকা ঢালতে হবে। তাই বাড়িতে টাকা আনতে পাঠিয়েছি। বুঝলে? এখন তুমি বলো, এই মনোরঞ্জন সেনের জীবনটা কেমন ধারা? এ কি একটা জীবন? ছ্যা। এই ছোঁড়া দু গেলাস চা দে'।

সামনের চায়ের দোকানের ছোকরা দুটো ছোট গেলাসে চা এনে দেয়। স্থরুৎ ক'রে তাতে এক চুমুক মেরে মনাদা বলে, 'আচ্ছা তুমিই বলো, এটা কি একটা জীবন? ভেবে দ্যাখো, আমার জীবন চলছে স্রেফ পথের মর্জিতে। দেশ বেজন্মায় ভরে গেছে। রাস্তায় বেওয়ারিশ ভিড়। তার মধ্যে বাস চালাতে হবে। ছোঃ। তোমার মনে পড়ে আমার বাবাকে?'

মনাদা'র বাবা বিশ্বরঞ্জনবাবুকে কে ভুলবে? সদর কোর্টের উকিল ছিলেন। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হ'লো তাঁর সৌখিন জীবনযাত্রার ধরন। কোর্টে যেতেন উকিলের পোষাকে আর বাকি সময় ফুলবাবু। চুনোট করা ধুতি, গিলে-পাঞ্জাবি, চকচকে পাম্প স্যু। টেরি কাটা ব্যাকব্রাশ চুল, সুগন্ধি পোষাক, হাতে বাহারি ষ্টিক, মুখে এলাচ দানা। এতেই শেষ নয়। বাড়িতে সদাই দোর্দণ্ড প্রতাপ, হাত কচ্‌লানো এক গাদা খিদ্‌মদ্‌গার আর সদা-উৎকর্ণ স্ত্রী, সন্ত্রস্ত সন্তান, মানে আমাদের মনাদা। প্রশ্নটা এখানেই। নিছক জীবিকাসফল মানুষ ব'লেই কি এতটা? নাকি জীবনেরও কোনো ছাপ ছিল ভদ্রলোকের?

কথাটা তুলতেই মনাদা হৈ হৈ করে ব'লে উঠলেন 'আরে দূর দূর। ওসব কথা মনেও এনো না ব্রাদার। টাকাঅলা লোক কি এখন নেই? পশারঅলা উকিলই বা কম কই? কিন্তু দেখবে তিনি নিজে বাজার করছেন, বেড়াতে যাচ্ছেন বউ নিয়ে কিন্তু বউয়ের মুখ ভার। ছেলে বাপের কথা না শুনে চুলে মিঠুন-ছাঁট লাগিয়েছে। বাড়ির ঝি আদ্দেক দিন কাজে আসে না। চাকরকে কিছু কিনতে পাঠালে চুরি করে। বুঝলে ব্রাদার, এখনকার কালে ভালো ঝি-চাকর শুধু সিনেমায় পাবে। জীবনটাই পাল্টে গেছে। দূর দূর।'

: আপনার বাবার লাইফ-স্টাইল কেমন ছিল?

: শুনবে সে কথা? আমাদের বড় কত্তা ছিলো শাহানশা। তোমাদের প্রাইম মিনিস্টারও সে জীবন ভাবতে পারবে না।

: এর মধ্যে আমার প্রাইম মিনিস্টার কেন?

: বাঃ, প্রাইম মিনিস্টার কি এখনকার জীবন-জীবিকার বাইরে? তুমি জহরলাল আর আজকের প্রধানমন্ত্রীর লাইফস্টাইল কম্পেয়ার করো। সে ভদ্রলোক ছিলেন ফ্রি অ্যাণ্ড যাকে বলে ওপেন। এই মিটিঙের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছেন, রাউডি ক্রাউড সামলাতে ব্যাটন হাতে চলেছেন তাদেরই মধ্যে। আর আজকের পি. এম? বুঝেছ ব্রাদার সকালে উঠে আমরা যেমন গেঞ্জি পরি তেমনি পি. এম পরে বুলেট-প্রুফ পোষাক। ভাবতে পারো? বাথরুমের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্ল্যাক ক্যাট কমাণ্ডো। উঃ হরিব্‌ল্। যাকগে। এখনকার কালে সে জহরলালও নেই আমাদের বড় কত্তা বিশ্বরঞ্জন সেনও নেই। মানে সেই লাইফ-স্টাইলটাই নেই।

: বড় কত্তার স্টাইলটা একটু বলুন না।

'দাঁড়াও, আগে আরো একগেলাস চা খেয়ে নিই, একটা বিড়ি ধরাই।' মনাদা বলে। চা আসে, বিড়ি শেষ হয়। মনাদা বলে, 'তাড়াহুড়ো চলবে না। বড় কত্তা মোটে তাড়াহুড়ো বরদাস্ত করতেন না। হ্যাঁ, যা বলতে চাই। বড় কত্তার লাইফ-স্টাইল। মানে দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ারের মাঝখানের মফস্বল বাংলা। বড় কত্তা তখন দুহাতে টাকা পিটুচ্ছেন। বাড়িতে এলাহি ব্যাপার। লোকলস্কর। সকাল থেকে বিকেল কোর্ট কাছারি মক্কেল মুহুরি। এবারে বিকেলে বড় কত্তা এলেন ফিটন গাড়ি চ'ড়ে। হাঁই হাঁই করে সব খিদমদ্‌গাররা ছুটে এলো। কেউ জুতো খোলে, কেউ পাখা করে, কেউ গামছা এগোয়! বড় কত্তা বাথরুমে ঢুকে পোষাক পালটান। উকিল থেকে এবারে টেনিস প্লেয়ার। শাদা গেঞ্জি, শর্টস আর শাদা ক্যাম্বিস জুতো মোজা, হাতে র‍্যাকেট।

: কিছু খেলেন না ?

: কন্‌ডেন্‌সড্‌ মিল্কের তৈরি এককাপ চা, জাপানি সেটের কাপ ডিস্‌। সঙ্গে হাণ্টলি পামার কোম্পানির দুখানা পেটিট বেরি। বুঝেছো। এ আর মনোরঞ্জন সেন পাও নি যে রাস্তায় টুলে ব'সে গুঁড়ো দুধের চা খাচ্ছে এজমালি গেলাসে।

: টেনিস খেলতে কোথায় গেলেন ?



: বাড়ির পাশেই টেনিস কোর্ট ছাখো নি ? হার্ড কোর্ট। তো কোর্টে ঘাম-ঝরিয়ে পাক্কা দেড় ঘণ্টা খেলা। তারপরে বাড়ি ফিরে স্নান। বাথরুমে ধরা থাকবে ঠাণ্ডা জল টিউবওয়েলের। তাতে গুণে ঠিক চার ফোঁটা ও-ডি-কোলোন, বুঝলে ? স্নান সেরে বাবু এবারে সেইসব চুনোট-ধুতি গিলে-পাঞ্জাবি পরবেন। রোজ আলাদা সেট। তাতে আতর লাগানো। এর পর বাবু বসবেন সান্ধ্যভোজে। শ্বেতপাথরের টেবিলে খাওয়া। এবারে আর চাকর-বাকর চলবে না। চাই গিন্নিকে। গিন্নির সারা দুপুর ঘুম নেই কিন্তু। তিনি পতিসেবায় ব্যস্ত।

: সে কি ? পতি তো এজলাসে !

: পতি এজলাসে কিন্তু উনি সারা দুপুর তাঁর জন্যে রান্না-বান্না করছেন। সকালে

তো তাড়াহুড়োয় ভালো ক'রে খাওয়া হয় নি। মাত্র চার রকমের মাছ দিয়ে বড় কত্তা সামান্য দুটি খেয়েছেন কি খান নি, বুঝেছো ?

: বোঝা কঠিন অবশ্য। যাই হোক সান্ধ্যভোজের মেনু কি কি ?

: ফুল্‌কো লুচির ফুল্‌কো বোঝো ?

: হ্যাঁ, যে অংশটা ফুলে ওঠে।

: ঠিক ঠিক, তোমার খানিকটা খানদানী আছে দেখছি। তো সেই ফুলকো দেওয়া হবে একশোটা। তার মানে একশোটা লুচি ভাজা হবে! ফুল্‌কো বাদে বাকি অংশ বিলি করা হবে। ফুল্‌কোর সঙ্গে থাকবে এক জামবাটি পাঁঠার মাংস আর এক পাত্তর ক্ষীর কিংবা রাবড়ি। সবই মা জননী গলদঘর্ম হয়ে সারা দুপুর ধ'রে বানাবেন। হ্যাঁ, চমকে যেও না। তখন তো আর ম্যাগী দো মিনিটের যুগ নয়।

: এতসব খাবেন বড় কত্তা ?

: হ্যাঁ খাবেন চেঁচেপুঁচে, চেটেপুটে। রান্নার খুঁত ধরবেন। মেজাজ দেখাবেন : আর সারাক্ষণ অপরাধীর মতো মুখ ক'রে মা জননী পাখার বাতাস করবেন। তারপরে যদি মেজাজ মর্জি আসে বাবু দুচারটে কথাবার্তা বলবেন। তাতেই গিন্নি কৃতার্থ।

: তার পরে ?

: তার পরে বাবু ছড়ি হাতে ল্যাণ্ডো গাড়ি চ'ড়ে চাকর নিয়ে রওনা দিলেন। গাড়ির মধ্যে মালকড়ি।

: কোথায় যাবেন এবারে ?

: কাপ্তানী করতে, ইয়ার বক্‌সিদের নিয়ে। মাঝরাতে ফিরবেন। চাকররা বডি পৌঁছে দেবে শয়ন মন্দিরে। কাপ্তান এবারে ঘুমোবেন। বুঝলে ?

: সেই লোকের ছেলে আপনি ?

'তাহলেই ভাবো, কতখানি ধৈর্য তোমাদের এই মনাদার! আর কী জীবন। ছ্যা ছ্যা, ঘেন্না ধ'রে গেল' ব'লেই মনাদা আছড়ে ভেঙে ফেললেন সপাটে চায়ের গেলাসখানা। তারপরে চায়ের দোকানের ছোকরাকে ডেকে বললেন, 'অ্যাই ছোঁড়া, এই নে পাঁচ টাকার নোটখানা। চায়ের দাম নিবি, গেলাসের দাম কাটবি, বাকি পয়সা নিয়ে নিবি। যা, সামনে থেকে দুর হ'। মনোরঞ্জনদা একটা বিড়ি নিয়ে দাঁতে নিস্পেষণ করতে লাগলেন।

বিড়ির শরীরে দাঁত রগড়ে নাহয় মনাদা'র রাগ খানিকটা কমবে কিংবা বনেদী বাড়ির মেজাজ দেখাতে নাহয় ভাঙলেনই বড়জোর একখানা গেলাস। কিন্তু জীবন

ধারণের বহুতর নিত্যগ্লানি কাটবে কীসে? জীবন এবং জীবনের নানা অনুপুঙ্খ যে কেটে ব'সে যাচ্ছে রোজই। আমার বন্ধু প্রশান্ত বসুর অশান্ত জীবনটার কথাই যদি ধরি।

* * * *

প্রশান্ত তো সব অর্থেই প্রশান্ত ছিল। ক্লাশ ওয়ান থেকে এম. এ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। তারপর দৈবক্রমে চিরছটফটে আমি হয়েছি শান্তশিষ্ট অধ্যাপক আর চিরপ্রশান্ত আমার বন্ধুটি হয়েছে সরকারি অফিসার। এখন ডেপুটি সেক্রেটারি, তাই তার ছোটাছুটির আর অন্ত নেই। ক্লাশ সিক্সে অঙ্কের মাস্টারমশাই একবার প্রশান্ত বাদে আমাদের সবাইকে সারা পিরিয়ড দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। অপরাধ হলো আমরা আঠারো আঠারোং উনিশ উনিশং চব্বিশ চব্বিশং জাতীয় ভয়ানক নামতার ঘরটা মুখস্থ বলতে পারি নি। প্রশ্ন হলো ক'জনই বা পারে? কিন্তু প্রশান্ত পেরেছিলো তার দুর্মর স্মরণ শক্তির বলে। আমাদের সহপাঠী ন্যাড়া তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিল: 'শালা, তোর খুব মুখস্থ শক্তি না, দেখবি সারা জীবন মুখস্থই করবি কেবল।'

কথাটা বিশ্রিভাবে ফলে গেছে। প্রশান্ত যখন দিব্যি টিপটপ ডব্লিউ বি. সি. এস পাস ক'রে ডেপুটি হ'লো তখন তাকে হিংসেই করতো সকলে। মফঃস্বলে কি চমৎকার ছিমছাম জীবন। তখনও ফ্রি কেননা ব্যাচিলর। ক্রমে সুন্দরী বউ হ'লো, তার নামটিও বেশ, সুকল্পা। প্রশান্ত তরতর ক'রে এস. ডি. ও. বনে গেল। পরিকল্পিত সুখী পরিবারের স্ট্যাটুট অনুযায়ী প্রথমে ছেলে পরে মেয়ে হ'লো। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশান্ত যে নাজেহাল হয়ে গেছে জানতাম না! একবার তার মফস্বলের বাংলোয় উইক-এণ্ড কাটাতে গিয়ে দেখি ধুন্দুমার কাণ্ড। কী ব্যাপার? না, প্রশান্ত-র মেয়ে দিয়া-র পোলিও কার্ড পাওয়া যাচ্ছে না। তখন দিয়া-র বয়েস বছর ছ'সাত হবে। আমি বললাম, 'এত বয়সে পোলিও খাওয়াচ্ছিস?' সুকল্পা বললো, 'আপনার বন্ধুর সব তাতে বাড়াবাড়ি। সবাই পোলিও ভ্যাকসিন চটপট খাওয়ায়। উনি ধরেছেন এক পাঞ্জাবের পাশ করা ডাক্তার ডি. সি. এইচ।'

: ডি. সি. এইচ কী বস্তু?

: ডিপ্লোমা ইন চাইল্ড হেলথ।

: তা পাঞ্জাবি দাওয়াইটার বিশেষত্ব কি?

: বিশেষত্ব এই যে পর পর দু'বছর দু'ডোজ। তার পরে চার বছরের পর বুস্টার ডোজ।

: এ দাওয়াই যে মোক্ষম তা কে বললে ?

প্রশান্ত এবারে মুখের চুরুট নামিয়ে বলল, 'বলছে "ইণ্ডিয়া টুডে"-র একটা হেলথ অ্যানালিটিক উইং। বুঝেছ গর্দভচন্দ্র।'

: বুঝেছি। তা এখন সমস্যাটা কি ?

: সমস্যা এই যে পোলিও কার্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না। লস্ট নয় হয়ত, তবে মিসপ্লেসড। মোদ্দা কথা চার বছর হয়ে গেছে। বুস্টার দেবার ডেট মনে নেই। স্বকল্পা তো হোপলেস।

স্বকল্পা বললে, 'মিথ্যে আমায় নিয়ে টানাটানি। কবে কোন্ জিনিসটা মনে রাখতে দিয়েছো। আবার গর্ব করে নিজেকে বলা হয় মুভিং মেমরি রেকোনার। নাও ঠ্যালা সামলাও।'

আমি বললাম, 'সে কি রে, তোর স্মৃতিভ্রংশ ? উনিশ উনিশং সাতাশ সাতাশং তুই যে চটপট বলাতিস ?'

: দোজ ডেজ আর গন। কী জীবন হয়েছে খেয়াল আছে ? কত আর মনে রাখবো বল্‌তো ?

: কেবল বউয়ের বয়স বাদে সবই মনে রাখতে পারিস।

স্বকল্পা ঝংকার তুলে উঠে যায়। প্রশান্ত হতাশ ভঙ্গীতে সোফায় ব'সে বলে, 'সত্যি রসিকতা নয় রে। লাইফ ইজ ইনকরিজিব্‌ল্।'

: সেটা তুই ক'রে তুলেছিস্। লাইফ ইজ এভার ফ্রি।

: ক'রে তুলেছি ? তুই শুনবি ? শোন্ তা হলে আমাকে কি কি সর্বদা মনে রাখতে হয়। ডি. এম. মানে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ফোন নাম্বার। তা ছাড়া এ.ডি.এম., এস.ডি.ও, এস.পি, ডি.এস.পি, ট্রেজারি অফিসার, নাজিরখানা। কলকাতায় রাইটার্সে হোম পলিটিকালের ডেপুটি সেক্রেটারির ফোন। এছাড়া লোকাল এম.এল.এ, পার্টি অফিস, এম.পি, পঞ্চায়েত অফিসার, সভাধিপতি··· শালা কাজের নিকুচি করেছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে বলি, 'শুধু কতকগুলো নম্বর বৈ তো নয়। ও তো লিখে রাখলেই হয়।'

: অত সস্তা নয়। কবে কখন কোন্ পজিশন থেকে ফোন করতে হয় জানিস্ ? হয়তো ডিভিশনাল কমিশনারের সঙ্গে সার্কিট হাউসে জরুরি মিটিং চলেছে। হঠাৎ ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'ধরুন তো ট্রেজারি অফিসারকে ফোনে। আর এম.এল. এ-কে ফোনে বলুন চলে আসতে। ড্রাউট সিচ্যুয়েশন ইজ অ্যালারমিং।' তখন

যদি ঘোচনচন্দ্রের মতো বলি 'আজ্ঞে ওঁদের ফোন নম্বরটা কত ?' তবে হয়ে গেল বুঝলে ? আর কি শুধু নম্বর নাকি ? কতজনের মেজাজ মর্জি মুখস্থ রাখতে হয় তা জানো ? বায়োডাটা আর হ্যাবিট্স্ বোঝো ?

: সত্যিই বুঝি না।

: তবে শোনো। মাদ্রাজী ডি.এমের গিন্নির সঙ্গে ভারতনাট্যম্ নিয়ে আলোচনা করতে ভুল হলে চলে না। এ.ডি.এম. সাহেবের মেধাবী কন্যাটি হাফইয়ার্লিতেও ফার্স্ট হলো কিনা তার জন্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখাতে হবে। রাইটার্সের বড় কর্তার জন্যে মাখা সন্দেশের প্যাকেট, বদলির তদ্বিরের জন্যে যথাস্থানে তৈলদানং বুঝেছো ? এ ছাড়াও আছে অবিবাহিত এম.এল.এ.-কে সভায় নিয়ে গিয়ে সুন্দরী মেয়ে দিয়ে মালা পরানো, গাঁয়ের বি. ডি. ও. সাহেবকে ধ'রে খেজুর গুড়ের পাটালি সংগ্রহ করে পার্টি অফিসে পাঠানো।

: আর ?

: আরো শুনবে ? ডিভিশনাল কমিশনারের একমাত্র সন্তানটি যে মেণ্টালি রিটারডেড সে খবর জেনে নিয়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে সিমপ্যাথাইজ করতে হবে। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন পরতে হবে ধুতি পাঞ্জাবি। ডি. এম.-এর জন্মদিনে পাঠাতে হবে ফুল। তাঁদের বিবাহবার্ষিকীতে বউকে নিয়ে গিয়ে হেঁ হেঁ করতে হবে। বলো, এর কোন্‌টা তোমাকে করতে হয় ?

আমি বললাম, 'একে বলে প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস্। সকলেরই থাকে।'

প্রশান্ত বলল, 'ছাই থাকে। তুই তো কলেজে যাস আর লেকচার দিস।'

: তার ঝামেলা নেই ?

: দূর দূর, নস্যি। আমাদের মব ঠেকাতে হয়, পাবলিক ডেমনস্ট্রেশন রুখতে হয়, দরকারে ফ্যায়ারিং অ্যারেস্ট সব করতে হয়। আর কি বল্‌তো ? সেদিন এক বদমাইস বি.ডি.ও কি করলো জানিস ? আমার কাছ থেকে ওষুধ জেনে নিয়ে ডি. এমের ছেলের চিকিৎসার উপায় বাতলে দিলে আমারই ফোনে কথা ব'লে ডি. এমের বউকে। আমি বললাম, 'এটা কি হ'লো ?' বি. ডি. ও বললো, 'আহা ঘাসু, জানেন না কিছু নাকি ? ডি. এমের পোলার সারা গায়ে অ্যালার্জি হয়েছে জানেন না ?' সত্যিই জানতাম না। ইস্।

এত সব তরিখুৎ ক'রে, ধান্দা রেখে, আমাদের সেই ইস্কুল জীবনের মুখচোরা প্রশান্তচন্দ্র শেষ পর্যন্ত চাকরিজীবনের মক্কা রাইটার্সে এখন থানা গেড়েছেন পাকা-পাকি। সরকারি লোন নিয়ে লবণহ্রদে একখানা বাড়িও ফেঁদেছেন। আর কি

চাই ? জীবন মসৃণ, বাঁধাধরা, তবে উদ্বেগবহুল। উদ্বেগ, কেননা রক্তে খানিকটা চিনি ধরা পড়েছে, তাই ভোরে উঠে পায়চারি। উদ্বেগ, কেননা পুত্র জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স পায়নি। তার লাইন এখনও অনিশ্চিত। কি পড়বে কমপিউটার না ইকো-স্ট্যাট ? নাকি সরাসরি ব্যাঙ্কে যাবে ? উদ্বেগ, কেননা আজকাল সিনিয়ার বি.সি.এস.-দের হুট করে মফঃস্বলে এ.ডি.এম ক'রে পাঠাচ্ছে। উদ্বেগ, কেননা কন্যার এ বছরই মাধ্যমিক। উদ্বেগ, কেননা ইদানীং স্বকল্পার হাঁটুতে সায়নোভাইটিস অর্থাত বাত। এমন একখানি উদ্বেগবহুল ব্যক্তির কাছে এক রবিবার হাজির হলাম। উষ্ণ অভ্যর্থনা জুটলো, সঙ্গে মৃদু অনুযোগ, 'শালা, দিলি তো দিনটা মাটি ক'রে !'

: কেন ?

: ভেবেছিলাম আজকে পারসোনাল ফাইল আর সার্ভিস বুকটাকে আপ-টু-ডেট করবো। তুই এলি, তার মানে দিনটা গেঁজিয়ে কাটবে। যাকগে। তাই হোক।

আমি বললাম, 'তোকে দেখে মনে হয় জীবিকাই বুঝি জীবন। হ্যাঁরে, তোর নিজের ব'লে কিছু নেই ?

প্রশান্ত বললো, 'নিজের বলতে আছে হাউস বিল্ডিং লোনের দেনা, সার্ভিস বুক আর গ্রুপ ইনস্যুরেন্স।'

: ব্যস ? সি.টি.ডি নেই ? এন.এস.সি ? এল.আই.সি ? রেকারিং ডিপোজিট ? ফিকসড ডিপোজিট ?

: থামলি কেন ? বল্ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, টার্ম ডিপোজিট।

: সেটা কি বস্তু ?

: সেভিংস ব্যাঙ্কে মাত্র সাড়ে চার পারসেণ্ট ইনটারেস্ট। কিন্তু নব্বই দিনের টার্ম ডিপোজিটে আট পারসেণ্ট। সেইজন্যে টাইম-টু-টাইম সেভিংসের টাকা তুলে টার্ম ডিপোজিটে খেলিয়ে নিই বুঝলি ?

: আর কোনো ধান্দা নেই ?

: আছে। নন-রিফাণ্ডেবল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড লোন নিয়ে এন.এস.সি ক'রে ফেলা।

: বাপরে। সব অ্যাকাউণ্টের নম্বর মনে আছে তো ?

: অবশ্যই এবং ডেট অফ ম্যাচুওরিটি এবং ডেট অফ রিনিউয়াল সমেত।

স্বকল্পা চা-জল খাবার দিতে এসে হেসে বললো, 'আপনার বন্ধুর আজকাল ভীমরতি হয়েছে। কিছু আর মনে থাকছে না।'

: কী রকম ?

: আরে বলিস না। এবারে ম্যারেজ অ্যানিভারসারির ডেটটা মনে ছিল না। কেন জানিস? দমদম এয়ার-পোর্টে সেদিন ট্রানজিট ছিল ভুটানের মুখ্যমন্ত্রীর। আমাকে যেতে হ'লো গভরমেণ্টকে রিপ্রেজেণ্ট করতে। তার জন্যে টেনশন ছিল। নিউ মার্কেট থেকে ফুলের তোড়া কিনে দমদম ছুটলাম। হেঁ হেঁ করে দাঁত বার করে সেই ভুটানীকে ফুল দিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা। এসে দেখি শ্রীমতী মুখ ভারি ক'রে ব'সে আছেন। কী ব্যাপার? অনেক সাধ্যিসাধনা ক'রে ক'রে মধ্যরাতে জানলাম সেটা নাকি বিবাহবার্ষিকীর রাত। বোঝো কাণ্ড।

: কততম বিবাহবার্ষিকী?

: এই রে সেরেচে। হ্যাঁগো, এবার কততম? বাইশ না তেইশ?

'কেন মনে নেই?' সুকন্যা গর্জে উঠলো। 'বিয়ের সালটা মনে নেই?'

প্রশান্ত বললো, 'মনে আছে বৈকি। তবে অনেকদিন ফিনান্স ডিপারটমেণ্টে আছি তো, তাই বছরগুলো ডবল ডবল লাগে।'

: সে আবার কি?

: কেন তুই সেই ইনকামট্যাক্স অফিসারের গল্পটা জানিস না? তাকে যাই সাল জিগ্যেস করা যাক সে ফিনানসিয়াল ইয়ার বলে। যেমন, জন্ম ১৯৩৪-৩৫, ম্যাট্রিক ১৯৫১-৫২, গ্র্যাজুয়েশন ১৯৫৫-৫৬, ম্যারেজ ১৯৬২-৬৩। আমারও সেই দশা। আমারও বিয়ের এবার বাইশ-তেইশ বার্ষিকী। হো হো হো।

ব্যাপারটা কিন্তু হাসির নয়। আমি বুঝতে পারি, জীবিকা এইভাবে গুঁড়ি মেরে থাবা বসিয়েছে একজনের হৃদয়বৃত্তিতে। সৎ, সতর্ক, সচেতন থেকেও প্রশান্ত ডুবে গেছে জীবিকার অলাতচক্রে। তার এখন ধ্যানজ্ঞান হলো ডব্লিউ. বি. এস. আর, অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্ভিস রুলস। তার লক্ষ্য হ'লো যেকোন ভাবে রাইটার্সে কায়েম থাকা এবং রিটায়ারমেণ্টের পর কৌশলে এক্স্‌টেনশন আদায়। তার একমাত্র পাঠ্য হলো সরকারি ফাইল। একমাত্র লেখ্য হলো সেই ফাইলে নোট দেওয়া।

আমি জানতে চাই, 'অফিসে তুই কি করিস?'

প্রশান্ত বলে, 'প্রিসাইসলি আমার দুটো কাজ। ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট তো। কাজেই বিভিন্ন ডিপারমেণ্ট থেকে যেসব প্রপোজাল আসে তা প'ড়ে অবজেকশন দিই। আড়ালে অনেকে আমাদের বলে আনডুইং ডিপার্টমেণ্টের লোক। তবে সেই অবজেকশন নোট লিখতে হয় খুব প্যাঁচালো ইংরাজিতে। ফুল অব অ্যামবিগুইটি, যার শুরু 'নটউইথস্ট্যাণ্ডিং' জাতীয় বাক্য গঠনে। বুঝেছো?'

: বুঝেছি, ক্লাশে যে-চমৎকার ইংরেজিতে ক্রিটিকাল অ্যাপ্রিসিয়েশন লিখতিস্ তার পরিণতি এখন 'অ্যাজ পার জি-ও-নম্বর অ্যাতো' এইতো ?

: শুধু তাই নয়। আমার লক্ষ্য এখন মিনিস্টার'স অ্যাপ্রিসিয়েশন লাভ করা। সেই সুবাদে চীফ সেক্রেটারির একটু বদান্যতা···এই আর কি।

: তোর পরিচয় এখন তাহলে ?

: কীপার অ্যাণ্ড কালেকটর অফ পারসোনাল পেপার্স।

: তার মানে ?

: তার মানে, আমার পজেশনে আছে নিজের নিয়োগপত্র, লেটার অফ কনফার্মেশন, পে-শ্লিপ, এফিসিয়েন্সি বার ক্রসিং সংক্রান্ত কাগজ, প্রতিটি ট্রানসফার অর্ডার, জয়েনিং রিপোর্টস, কপি অফ দি রিপ্রেজেনটেশনস্, সার্টিফিকেট, স্পেশাল-পে অর্ডারস, অ্যাপয়েন্টমেন্ট গেজেটের জেরক্স কপি, লিভ রেকর্ডস, প্রতি বছরের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অ্যাকাউণ্ট, স্যালারি সার্টিফিকেটস্, হাউস বিল্ডিং লোনের জমাখরচের হিসেবে, সার্ভিস লাইফে যত মামলা হয়েছে তার রায়ের কপি, লাস্ট পে-সার্টিফিকেটস আর কতকগুলো নম্বর···

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'এর পরে আবার নম্বর কিসের ?'

প্রশান্ত বললো, 'শুনে যাও, ৭১১ সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট নম্বর, ২০০৪ ব্যাঙ্ক লকার, ডব্লু জি ই ৪০৩ আমার পিক আপ গাড়ির নম্বর, এক্সটেনশন নম্বর ৫৮ ফিনান্স মিনিস্টার, ৪১ সেক্রেটারি, ১২ চীফ সেক্রেটারি, ৪৪-০৫৭৪ মিনিস্টারস রেসিডেন্স।'

আমি বললাম, 'দাঁড়া দাঁড়া। দম বন্ধ হয়ে আসচে।'

'তা বললে হবে কেন বন্ধু', প্রশান্ত ব'লে চলে, 'এখনও একগাদা বাকি; শুনে রাখো আমার ইণ্ডেন গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যা ২৫২৫, মাদার ডেয়ারির কার্ড নম্বর ৩২১, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অ্যাকাউণ্ট নম্বর ডব্লু বি পি ফি ৫২১৩, বাড়ির হোল্ডিং নম্বর পি ৭৮০···'

: এর কি শেষ নেই ?

: কী ক'রে থাকবে ? এর সঙ্গে বরং ক্রমে যোগ হবে। যেমন ছেলের জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার সিলেবাস, মেয়ের টার্মিনাল পরীক্ষার মার্কসিট, সুকল্পার গেঁটে বাতের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের নাম ও ডোজ, আমার রক্তে সুগারের মাত্রা, রক্ত-চাপের সর্বাধুনিক অঙ্ক···

: থাম থাম। এর জন্যে তোর কষ্ট হয় না ?

: কষ্ট কেন হবে ? এটা তো একটা স্যাটিস্ফ্যাকশন। খুই জানিস এটা কত গর্বের ব্যাপার ?

: গর্ব কীসের ?

: তুই রাইটার্সের যেকোনো ডিপার্টমেণ্টে যা, দেখবি সব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, প্রায় সব ডেপুটি সেক্রেটারি, সেক্রেটারি, প্রশান্ত বোসের কথা জানে। কোনো সরকারি অর্ডারের সমস্যা বা প্রিসিডেন্স-রেফারেন্স জাতীয় ব্যাপারে সবাই রেফার করবে 'গো টু প্রশান্ত বোস অফ দি ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট'। এটা গৌরবের নয় ? অল দি রেলেভেণ্ট গভর্ণমেণ্ট নোটিফিকেশনস অ্যালং উইথ দেওয়ার স্থপারসেশান অর্ডারস্ অ্যাণ্ড করিজেণ্ডাম আমার মুখস্থ।

প্রশান্ত এবারে সত্যিকারের প্রশান্তমুখে চুরুট ধরালো। আমি ছোটবেলা থেকে দেখা সেই আসল প্রশান্তকে দেখতে পেলাম না। দেখলাম সামনে ব'সে আছে এক শুষ্কং কাষ্ঠং, ঝুনো, স্মৃতিসর্বস্ব উন্মাদ। জীবিকা যার জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে কামড়ে ধরেছে। যেন বাঘের মুখে অসহায় মড়ি। খুব কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রশান্ত, তুই কি কিছুই ভুলিস না ?

'হ্যাঁ' প্রশান্ত বললো, 'এই তো ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ভুলেছি, এমনকি বিয়ের বছরটাও। ভুলে যাই বাবা-মা'র মৃত্যুদিন, ছেলেমেয়েদের জন্মদিন, খুড়তুতো ভাইদের নাম। ভাইপোদের চাকরি-বাকরির ডিটেলস্ মনে থাকে না। শ্বশুর বাড়ির বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটা মনে রাখতে পারি না। আমার নিজের জন্মদিন বুঝতে পারি যখন ছেলেমেয়েরা কেক কাটে। তখন ক্যালকুলেট করি, আরে আর তো পাঁচ বছর সার্ভিস, সর্বনাশ।'

: তা হলে সামাজিক এতসব দায়দায়িত্ব, পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠান, নেমন্তন্নের নোকুতো এসব তোদের কে সামলায় ?

: সব স্থকল্পা। দশভুজা পঞ্চাননী। আমাদের বাড়িতে একজন কর্তব্যময়ী নারী আছে ভুলে যাও কেন ? আসা মাত্র স্থকল্পা তোমার গিন্নি আর ছেলেমেয়ের কুশল আর খোঁজ নেয় নি কি ? শোনো, তোমাকে একটা সার কথা বলি : এভরি সাকসেসফুল বুরোক্র্যাট মাস্ট হ্যাভ এ রেসপনসিবল অ্যাণ্ড প্রেজেণ্টেবল ওয়াইফ। সেই ক্যালকুলেশনে ভুল হলেই চিত্তির। জীবিকার সাফল্য আসলে জীবনসঙ্গিনীর নির্বাচনের ওপর বুঝলে ?

বোঝা অবশ্য সত্যিই কঠিন, কেননা আমি নিজে বুরোক্র্যাট নই এবং সমাজের বেশির ভাগ লোকই তা নয়। প্রশান্ত ছাড়াও এদেশে অনেক বুরোক্র্যাট

আছেন, তাঁরাও যে সবাই প্রশান্তর মতো নয় সেও তো বুঝি। তবু প্রশান্তও সত্যি, তার জীবিকাসমেত। এটা তো ঠিকই যে তার জীবন-জীবিকা তার মনের সরসতাকে কঠিন ক'রে দিয়েছে। তার গ্রহিষ্ণুতা কেবল সাড়া দেয় কতকগুলি সংখ্যা আর যান্ত্রিক আইনের জগতে। ভাবতে ইচ্ছে করে তবে কি মানুষের শরীরও গড়ে ওঠে জীবিকার দায়ে বা ধরনে। সেই ভাবনায় হঠাৎই ঝলক দিয়ে ওঠে শশিপদ-র ছবি। শশিপদ আমার ভাইয়ের স্কুলের বন্ধু। লেখাপড়া বেশিদূর করতে পারে নি, বাবা মারা যাওয়ায়। জাতে তারা মালাকর।

* * * *

আমাদের শহরের প্রান্তে রাজবাড়ির চারপাশে বিচিত্র সব জীবিকার মানুষ বাস করে। সেই জীবিকার ধরন অনুযায়ী পাড়াগুলোর নাম। যেমন চুনুরিপাড়া, নলুয়া-পাড়া, নুড়িপাড়া, স্যাকরাপাড়া, ঘোষপাড়া, মালাকরপাড়া, ভট্টপাড়া। এমন সব জীবিকার মানুষদের একদা একঘর-দুঘর এনে জমি দিয়ে রাজাই বসত করিয়ে-ছিলেন। ভট্টরা করতেন পুজো, নুড়িরা গয়নায় পাথর সেটিং করতো, ঘোষদের কাজ ছিল দুধ জোগানো। তেমনই মালাকররা রাজবাড়ির বাগান সামলাতো, পুজোর ফুল সরবরাহ করতো। শশিপদর ঠাকুর্দারও বাবা প্রথমে এখানে আসেন। তো সেই জাতবৃত্তি শশিপদ-র বাবা পর্যন্ত চলেছে। কিন্তু হঠাৎ তিনি মারা যেতে শশিপদ কী আর করে? রাজবাড়ির ফুলগাছগুলো সারা বছরের মতো জমা নিয়ে মালার ব্যবসা শুরু করে দেয়। তখন তার বয়স বারো। তার বিধবা মা আর ছোট বোন ফুল সংগ্রহ ক'রে এনে সারাদিন মালা গাঁথতো। গাছে উঠে ফুল পেড়ে দিতো শশিপদ। আহামরি ফুল কিছু নয়। কাঠচাঁপা, জবা, রঙ্গন, করবী, টগর, কলকে, গাঁদা, বকুল। অবরে সবরে চাঁপা কি গন্ধরাজ বা বেলি। সেইসব ফুলে ছোট ছোট মালা গাঁথিয়ে নিয়ে একটা কাপড়ের ঝোলায় ক'রে শশিপদ বেলা তিনটে নাগাদ বেরিয়ে পড়তো। পরণে শুদ্ধবস্ত্র, খালি পা। তার কাজ হলো সন্ধ্যের মধ্যে শহরের বেশির ভাগ দোকানের গণেশ মূর্তিতে মালা পরানো। তার জন্যে বরাদ্দ দিনে দশ পয়সা, কারুর বা মাসকাবারী বন্দোবস্ত।

কাজটি কঠিন এবং আয়াসসাধ্য। কেননা বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত খুব দ্রুতপায়ে হেঁটে তাকে শ' দুয়েক দোকান কভার করতে হ'তো। ক্রমে বুঝতাম শশিপদ তার জীবিকার দায়ে যন্ত্রের মতো হয়ে যাচ্ছে। হয়ত কলেজ থেকে ফিরছি, চোখে পড়লো দ্রুত ধাবন্ত শশিপদকে। শুধু যে পুজোর মালা বইছে ব'লে সে খালি পায়ে হাঁটে তা নয়, ক্রমে বুঝতে পারি, অত জোরে হাঁটতে গেলেও

তো পা খালি রাখাই দরকার। আরেকটা হিসেবও সে হয়ত অভিজ্ঞতা থেকে করেছিল। দুশো দোকানে দুশো বার জুতো খোলা পরাও তো খানিকটা সময়ের ক্ষতি।

তবে মজা এই যে, শশিপদকে নিয়ে আমার এত ভাবনার কথা সে জানবে কী ক'রে? কিন্তু আমি সেই উত্তীর্ণ কৈশোর সময় থেকে নজর রেখে গেছি তার দিকে। কলেজ জীবন শেষ হয়েছে, কলকাতায় পড়তে গেছি, ক্রমে এই শহরেই হয়েছি অধ্যাপক। তবু শশিপদ সম্পর্কে কৌতূহল কমে নি। অবশ্য সে কৌতূহল নিতান্ত আলগা রকমের। তাই কখনই জানতে চাইনি সে বিয়ে করেছে কিনা, সন্তানাদি কি, বা মা এখনও বেঁচে আছেন কিনা। তার পিঠোপিঠি প্রশ্ন জাগতে পারতো কে তার অত মালা এখন গেঁথে দেয়। এ সব প্রশ্ন যেন কিছুটা অবান্তর। যেমন সূর্য ওঠে, সন্ধ্যে হয়, ফুল ফোটে, বাতাস বয়, তেমনই বোধ হয় শশিপদও কেবলই ফুলের মালা ঠিক পৌঁছে দেবে। নিপুণ অভ্যস্ততায়, দ্রুত ধাবমানতায়, শুদ্ধাচারে। পৃথিবী এগোবে, ফুটপাতে দোকানের সংখ্যা বাড়বে, শশিপদ-র গ্রাহকও বাড়বে, জুটবে দুয়েকজন সমবৃত্তির মানুষ। তবু জানি শশিপদ থাকবে অপ্রতিহত, এ-শহরের নিত্য দ্রষ্টব্যের মতো অবাধ। তাই ব'লে কি বয়স তার শরীরে থাবা বসাবে না? কমবে না কি তার দ্রুত চলার ছন্দ? রোগভোগ কি তার হ'তে নেই?

এসব কথাও তেমন ক'রে ভেবেছি কই? আমারও তো একটা জীবন আছে, আছে জীবিকা। তা কি আমাকেও ভেতরে ভেতরে নির্মাণ করে চলছে না?

সেই নির্মাণ খুব গোপন হয়ত, স্বভাবে অন্তঃশীল। চারপাশের অভিজ্ঞতাময় জীবন আর পরিবেশ খুব আলগা ক্ষরণের মতো মনের ভেতরে বোধ গড়ে তোলে। সে ব্যাপার বোঝাতে গেলে আপাতত শশিপদ-র কথা রেখে শীলার কথা বলতে হয়।

শীলা নামটা সিলিয়া নিজেই তৈরি করে নিয়েছিল। জাতে ক্যাথলিক খৃস্টান। সিলিয়া তার খৃষ্টীয় নাম। হিন্দু বাড়ি কাজ ক'রে খাওয়াই ছিল তার জীবিকা, তাই ধ্বনিসাম্য রেখে নাম বলেছিল শীলা। আমাদের বাড়িতে সে বহুদিন কাজ করেছিল খুব যোগ্যতার সঙ্গে। সামান্য কিছু অনুগ্রহ পেলে বা উপহার, সে বলতো 'ধন্যবাদ'। বাড়ির কাজের লোকের কাছে এমন সৌজন্য আমরা কখনও পাই নি। এই সৌজন্যের ভাষা সে শিখেছিল চার্চের বিদেশী ফাদারদের কাছে। সেবাব্রতী এই মাঝবয়সী বিধবা নানা কারণে আমাদের ছোট্ট পরিবারে তরঙ্গ তুলেছিল। তার কথা তাই এখনও আমরা বলি। একদিন বাজার করে

এসে শ্রান্ত হতাশ ভঙ্গিতে বুঝি স্বগতভাবেই ব'লে ফেলেছিলাম, 'নাঃ, আর বোধ হয় মাংস খাওয়া যাবে না, যা দাম বেড়ে চলেছে।' কথাটার লক্ষ্য ছিলেন নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী। শীলা বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও ঝাঁট দিচ্ছিলো। হেঁকে বলে উঠলো, 'দা'বাবু, শুয়োরের মাংস খাওয়া ধরুন। খুব সস্তা।'

গিন্নি রাগতভাবে বললেন, 'কেন ? শুয়োরের মাংস খাব কেন ? ছিঃ।'

শীলা হেসে বললে, 'কেন ? আমরা তো খাই। ফাদাররা খায়। সব মাংসই তো এক। না খেলে কোনো মাংসই খাওয়া চলে না। সবই অব্যেসের ব্যাপার।'

অমোঘ যুক্তি, কিন্তু কাজের লোক এসব কথা বলবে কেন, আমাদের অস্বস্তি ছিল বোধ হয় তাই নিয়ে।

আরেকদিন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন, 'মিউনিসিপ্যালিটিতে খবর দাও। আমাদের পায়খানার চেম্বার ভরে গেছে। আবার খরচের ধাক্কা মাসের শেষে।'

শীলা বললো, 'দি'মণি, কত খরচ লাগে ?'

: তিরিশ-চল্লিশ টাকা তো বটেই।

: আমাকে কুড়ি টাকা দিন। সাফ করে দেবো।

: ছিঃ, তুমি না আমাদের বাড়ি কাজ করো ? আর তুমি অ্যাতো নিঘ্‌ঘিন শীলা ?

: এতে ঘিন্নার কী আছে দি'মণি। সব কাজই তো কাজ। কেউ না কেউ তো করবেই। আসলে তো টাকা।

'আসলে তো টাকা' শীলার এই বাক্যই তার জীবনদর্শন। তার জীবিকা সুদূরবিস্তৃত ও বিচিত্র। ক্রমে জানতে পারি জীবনে বহুরকম কাজ করেছে সে, করতে চায়। জীবন আর জীবিকা নাকি অপরিমিত সম্ভাবনার উৎস।

অবশ্য যেমন হয়, কোনো একদিন শীলা কাজ ছেড়ে দিলো। না, কোনো মনোমালিন্য নয়, বাঁধা কাজ তার একঘেয়ে লাগে। আপাতত সে কিছুদিন চার্চের বাগানে ফুলের তদারকি করবে। তার পর দেখা যাক যিশু কোন্ দিকে টানেন। এর পর নানা সময়ে নানা জীবিকায় তাকে দেখেছি। যেমন একদিন জজকোর্টের প্রান্তে হঠাৎ সরু গলায় ধ্বনি উঠল, 'দা'বাবু কেমন আছেন ? দি' মণি ?'

: আরে শীলা এখানে কি করছো ?

: দেখছেন না চায়ের দোকান দিয়েছি। ছেলে ড্রাইভারি করে। কিছু কাঁচা পয়সা হয়েছে। ভাবলাম দেখি স্বাধীন ব্যবসা করে কদিন। চা খান এক কাপ সিলিয়া মণ্ডলের হাতে।

চায়ে চুমুক দিয়ে চলি, 'এ ব্যবসা কদিন চলবে ?'

: দেখি, কদিন মন বসে। রোজগার ভালোই।

চায়ের দাম দিতে যেতেই বলল, 'ধন্যবাদ দা'বাবু। আবার আসবেন। যদি অবশ্য তদ্দিন দোকান থাকে। হি হি।'

জীবনের নানামুখী সমারোহে আর ব্যস্ততায় শীলার কথা কদিন মনে থাকতে পারে ? তাই স্বভাবতই তার কথা মনে থাকে নি। গিন্নির কাছে হঠাৎ বেশ ক'বছর পরে শোনা গেল শীলার উপাখ্যান। তার বোন এমিলিয়া নাকি একদিন এসে কান্নাকাটি করে দিদির নামে গালমন্দ শাপশাপান্ত করে গেছে। কী ব্যাপার ? জানা গেল, অন্যের সাজানো ঘর ভেঙে দেওয়াও নাকি শীলার একটা মজার জীবিকা। আপাতত তার নজর পড়েছে এমিলিয়ার দিকে। অবশ্য দোষ তারই। মাস দুই আগে পেটে অপারেশন হয়েছিল বলে এমিলিয়া তার দিদিকে এনেছিল সংসার সামলাতে। বর আর বাচ্চাদের দুটো জলভাত তো দিতে হবে। সে তো বিছানায় শোওয়া।

তা যত্ন আত্তিতে ত্রুটি করে নি শীলা। তবে ইছাপুর অঞ্চলে কোনো কারখানায় কর্মরত ভগ্নীপতির দিকে টান যেন একটু বেশিই তার। সেই টান বাড়তে বাড়তে এমনই দশা যে এমিলিয়ার সংসারে ভরাডুবির অবস্থা। কান্নাকাটি ক'রে সে সব কথাই বলে গেছে গিন্নিকে। 'ছি ছি, নিঘ্‌ঘিন মেয়েমানুষ। জানেন দিদি, কত জনের যে সংসারে ঘুণ ধরিয়েছে। খুব পয়সা চেনে। ওর ভগ্নীপতি তো কাঁচা পয়সা রোজগার করে আর তার ওপরে খুব খরচে। ব্যাস শাঁখচুন্নি ওকে ধরেচে।'

এই পর্যন্ত আক্ষরিক রিপোর্টিং দিয়ে গিন্নি গলা নিচু ক'রে মুখ রাঙিয়ে বলে, 'আরো কি বললো জানো তো ? বলল, "কী ঘেন্নার কথা দিদি, এই বুড়ো বয়সে ঐ জাত সাপটা ছোট জামা পরছে"।

সত্যিই অবাক লাগে ভাবতে। চাকদহের ইনটিরিয়র কোন্ গ্রামে নাকি থাকে দুজনে ; টালির ঘরে। ভগ্নীপতি নিশি ভোরে সাইকেল চ'ড়ে স্টেশনে এসে ইছাপুরের ট্রেন ধরে। সাইকেলের রডে ব'সে আসে শীলা। খুব হাসিঠাট্টা মস্করা চলে। সারাদিন কোথায় কোথায় কীসব কাজ করে। তার পরে কারখানা ছুটির পর একই ট্রেনে ফিরে সাইকেলে চেপে টালির ঘরে। জমাটি জীবন নাকি। শুনে আলাদা ভাবে মনে হয় মন্দই বা কি ? জীবনের একটা সহজ চলন আর ছন্দ আছে এমন সংসারে, একটা অবাধ আনন্দ। দুজনেরই জীবনে হয়তো কোনো গূঢ় অভাব ছিল। অসমবয়সী, অসামাজিক সম্পর্ক, তবু কোথায় আমার মনের

একটা অনুমোদনও থাকে। কতদিন সম্পর্কটা টিঁকবে অবশ্য বলা শক্ত। এমিলিয়ার সংসারটা ভেঙে গেল এই যা। নিজের দিদি এসে ভাঙলো এও কি কম পরিতাপের? কিন্তু অন্য কোনো মেয়ে এসেও তো সংসারটা ভেঙে দিতে পারতো। শীলাকে আমার নিঘ্‌ঘিন লাগে না। লাগে না তার কারণ, আমি তো নীতির পরকলা প'রে জীবনকে দেখতে বসিনি। আর আমার দেখা না-দেখায় কী ই বা এসে যায় এতবড় সংসারের আপন চলার মর্জিতে? আমি বড়জোর নিস্পৃহ থাকতে পারি তাদের সম্পর্কে, তবে নিরুৎসুক নয়। কেননা আমি সন্ত নই। জীবনের স্বাভাবিক ধর্মেই আমার জানতে ইচ্ছা করে কেমন আছে তারা। একটা মেটে টালিছাওয়া ঘরে শ্রমজল পাত ক'রে খেয়ে ঘুমিয়ে খেটে দু'দণ্ডের শান্তি কি তারা পেয়েছে? বিশ্বাস না থাক, থাক না সংশয়, তবু আসক্তি আছে তো? দুজনের জন্যে দুজনের দারুন টান?

হঠাৎই একদিন দেখা শীলার সঙ্গে। ভাটপাড়া গিয়েছিলাম একটা কাজে। ফিরছি কাঁকিনাড়া স্টেশন হ'য়ে ট্রেন ধরে কলকাতামুখী। ফাঁকা গাড়ি। দুপুরের দিক, তায় নৈহাটি লোকাল। সহসা সরু গলায় ডাক উঠলো, 'দা'বাবু কোথায় চললেন? দি'মণি কেমন আছেন? মেয়ে?'

তাকিয়ে দেখি শীলা। তাকে খুব একটা ভরভরন্ত সুখী দেখালো না অবশ্য। তবে পাপিষ্ঠা বা পাষণ্ড ব'লেও মনে হ'লো না। জ্যৈষ্ঠের দারুণ গরমে আর রোদের তাপে আসলে সে ঝলসে গেছে। যেন বহুদূর থেকে কোনো ভারি জিনিস বয়ে এনে সে একটু দম নিচ্ছে। আঁচলে বার বার ঘাম মুছছে। যদিও জ্যৈষ্ঠ মাসের এমন দুপুরে ইলেকট্রিক ট্রেনই তো একরকম ফার্নেস। যা হোক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চলন্ত ট্রেনের বাতাস খেয়ে একটু জিরিয়ে আমার সামনে এসে বসলো। তার হাতে দুখানা বড় কালো রেশন ব্যাগ, সেটার মুখে পলিথিন চাপা।

আমি বললাম, 'ভালো আছি। তুমি এসময়ে কোথা থেকে?'

একগাল জীবনরসে-ভরা হাসি হেসে সে বললো, 'শুনেচেন তো সব এমিলিয়ার মুখে। খুব নিন্দে মন্দ করেচে তো? যাক গে, আমি তো চিরকালের খারাপ মেয়ে। বাদ দিন।'

: এখানে কোথা থেকে এসে উঠলে?

: সে তো লম্বা ঘটনা। ভোর রাতে তার সঙ্গে সাইকেলে চেপে এসেছি চাকদা ইষ্টিশনে। সেখান থেকে সে ট্রেনে চেপে গেছে কারখানায় আর আমি

নেমেছি নৈহাটি। সেখানে দু বাড়ি কাজ সেরে, জল-খাবার খেয়ে, ৮৫ নম্বর বাসে চেপে গেছি জগদ্দলের মুসলিম বস্তিতে।

আমি শংকিত কণ্ঠে বলি, 'সে তো সাংঘাতিক জায়গা। সেখানে আবার তোমার কি?'

শীলা গলা নামিয়ে বললো, 'সেখানে সস্তায় গরুর মাংস পাওয়া যায়। তাই কিনেছি তিরিশ কেজি। এই যে ব্যাগে।'

: সে কি? তার পরে কোথায় যাচ্ছো?

: এবারে যাবো পার্ক সার্কাসে একটা হোটেলে। কলকাতার যা দাম তার অর্দ্ধেক দাম এই জগদ্দলে দা'বাবু। আর সঙ্গে সঙ্গে দাম দিয়ে দেবে। বেশ লাভ থাকে।

আমি, যাকে বলে, চমকিত। এমন জীবনও হয় নাকি বা এমনতর জীবিকা? এত বড় তার বিস্তার? এত পথ পাড়ি দেওয়া? এ সবই আমার বোধে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ভেতরে আমাকে নির্মাণ করে। বুঝতে পারি, এতসব ভ্রাম্যমাণ সক্রিয় মানুষ দিকে দিকে সবাই কি ভ্রমণে যাচ্ছে? এদের বেশির ভাগই ছুটেছে জীবন আর জীবিকার অদ্ভুত ফেরে। পাশে-বসা নিরীহ চেহারার মানুষটা হয়তো এক রোমাঞ্চকর জীবিকার সঙ্গে জড়িত। জানি না। কিন্তু অদ্ভুত কোনো পরিস্থিতিতে জানতেও পারি। সেবার তো তেমনই ঘটেছিল।

তখন ছয়ের দশকের শেষ ভাগ। যুক্তফ্রণ্টের আমল চলছে। দিকে দিকে কেবলই বাঁধভাঙা জনোচ্ছ্বাস। কথায় কথায় বন্‌ধ আর ঘেরাও। আমি একটা জরুরি খবর ব'য়ে নিয়ে কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলাম। রানাঘাটে এসে জানা গেল কৃষ্ণনগরের দিকে আর ট্রেন যাবে না। রেললাইনে জন অবরোধ। রানাঘাট থেকে শান্তিপুর হয়ে বাই রোড যাওয়া যায় না? অন্তত লরি চেপেও? না, রাস্তাও পড়েছে অবরোধের কোপে। হাঁচোর পাঁচোর করছি কী করি কী করি। একবার প্লাটফর্মে যাই একবার রাস্তায়। হঠাৎ একজন মাঝ-বয়সী অভিজ্ঞ চেহারার মানুষ এগিয়ে এসে বললেন, 'কেষ্টনগর যাবেন?'

আমি তাঁর চাঁদির চশমা ভেদ ক'রে বহুদর্শী চোখ দুটোর অতলতা মেপে নিয়ে বললাম, 'কেষ্টনগর যাব শুধু নয়, যেতেই হবে। একটা জরুরি খবর আজ না দিলেই নয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমারও একটা জরুরি কাজে না গেলেই নয়। মানে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে পৌঁছোতেই হবে। এখন বারোটা বাজে।'

: কিন্তু কীভাবে যাবো বলুন তো ?

: খরচে রাজি তো ? তবে শুনুন, খবর নিয়েছি রানাঘাট থেকে বগুলা ট্রেন-লাইনে বন্ধ নেই, সাড়ে বারোটায় গাড়ি। তার মানে একটায় পৌঁছবো বগুলা। সেখান থেকে সতেরো মাইল রিক্সায় কেষ্টনগর। যা খরচ লাগে তার বারোআনা আমার, চারআনা আপনার, রাজি ? আসলে আমার একজন সঙ্গী চাই। আপনাকে দেখে ভরসা হচ্ছে। লোক চিনতে আমার ভুল হয় না। আমার সঙ্গে অনেক টাকা আছে। রাজি তো ? তবে চলুন।

শুরু হয় এক অসম যুগলভ্রমণ। কেউ কাউকে সম্যক চিনি না, কোনোদিন কেউ কাউকে আগে দেখিও নি। তবু প্রয়োজন আর একমুখী গন্তব্য দুজনকে আপাতত চমৎকার বেঁধে ফেলেছে। এও মনের মধ্যে একধরনের নির্মাণের বোধ তৈরি করে।

রানাঘাট-বগুলা ট্রেনযাত্রায় সামান্য পথ, সহজেই পৌঁছে যাই। কিন্তু বগুলা থেকে কৃষ্ণনগর রিকশায় যেতে অনেকটা, তাই তেমন সবল শক্তসমর্থ অথচ ইচ্ছুক রিকশাচালক পাওয়া কঠিন। বিশেষত এইজন্যে যে আমাদের পৌঁছে দিয়ে তাকে ফিরতে হবে কৃষ্ণনগর থেকে একেবারে একা। যাহোক সঙ্গী ভদ্রলোকের কর্ম-দক্ষতায় ও কথায় ভিজে একজন রিকশাঅলা রাজি হলো, তবে বলে বসলো, 'বাবু এখনও আমার খাওয়া হয় নি। আপনেরা বসুন, আমি এক দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে দুটো ভাত মেরে আসি।' তথাস্তু।

ইত্যবসরে আমরা পরিচয়-পর্ব সেরে নিলাম। ভদ্রলোকের নাম হাজারিলাল ইন্দ্র। জাতে ময়রা। খোদ কলকাত্তাই। নিবাস আইরিটোলা। ক্যানিং স্ট্রিটের এক মাড়োয়ারীর ফার্মে কাজ করেন আজ তিরিশ বছর।

'কি কাজ করেন ?' আমার এই সকুতূহল প্রশ্নে তিনি রহস্যময় হাসি হেসে বলেন, 'সব রকম কাজ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।'

: তবু স্পেসিফিক কিছু তো থাকে ?

: না। যেদিন যেমন। কোনোদিন তাগাদার কাজ কোনোদিন আবার মাল সাপ্লাই, তো আরেকদিন লালবাজারে তোলা পৌঁছানো। ওসব বাদ দিন। আপনি লেখাপড়া নিয়ে আছেন। অত ঘোরপ্যাঁচ বুঝবেন কেন ?

বোঝা অবশ্য কঠিন। তবে এটুকু বুঝি যে, এমন জীবিকাও থাকে যার কোনো নির্দিষ্ট ধরন নেই। অনেকটা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম গোছের। এক্ষেত্রে কর্তা বলতে সিলিয়ার মতো যদৃচ্ছা নয়। কর্তা এখানে এক বেওসাদার মাড়োয়ার নন্দন,

যার কর্ম বিচিত্র ও বহুধাবিস্তৃত। নইলে হাজারিবাবু এখন এত আত্যন্তিকভাবে কেনই বা যাবেন কৃষ্ণনগর। সঙ্গে নাকি তাঁর আবার অনেক টাকা। শরীরের কোন্ অতলপ্রদেশে কোন্ গূঢ় পদ্ধতিতে সে টাকা গুপ্ত আছে কে জানে। ভদ্র-লোককে বেশ ঝাড়া হাত-পা দেখাচ্ছে।

একেবারে অচেনা পথ ধ'রে রিক্সা এগোতে লাগলো। পাশে সম্পূর্ণ অজানা এক বহুদর্শী ওস্তাদ মানুষ। তিরিশ টাকায় রফা হয়েছে। রিকশাঅলা যুবকটি বাক্যবাগীশ। দেশ কাল সমাজ সম্পর্কে নানা মন্তব্য সে অযাচিত ভাবে ক'রে চললো। তার বাক্য থেকে বোঝা গেল সে রাজনৈতিকভাবে কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী। এই যে বন্‌ধজনিত আজ আমাদের হয়রানি তাতে তার সায় আছে। 'চারি দিকে শোষিত মানুষ জাগছে'—কথাগুলো তার মুখে সেই সাতষট্টি সালে শুনে বেশ চমকে গিয়েছিলাম। তাকে ব্যঙ্গ ক'রে দক্ষিণপন্থী হাজারিবাবু বললেন, 'আজ হাওয়া ঘুরেছে ব'লে এসব বুলি আওড়াচ্ছো। তার পরে কংগ্রেস গদী পেলেই মতটা পাল্‌টে যাবে না তো?'

'কী যে বলেন বাবু' রিকশাঅলা একগাল হেসে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'একটা সার কথা তবে শুনেন। কম্যুনিস্ট পার্টি একেবারে অন্যরকম।'

: কী রকম?

: একবার দাগছাপ পড়লে আর অন্যরকম হওয়া যায় না।

কথাকটি সেই আথান্তরের মধ্যেও মনে লেগেছিল। কিন্তু সে সব আনৃশান্ কথাবার্তার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হচ্ছিল যে, হাজারিবাবু নানান উল্‌টো পাল্‌টা আলাপ চালিয়ে তাঁর নিজের প্রসঙ্গ চেপে রাখতে চাইছেন। এটা বুঝতে পেরেই খানিকটা যেন জেদের বশে আমি তাঁকে চেপে ধরি। 'কৃষ্ণনগরে কোথায় যাবেন হাজারিবাবু?' আমার প্রশ্ন শুরু হয় এতই নিরীহ ভাবে। 'ফরেস্ট অফিস' হাজারিবাবুর জবাব যেন একটা সহজ গুডলেংথ বল রুখে দেওয়া। ক্রমে আমার বলে স্পিন আসে এবং হাজারিবাবুর নীরবতা, চাতুর্য আর গাম্ভীর্যের তিনখানি উইকেটই পড়ে যায়। তাঁকে সরব হ'তেই হয় আর আমি কুড়িয়ে নিই জীবন-জীবিকার কিছু বিচিত্র বোধ।

হাজারিবাবু বোঝান, 'ফরেস্ট বোঝেন তো? তা হ'লে এটাও বোঝেন যে প্রত্যেক বড় বড় ফরেস্ট ঘেরা থাকে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে। আমার মালিক রামানন্দ ছোচ্ছরিয়া সেই কাঁটা তারের সাপ্লায়ার। আর কি জানতে চান?'

: জানতে চাই সেই কাঁটা তারের জটিল গল্পটা। আপনি তো আর এমনি

এমনি একগাদা টাকা নিয়ে ফরেস্ট অফিসে যাচ্ছেন না? আপনি কি সেখান থেকে কাঁটা তার কিনবেন? আপনি তো বেচ্‌নেবালা, কিন্‌নেবালা তো নেহি।'

: বাপ রে। আপনি যে একেবারে ঠেট হিন্দি জবান দিলেন। আর কথাও তো বেশ বলেন।

: আশ্চর্যের কী পেলেন এতে? আমি তো কলেজে পড়াই। কথা বেচে খাই জানেন তো?

হাজারিবাবু জিভ কেটে বললেন, 'কি যে বলেন স্যার। আপনারা লেখাপড়া-জানা মানুষ। কথা বেচবেন কোন্ দুঃখে? আপনাদের ভেতরে ভর্তি হয়ে আছে জ্ঞান আর বিদ্যে। কথা বেচি আমরা, কেননা নয়কে ছয় করতে হয় আমাদের। বুঝলেন?'

আমি বললাম, 'এখনও বুঝিনি। বিশেষত আপনার ঐ কাঁটাতারের রহস্য-কাহিনী। রামানন্দ ছৌছরিয়ার কথাও জানি নি এখনও।'

: শুনুন তবে। আপনি তো ছাড়বেন না। কথাটা হ'লো এই যে, সব ফরেস্ট ঘেরা থাকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে। জিনিষটা দেখেছেন তো? গিঁট দেওয়া দেওয়া? তো সেই তার নষ্ট হয়ে যায়, অনেকে ফরেস্টের মাল চুরি করতে এসে তার কেটে দেয়। তাই মাঝে মাঝে, ধরুন বছরে একবার অন্তত সেই হুন্দর হুন্দর কাঁটাতার ফরেস্ট থেকে অক্‌শন ডেকে বেচে দেয়।

আগ্রহ নিয়ে এক অজানা জগতের গল্প শুনতে শুনতে বলি, 'তার পরে সেই তারকাঁটা কী হয়?'

: কি আবার হয়। রামানন্দ কি শ্যামানন্দরাই সড় ক'রে সেগুলো কিনে নেয়। তার পরে আর একটু তারকাঁটা জুড়ে, গিঁট বেঁধে, আলকাতরা লাগিয়ে ফের সেটাই নতুন রেটে সাপ্লাই দেয়।

: তার মানে অরিজিন্যাল সাপ্লায়ারও রামানন্দ কিংবা শ্যামানন্দ?

: সে তো বটেই।

: এর মাঝখানে তা হলে নিশ্চয়ই মোটা টাকার খেলা। তাই না?

হাজারি ইন্দ্র উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'মাস্টারি করলে মানুষ বড় সরল হয়ে যায়। এটা তো পষ্ট কথা যে, তারটা যেমন কে তেমনই থাকে। ফরেস্টের বাবুরা যে-তারকাঁটাকে কনডেম করেন, পরে টাকা খেয়ে সেটাই নিয়ে নেন। এবার বুঝেছেন তো যে কেন আমার কাছে অনেক টাকা আছে?'

: তা বুঝেছি। কিন্তু বুঝি নি যে আজকেই তড়িঘড়ি আপনাকে একেবারে সাড়ে চারটের মধ্যে ফরেস্ট অফিসে পৌঁছতে হবে কেন ?

: কারণটা সোজা। আজকেই একটা টেণ্ডার ওপেন করবে এবং সেটা আমাকে বাগাতে হবে রামানন্দ-র তরফে। অবিশ্যি শ্যামানন্দ-র লোকও হয়ত আগে এসে গেছে কিন্তু তারা পাবে না।

: কেন আপনি টাকা বেশি খাওয়াবেন ?

: না স্যার। আমরা ফরেস্টের সব রকম স্টাফকে পুরো পুজো বোনাস খাইয়ে রেখেছি। যাবে কোথায় ? এবারে সব খোলসা ক'রে বুঝলেন তো ?

: একেবারে জলবৎ তরলং। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আপনার প্রাপ্তিযোগ কেমন ?

: হুঁ হুঁ, সার কথা ধরেছেন। বেটা মেড়ো আমাকে দশ হাজার দিয়েছে বাবুদের পান খাওয়াতে। আমি দর কষাকষি ক'রে ওটা ন'য়ে দাঁড় করাবো। হাজার টাকা থাকবে আর কি।

বোঝা গেল এটাও একটা জীবিকা, যাতে বুদ্ধি আর কৌশল হ'লো আসল মূলধন। হাজারিদের খুব বেশি বিদ্যে কোয়ালিফিকেশন লাগে না। একটা বড় নেটওয়ার্কের মধ্যে তাদের বলা চলে গো-বিটুইন। সবই চমৎকার চলে যাচ্ছে, যদিও ফরেস্টের কেউ কোনোদিন রামানন্দকে দেখেই না। তাতে কোনো পক্ষেরই জীবিকা নির্বাহে ক্ষতি নেই। এই অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে আমার মনে পড়ে শ্রীহর্ষ পালিতের কথা।

তখন গ্রামে গ্রামে বোলান গানের রঙপাঁচালি সংগ্রহ করতাম পায়ে হেঁটে। যুক্তফ্রন্ট আমল। রঙপাঁচালি গান আসলে একরকম সোশ্যাল স্যাটায়ার। বর্ধমান মুর্শিদাবাদে চৈত্র সংক্রান্তিতে বোলান গানের দল রঙপাঁচালি গায়। শব্দনগর নামে এক চিত্তচমৎকারী নামের গ্রামে নতুন এক রঙপাঁচালির দুয়েক কলি শুনে বুঝলাম খুব পাকা মাথা থেকে এসব স্যাটায়ার বার হয়েছে। গানটা এরকম :

টেম্পোরারি হাতে ঘড়ি মন্ত্রীমশায়
এই গদী পায় এই গদী যায়।
দিল্লি থেকে সুতো নেড়ে যুক্তফরন্ট
ভাঙছে আবার গড়ছে সব রংফন্ট।

'রংফন্ট' শব্দটা তো নিতান্ত ছাপাখানার শব্দ, তাই জানা ছিল। ছাপাখানায় কম্পোজ করবার সময় যখন একই মাপের টাইপের মধ্যে একটা বেসাইজের টাইপ

ঢুকে পড়ে, তাকে বলে 'রংফনূট'। প্রথম যখন প্রুফ দেখা শিখি, তখন পত্রিকা দফতরে হেড কম্পোজিটার মুরারি রায় রংফনূট বুঝিয়েছিল খুব কৌশলে বলেছিল মুরারিদা, 'আমি হলাম মাতাল গেঁজেল ধান্দাবাজ আর তোমরা সব শিক্ষিত সোনার ছেলে। তা তোমাদের আসরে ব'সে আমি হলাম রংফনূট, বুঝলে ?'

সে যাই হোক ? শব্দনগর গ্রামে অমন ঝকঝকে রঙপাঁচালি শুনে জানতে চাইলাম কে তার লেখক। সবাই বললে, 'শ্রীহর্ষবাবু। আলাপ করবেন ? চলুন।'

টেরিকটনের শার্ট পরা মাঝবয়সের মানুষ শ্রীহর্ষ পালিত। চোখে শৌখিন সোনা রঙের চশমা। খাতির করে বসালেন। বললাম, 'আগে প্রেসে কাজ করতেন বুঝি ?'

: কিসে বুঝলেন ?

: ঐ যে গানে রংফনূট লিখেছেন।

: ঠিক ধরেছেন। কম্পোজিটার ছিলাম। বড্ড একঘেয়ে কাজ। ছেড়ে দিলাম। তার পরে নানা ঘাটের জল খেয়ে এখন···

: এখন ?

: এখন মশাই অদ্ভুত প্রোফেশন আমার। শুনলে অবাক হবেন। সত্যিই কত রকমের যে কাজ আছে। আমি আছি এক মাড়োয়ারির তাঁবে। কী কাজ জানেন ? তার আগে বলুন পেট্রোম্যাক্স বোঝেন ?

: ঐ হ্যাজাক জাতীয় তো ?

: হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। আমি ঐ বস্তু বিক্রি করে বেড়াই। মাইনে প্লাস মোটা কমিশন। বুঝলেন ?

: না, ঠিক বুঝলাম না। পেট্রোম্যাক্স কি বাড়ি বাড়ি বিক্রি হয় ? শুনি নি তো।

: বাড়ি বাড়ি ঠিক বিক্রি হয় না। তবে বিহার শরীফে গরমকালে সাধারণত গ্রামে গ্রামে প্রচুর বিয়ে হয়। সেখানে পেট্রোম্যাক্স খুব বিক্রি হয়। আমার কাজ কি জানেন ? মাড়োয়াড়ির কাছ থেকে একখানা পেট্রোম্যাক্স আর একজন পেটেল নিয়ে চলে যাই আরা দ্বারভাঙ্গা এই দিগরের নানা গাঁয়ে। সব দেহাতি মানুষ, খেতি কারবার। মসলন্দপুরিয়া, ভাগলবান্দি, অন্ধানগর, নীচাপাটিয়া ভেলকোপাই, গহনাবান্দি, পুতামহল, দহলঝুটা, খেতিমখাই···নামের বহর সব শুনচেন ? গ্রামের পর গ্রাম। দো-ফসলি জমি। সুদী কারবার আর জমিজিরেত।

লোকের বাড়ি ক্যাশ টাকা ভর্তি। একেক গাওনা আর বিয়েতে লাখ লাখ টাকা খরচ। কিন্তু মানুষগুলো ঘরমুখো, অলস। আমি সে সব গ্রামে ঢুকে যাই। পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দেখাই। টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে রসিদ দিই, গদীতে অর্ডার বুক করি। ব্যাস্। কাছাকাছি যেন রেল স্টেশনে মাল আসে। খালাস করি। আবার গ্রামে গ্রামে সাপ্লাই দিই। উঃ, গরম কালে বিহারের গ্রামে বিয়ের ধুম, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একেক গাঁওতে দশ-বিশটা বিয়ে। তো ধরুন হরগাঁওমে তো আট-দশ বাত্তি জরুর লাগতা হৈ না···

'বাপ রে' আমি বলি, 'আপনি যে দেহাতি ঠেট জবান্ পর্যন্ত রপ্ত করে ফেলেছেন।'

'সঙ্গদোষ।' শ্রীহর্ষ বলেন, 'ওদের নিয়েই তো সময় কাটে। তার পরে বর্ষার সিজনে এখানে আসি। ছুটি কাটাই। এবারে এখানে একটা মৃত্যু ঘটেছে পরিবারে। তাই কদিন আটকে গেছি। গাঁয়ের ছোঁড়ারা এসে ধরল রঙপাঁচালি লিখে দিতে হবে। ভেবেচিন্তে দিলাম যুক্তফ্রণ্টকে দু-খোঁচা। আমি মশাই কংগ্রেসী রাজনীতি করি।'

সেবার এভাবেই রংফনূট্ শব্দের খেই ধ'রে পেয়ে যাই শ্রীহর্ষ পালিতকে। তার কাছ থেকে পাই বিহারের গাঁয়ের খবর আর পেট্রোম্যাক্স বেসাতির বিচিত্র জীবিকা ও জীবনের হদিশ। পরে বিহারের গাঁয়ের এমন ব্যাপক বিয়ের খবর অন্য এক মাত্রায় আমার কাছে আসে। তখন আমি কাঁকিনাড়া স্টেশনে নেমে রিক্সা করে জগদ্দল ঘাটে এসে লঞ্চ পেরিয়ে চন্দননগর যেতাম জীবিকার টানে।

জগদ্দল জায়গাটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই। আধা বিহার ব'লে মনে হয়। চটকলের শ্রমিক কলোনি বলা চলে। যেমন নোংরা তেমনই অভাবী সব মানুষ; সেইসঙ্গে মারদাঙ্গা মার্ডার একেবারে জলভাত। খুনী, ওয়াগনব্রেকার, স্মাগলার, ফেরেব্বাজ, পতিতা, চোর, দালাল, জুয়াড়ি, রেস্থুরে, মাতাল আর গেঁজেল থিক থিক করছে জগদ্দলে। প্রথম যেদিন জগদ্দল দিয়ে যাচ্ছি সহযাত্রী ও গাইড ফটিকদা বলেছিলেন, 'খুব সাবধানে এখান দিয়ে যাবে আসবে। এ হলো জাত-ক্রিমিনালদের ডেন। আর মজা কি জানো? ইংলণ্ডের ডেভনসায়ারে যদি কোনো সাইকেল চুরি যায় তবে তার পার্টস্ এসে যাবে জগদ্দলে।'

কথাটা শুনে রগড় লেগেছিল খুব। কিন্তু কদিন পরেই একখানা ঘটনা শুনে বুঝতে পারি অ্যান্টিসোস্যালদের কাজকারবার কতদূর বিস্তৃত।

সেদিন কথা হচ্ছিল চন্দননগর লঞ্চ ঘাটের ঘাটবাবু ঘোষ মশায়ের সঙ্গে।

খোদ চন্দননগরের ফরাসী আমলের মানুষ। রসে বশে জমাটি। ঘাটোয়ালগিরি করছেন বহুদিন। কলেজে পড়াই জেনে খাতির ক'রে পাশে বসিয়ে নানা কথা বলেন বৃদ্ধ মানুষটি। এমনই বেশ চনমনে হাসিখুশি। বলেন, 'আমার জলপথেই জীবন কেটে গেল। সারাদিন লঞ্চঘাট আর সায়ংসন্ধ্যা বোতল, হা হা হা।'

সে-হেন মানুষকে একদিন গম্ভীর দেখে বললাম, 'ঘোষ মশাই, আজ যে বড় গম্ভীর?'

'শুধু গম্ভীর নয়, বলতে পারেন উদাস। খানিকটা বৈরেগীভাব', খুব নিস্পৃহ উচ্চারণ।

: কেন? কেন।

: আর কেন? এতকাল মশায় চন্নগরে ঘাট সামলাচ্ছি। সব শালাকে, সব দাগী আসামীকে চিনি। সবাই তোলা দেয় এই বেন্দাবন ঘোষকে। আর কাল রাতে মশাই আমাকেই চেম্বার দেখালো!

: সে কি? ব্যাপারটা খুলে বলুন।

: ব্যাপারখানা যাকে এখনকার ছেলেছোকরারা বলে 'কেস জণ্ডিস' তাই। হলো কি জানেন? কাল রাত তখন সাড়ে এগারোটা। ডাউনে আরেক খেপ মারলেই লঞ্চঘাট বন্ধ করবো, এমন সময় ভদ্দেশ্বর সাইড থেকে দুখানা মাল এলো।

: মাল বলতে?

: না না মশাই যা ভাবছেন ওসব নয়। মস্তান। তো ওপার থেকেও জগদ্দলের দরুন দুখানা মাল এলো। হিস্যা হচ্ছে টের পেলুম। গন্ধে গন্ধে গেলুম। তো আমাকে কি বললে জানেন? বললে, 'দাদু এখান থেকে ফোটো।' আরে আমি হলাম চন্নগরের বেন্দাবন ঘোষ, ফোটো বললেই কি ফুটবো? কেসটা কি জানেন?

: কি বলুন তো?

: স্টেন। মানে স্টেনগান। ভদ্দেশ্বর থেকে স্টেন এনে চন্নগরের ঘাটে বিক্রি হচ্চে! কিনচে কে? কিনচে জগদ্দলের পাটকলের দুখানা বেহারি দারোয়ান। আমি মশাই নাক গলাতে যেতেই ভদ্দেশ্বরের মস্তান আমার বুকে চেম্বার ঠেকিয়ে সরিয়ে দিলে। কিছু বুঝতে পারলেন? একেবারে কিচাইন হয়ে গেলুম। তবে খোচরদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে সব বুঝে গেছি। পার পাবে না ব্যাটারা। আমার তোলা চাই।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে না হয় হ'লো। কিন্তু চটকলের দারোয়ান অত টাকা পেলই বা কোথায় আর স্টেন দিয়ে করবেই বা কি?'

'ও, সেটা জানেন না বুঝি' বৃন্দাবন বললেন, 'এখানে তারা দারোয়ান আর দেশগাঁয়ে সব ডাকু। হাজার হাজার টাকা দিয়ে স্টেন কিনচে। তবে সে টাকা উসুল হয়ে উপরি রোজগার হয়ে যাবে।'

: কি ক'রে ?

: সামনে গরমকাল আসচে তো। বেহার মুলুকে সব গাঁয়ে গাঁয়ে হবে গাওনা আর সাদি। ব্যাস্। বিয়ের আসরে ডাকাত পড়বে স্টেন নিয়ে। 'ছাড়ো নিকালো রুপিয়া।' মশাই লাখ লাখ টাকার কারবার। বুঝলেন ? বুঝলাম শ্রীহর্ষ পালিত যে-বিয়ের সূচনাপর্বে বিহারের গ্রামে গ্রামে আলো জালার ব্যবস্থা করেন বিচিত্র জীবিকার টানে, সেখানেই সেই আলোকিত বিবাহমণ্ডপে হঠাৎ আঁধার ঘনিয়ে আসে স্টেনগানের ঘোড়া টিপে। জীবন আর জীবিকার কি অদ্ভুত হাত ধরাধরি। কত বড় রাস্তা পেরিয়ে জীবন-জীবিকার কারবার। ভদ্রেশ্বর থেকে স্টেনগান নিয়ে বিহারের গ্রামে ডাকাতি ? এসব অভিজ্ঞতার তাপ আর কারুকাজ আমার ভেতরে ভেতরে নতুন নতুন বোধে ভরিয়ে দেয়। তাই রাস্তা দিয়ে হেঁটে-চলা এত বিচিত্র মানুষ দেখলে আমি বেশ ভাবতে পারি জীবন বয়ে চলেছে জীবিকার নানা চোরাটানে। তার কতটুকুই বা আমাদের জানা থাকে ? তবু এখন আমি বেশ সতর্ক থাকতে পারি। কাউকেই উপেক্ষা করতে পারি না। আমার ছোট ভায়ের সহপাঠী শশিপদ তাই বরাবর আমার কৌতূহলকে টানে।

আমি খুব গোপনে একান্তে শশিপদর ওপরে নজরদারি রাখি। ভেতরে-ভেতরে তারও তো বয়স হ'লো অনেকটা। ভাবি, আমার জীবিকাও কি আমার স্বভাবে বা আচরণে কোনো গোপন ছাপ রেখে যাচ্ছে যা আমি নিজে হয়ত টের পাই না। কিন্তু অনেকদিন ধরে লক্ষ করে যাচ্ছি বলেই বোধ হয় শশিপদ-র অন্তত শারীরিক পালটে যাওয়াটুকু সনাক্ত করতে পারি। হিসেব করলে বুঝতে পারি, তা কিছু না-হোক অন্তত তিরিশ-চল্লিশ বছর সে ফুলের এই ভ্রাম্যমাণ বেসাতি করছে।

সেদিন অনেকক্ষণ নিরিখ করে দেখলাম শশিপদ-র চুল অনেকটাই উঠে গেছে। যে কটা আছে তারও ঝোঁক পাকবার দিকে। একটা সদাউৎকণ্ঠ দ্রুত ধাবনশীল জীবিকা তার কপাল ও মুখ বলিরেখা আর মেছেতায় ভরিয়ে দিয়েছে। আমি তার সঙ্গে বাজার থেকে একসঙ্গে হেঁটে ফিরছিলাম। আমার হাতে ছিল বাজারের ভরা ব্যাগ। শশিপদ-র হাত কিন্তু ছিল খালি, কেননা সে বাজারের ব্যাপারীদের কাছে দিস্তুরি আদায় করতে এসেছিল। দুজনে, যাকে বলে 'খেজুরে আলাপ'

করতে করতে হাঁটছিলাম। অপাঙ্গে আমি কিন্তু নজর রাখছিলাম তার চলার ছন্দে, হালচালে। চোখে পড়লো প্রথমেই যে শশিপদ জুতো পরে নি। তার মানে আঘাত লেগে কি কাঁটা ফুটে তার পায়ের নীচে কুলআঁটি গজিয়েছে, পায়ের চেটো অনবরত হেঁটে কিছুটা থ্যাবড়া হয়ে গেছে বোধ হয়, তাই জুতো পরতে পারে না। আরও দেখলাম তার বাঁ হাতে যখন একপুঁটুলি ফুলের মালা থাকে তখন সেই ভার ব্যালেন্স ক'রে জোরে হাঁটবার জন্যে ডান হাতটাও ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চলতে সে অভ্যস্থ। অনেকটা ওয়াকিং রেসের প্রতিযোগীদের মতো। এখন তার হাতে ভার নেই তবু দু হাত খানিকটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেই হাঁটছে। আশ্চর্য যে সে হাঁটছেও স্বাভাবিক হাঁটার বেগের চেয়ে অনেকটাই জোরে।

এসব দেখে আমি নিঃসন্দেহ হলাম যে জীবিকা জীবনকে অনেক সময় ফেলতে পারে কোনো অপূর্বকল্পিত ছাঁচে, অন্তত শারীরিকভাবে। এটা তো ঠিক যে শশিপদ আর কোনোদিন তার দৈহিক প্রবণতাগুলো পালটাতে পারবে না। হাত না-ঝাঁকিয়ে, ধীরে-সুস্থে হাঁটা ভব্যিযুক্ত হয়ে, জুতো প'রে, তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। অথচ আশ্চর্য যে, সে নিজেই তা জানে না, বোঝে না। জীবিকার একমুখিতা শশিপদর দেহকে অলক্ষে মুচড়ে দিয়েছে, সেইসঙ্গে জীবনকে ক'রে দিয়েছে আততিময়, নির্বিকার ও দৃশ্যত উদাসীন। জীবিকা কি মনকেও বা প্রবৃত্তি-প্রবণতাকেও পালটে দিতে পারে?

এমন কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় যে, কোনো বিশেষ জীবিকা জীবনের যাপনগত কিছু বিশেষত্ব আনে। অভিনেতারা নাকি মদ্যপান ক'রেই থাকেন, পুলিস নাকি ঘুষ খাবেই। 'রাজনীতি জীবিকা যাঁদের, জীবন তাঁদের হওয়া উচিত আড়ম্বরবর্জিত ও মাদকবিহীন। কবিজীবন হওয়া চাই ঔদাস্য ও ভ্রান্তিবহুল। তেমনই প্রশাসকের জীবন হবে শক্তপোক্ত, স্মার্ট ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। এসব ভাবনার টানে হঠাৎ মনে পড়লো, অনেকে বলেন সংস্কৃতের পণ্ডিতরা নাকি খুব বিষয়ী হন। আশ্চর্য যে দর্শনশাস্ত্র যাঁদের অধ্যাপনার বিষয় তাঁরা বহুলাংশেই হন খুব ক্যাল-কুলেটিভ। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন।

কিন্তু একটা উদাহরণ খুব ব্যাপক দেখা যায় যে বিচারকশ্রেণী অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষায় যাঁদের বলে ন্যায়াধীশ তাঁরা সাধারণত হন কৃপণ। এর কোনো সমাজ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমি নেবো না, তবে লক্ষ করতে বলবো জজ, সাবজজ, মুন্সেফ বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের। জীবিকার নির্দেশে আর ন্যায়বিচারের স্বার্থে এসব জীবিকার মানুষ খুব একটা জনসংযোগ রাখতে পারেন না। বিশেষত

জেলা বা মহকুমা শহরে বিচারকবর্গ বাস করেন অনেকটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন। নিজের নিজের কোয়ার্টারে থাকেন আইনপুস্তকের দ্বন্দ্বজটিল সান্নিধ্যে। সামাজিক মেলা-মেশা, ওঠা-বসা একেবারে বর্জিত এঁদের জীবন, বিশেষত চাকরির জায়গায়। এই যে কারুর বাড়ি যান না এঁরা এবং কেউ আসেন না এঁদের বাড়ি তার ফলে খরচ-খরচার স্বভাবটা কেমন কুঁকড়ে যায় হয়ত। হয়ে পড়েন মিতব্যয়ী এবং এজলাসের বাইরে যেহেতু তেমন কোনো প্রকাশ্য জীবন নেই তাই পোশাক-আশাকের বিলাসিতা এঁদের বড় একটা দেখা যায় না। কোনো ক্লাব বা বারোয়ারী জজ সায়েবের কাছে চাঁদা চাইতে পারে এটা ভাবনারও বাইরে। এসব ছাড়াও তাঁদের হোমফ্রণ্টের কোনো ভূমিকা থাকে কিনা তা-ও বিবেচ্য।

কিন্তু সে বিবেচনার গভীরে না গিয়ে আপতত আমরা ঢুকে পড়তে পারি জজ দাদার গল্পে। জজ দাদার নাম এখানে উহ্য থাক কেননা আমরা তাঁকে জজ দাদাই বলতাম। আমাদের জেলা শহরে তিনি অ্যাডিশনাল জজ হিসাবে ছিলেন বছর দুয়েকের মতো। আইনজ্ঞ, নিরপেক্ষ অথচ শক্ত ধাতের ন্যায়াধীশ ব'লে তাঁর নাম রটেছিল যদিও ব্যক্তিজীবনে ছিলেন কোমল প্রকৃতির সরল মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হবার কথা নয়। কিন্তু আমার স্ত্রীর বাল্যবন্ধু ছিলেন স্থানীয় একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারের স্ত্রী। জজ দাদা ছিলেন সেই মহিলার পিসতুতো দাদা। এই সুবাদেই আলাপ, তবে ঘনিষ্ঠতার কারণ জজ দাদার সহৃদয় আন্তরিক ব্যবহার। আমার গিন্নি তাঁকে জজ দাদা বলতেন, আমিও বলতাম। আমরা তাঁর কোয়ার্টারে যেতাম এবং কর্মিষ্ঠা বৌদির তৈরি নানারকম গৃহজাত ভোজ্যে আপ্যায়িত হতাম। তাঁদের ছেলেমেয়ে দুটি ছিল সুশ্রী ও সুন্দর স্বভাবের। কিন্তু মেয়েটির শৈশবে পোলিও হবার ফলে পা টেনে হাঁটতো। জজ দাদা বলতেন ওর গর্ভবাসকালে নাকি তিনি একটা বিচারের অন্যায় রায় দিয়েছিলেন ভুলবশত। তারই পরিণতি নাকি কন্যার প্রতিবন্ধিতা! এ-কথা শুনে বিচারকদের জীবিকা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা জাগে। বুঝতে পারি নীতিবোধ, আইন আর বিবেকের টানাপোড়েনে তাঁরা বাঁধা প'ড়ে যান বোধ হয়। পাপ-পুণ্যের একটা চেতনা, এ জীবনেই পাপের ফল হাতে নাতে পেতে হয় এমনতর বিশ্বাস তাঁদের চালায় নাকি?

লক্ষ করতাম জজ দাদা রোজ সকালে নিয়ম ক'রে গীতা পড়তেন। কর্মেই তাঁর অধিকার কেবল, ফলাফলে নয়—বিচারক হিসাবে এই প্রশ্রয়ের সান্ত্বনাবাণী কি পেতেন গীতায়? আমি অবিশ্বাসী নাস্তিক। আমার জীবন ও জীবিকার মুক্ত ধরন

এসব নীতির বন্ধনে বেঁধে আমাকে চালাতে পারে না। তাঁকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, 'রোজ গীতা পড়েন কেন ?'

জবাবে বলেছিলেন, 'আমাকে রোজই মানুষের বিচার করতে হয়। মানুষের বিচার করবার অধিকার তো ঈশ্বরের। কিন্তু সমাজ সংসার ন্যায়নীতি ধর্মবোধের ওপর জীবনকে সুষ্ঠুভাবে রাখতে গেলে আইন চাই, আদালত চাই, নিরপেক্ষ বিচার চাই।'

: মানুষ কি নিরপেক্ষ হ'তে পারে ?

: পুরোপুরি পারে না হয়ত। কেননা বংশধারা, সংস্কার, অভিজ্ঞতা এসব তাকে চালনা করে। তবু চেষ্টা করতে হয়।

: বিচারক হিসেবে আপনার কাজ কি ?

: সব কিছু খতিয়ে দেখে ন্যায়বিচার করা, তার পর আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগে দণ্ডবিধান।

: লক্ষ করেছেন কি কোনো কেসে অনেক সময় এমন হয় যে আপনি বুঝছেন আসামী অপরাধী কিন্তু কেস ঠিকভাবে সাজানোর অভাবে বা মিথ্যা সাক্ষীর ফলে সে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল ?

: এমন ঘটনা প্রায়ই হয়। তখন খানিকটা ছটফট করি কদিন। তবে বিশেষ-ভাবে লক্ষ রাখি যাতে নিরপরাধ ব্যক্তি শাস্তি না পায়।

জজ দাদার ছেলে ব'লে উঠলো, 'বুঝলেন কাকু, বাবা যখন কেবলই পায়চারি করে, কেবলই গীতা পড়ে, তখন বুঝতে হবে সামনে একটা ফাঁসির রায় আসন্ন।'

: সত্যি ?

: হ্যাঁ। তখন শরীরে মনে একটা দারুণ অস্থিরতা জাগে। ভালো ক'রে খেতে পারি না, অস্বস্তি হয়। ভাবি একজনের জীবন দিতে পারি না। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড আমার হাতে। আমি কি সে বিচারের উপযুক্ত ? ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে ন্যায় বিচার করবার ভার আমার ওপর : আমি তা ঠিকভাবে করছি তো ?

এসব শুনে আমার চমক লাগে। ভাবতেই হয় যে, জীবিকা মানুষকে কতটাই গুটিয়ে দিতে পারে। সহজ স্বতোশ্চল জীবনধারায় এমন যে নীতিবোধের রুদ্ধতা এ তো মারাত্মক। মানুষটার মধ্যে স্ববিরোধ নেই, যেমন আমার আছে।

মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর নীতি আদর্শের বেলুন ফুটো হয়ে যেতো। যেমন একদিন আমাদের বাড়ি চায়ের আসরে আমি বললাম, 'জজ দাদা কি এজলাসের বাইরে সর্বদা এমন গেরুয়া খদ্দর পরেন ?'

স্বভাবসিদ্ধ বিনম্রী অথচ গর্বিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে জজ দাদা বললেন, 'বেহারের পূর্ণিয়ার মানুষ আমরা। স্বাধীনতার আগে সেখানে ভাদুড়ীজির চেলা ছিলাম। জাতীয়তাবাদী। কত চরকা কেটেচি। তারই সুতোয় বোনা খদ্দর পরা ছোট থেকে অভ্যেস। এখন অবশ্য চরকা কাটি না, তবে খদ্দর পরলে শান্তি পাই, গৌরব বোধ করি।'

হঠাৎ জজ বৌদি বললেন, 'আপনার দাদার এই এক রোগ। সব তাতেই একটা মহত্ত্বের ব্যাপার এনে ছাড়বে। না ভাই, ওসব গর্ব গৌরবের ব্যাপার-স্যাপার নয়, খদ্দরের রেডিমেড হাফ ডজন পাঞ্জাবি তো আমিই কিনে দিই বছর বছর।'

: হাফ ডজন একসঙ্গে ?

: হ্যাঁ, হাফ ডজনে পাইকারি রেট পাওয়া যায়। পুজোর সময় খাদি ভাণ্ডার থেকে রিবেটে কিনি। খুব সস্তা।

আমি আমার ছোট্ট ঘরের ছোট্ট জানলা দিয়ে প্রাণপণে একটুকরো প্রকৃতি দেখতে চেষ্টা করি। বুঝি বিচারকেরও বিচার আছে।

সেই ভাবনার উলটো টানে আমার মনে হয় সমাজে ও জীবনে মানুষের অনেক অভ্যাস আর স্বভাবের গভীরে খানিকটা অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা বোধ হয় কাজ করে। এই ভাবনা থেকে আমার সুধন্যবাবুর কথা মনে পড়ে। অধ্যাপক সুধন্যকুমার দাস চন্দননগরের ফরাসী আমল থেকে কলেজে পড়াতেন। জাতে তাঁতি। বাড়িতে পৈতৃক ব্যবসায় ছিল। সুধন্যবাবু ছিলেন মেধাবী ব্যক্তি। এম. এ. পাশ ক'রে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন, আবার বাড়িতে জাত ব্যবসাও করতেন। পঞ্চাশ-ষাটখানা তাঁত ছিল বাড়িতে। সাতের দশকে সহকর্মিতার সুবাদে আমি তাঁর বাড়ি যেতাম ফরাসডাঙার ধুতি কিনতে। 'টাটকা সরেস মাল' সুধন্যবাবু বলতেন, 'হাত দিয়ে দেখুন এখনও গরম, এখুনি নামলো তাঁত থেকে।'

ধুতির অনেকরকম গুণাগুণ শুনেছি কিন্তু হাতে-গরম ধুতির গুণপনা সুধন্যবাবুর মুখেই প্রথম শুনি। সহকর্মী অধ্যাপক ব'লে পাইকারি রেট পেতাম আমি, তা ছাড়া জোড়াপিছু আট আনা রিবেট। মানুষটা হিসেবী তবে খরিদ্দারবৎসল। প্রথমদিন আপ্যায়ন করেছিলেন এই জিজ্ঞাসায় যে সন্দেশ খাবো না হুইস্কি।

এমন আশ্চর্য বিপ্রতীপ আপ্যায়ন শুনে আমার চক্ষু তো ছানাবড়া। উনি সপ্রতিভভাবে বললেন, 'এটা আমাদের ফরাসী আমলের খানদান। কোনো খদ্দের হুইস্কি খান, কেউ সন্দেশ। সবই রাখতে হয় তো'।

এহেন সুধন্যবাবুর গদীতে আমি দেখতে পাই সেদিনের অন্তত দশরকমের

দৈনিক কাগজ। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, যুগান্তর, বসুমতী, কালান্তর, গণশক্তি কি নয়। আশ্চর্য দৃশ্য সন্দেহ কি? 'আপনি সব রকমের কাগজ পড়েন? সময় পান কখন?'

সুধন্যবাবু তুড়ি মেরে বলেন, 'দূর মহায়, কাগজ কি পড়বার জিনিস? সব মিছে কথায় ভর্তি। শুধু বিজিনেস।'

: তা হলে একই দিনের অ্যাতো কাগজ?

: ওটাও বিজিনেস ট্যাকটিক্‌স্।

: কী রকম?

: আমার কারখানার ধুতি শাড়ি প্যাক ক'রে খদ্দেরকে দিতে অনেক কাগজ লাগে তো? হিসেব ক'রে দেখেছি সব রকম কাগজের চেয়ে খবরের কাগজ সস্তা, ওতেই প্যাক ক'রে দিই। তার ওপর মাঝে মাঝেই সাপ্লিমেণ্ট থাকে। ওটা বাড়তি লাভ। সারা মাস অনেক কাগজ কিনলে চন্‌নগরের খোদ এজেন্ট দশ পারসেণ্ট কমিশনও দেয়। এবারে হিসেব করুন।

সুধন্যবাবুর জীবিকাই তাঁকে এই সরল অর্থনীতিতে পৌঁছে দিয়েছে। তেমনই জজ বৌদির অতি সতর্ক সংসারীপনা জজদার খদ্দর ধারণের স্বভাবকে তৈরি করেছে। নীতিকামী সরল মানুষটি তার উপর এক জাতীয়তাবাদী মহত্ত্বের কোটিং লাগিয়েছেন। ব্যাপারটি মন্দ কি? দিকে দিকে এমন কামোফ্লাজ কতই আছে জীবন-জীবিকার ধরনে · দেখার চোখটারই যা অভাব।

যাই হোক, জজদার দারুণ দুর্বলতা ছিল মাছের উপর। টাটকা মাছ খাবার লোভ তাঁর অজিয়তি বৃত্তিকে বা তার নিয়মনির্দেশকেও টলিয়ে দিয়েছিল। কেননা প্রায়ই সকালে সাতটা নাগাদ তিনি প্রথা ভেঙে আমার কাছে আসতেন। ঐ সময় আমি বাড়ির খোলা বারান্দায় বসতাম এবং অবারিত নিসর্গসৌন্দর্য দেখতাম। পাশের ইজিচেয়ারে মাঝে মাঝে সহধর্মিণী এসে শোভাবর্ধন করতেন। জজ দাদা আসতেন অবশ্য বিশুদ্ধ মাছের টানে। অর্থাৎ ঐ সময়ে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে ভোলা নামে এক মালো বিল থেকে টাটকা মাছ নিয়ে বাজারে যেতো। তার কাছে টাটকা মাছ সস্তা দরে কেনা যেতো। জজ দাদা শুধু যে আসক্তির সঙ্গে মাছ কিনতেন তাই নয় অনেক সময় মাছের গায়ে হাত বুলোতেন। মুখে বলতেন, 'আমার ছেলেমেয়ে দুটো মাছ ছাড়া একদম ভাত খেতে পারে না'। আমরা স্বামীস্ত্রী চোখের ঠারেঠোরে বুঝে নিয়েছিলাম ছেলেমেয়ের নামে আসলে দাদারই অস্বাভাবিক মৎস্যপ্রীতি প্রকাশ পায় ওসব কথায়।

একদিন এক ঝকঝকে স্বর্ণবর্ণ মৃগেল দেখে লোভ সামলাতে পারলেন না। তার ওজন ছিল এক কিলোর কিছু বেশি। আমার গিন্নির কাছে ধার নিয়ে দাম দিলেন। বোঝা গেল মাছ কেনার নির্দিষ্ট টাকা বৌদি তাঁকে দিয়ে দেন। বাজেট ডিঙোলে খুব বিপদ হবারই কথা। আরেকদিন কথায় কথায় জজ দাদা ভোলার মাছের চেয়ে প্রশংসা করলেন তার সততার। বললেন, 'ভোলার ওজন চমৎকার। সাড়ে সাতশো মাছ দিলে বাড়ি নিয়ে গেলে দেখা যায় ঠিক ঠিক সাড়ে সাতশো।'

আমার গিন্নি কৌতূহলী প্রশ্ন করেন, 'কী ক'রে বোঝেন ?'

জজদাদা গর্বিতভাবে বলেন, 'তা জানো না বুঝি ? তোমাদের বৌদির তো একসেট দাঁড়ি-বাটখারা আছে।'

: সেকি ? কেন ?

: সব ওজন যাচিয়ে নেন আর কি।

জজ সাহেবের প্রতীক অবশ্য দাঁড়িপাল্লা, যেমন হিন্দি ফিল্মে দেখি। তাই ব'লে জজ দাদার বাড়িতে দাঁড়ি-বাটখারা ? সঙ্গে সঙ্গে সাফাই গেয়ে জজ দাদা বলেন, 'মানে ব্যাপার কি জানো ? বহরমপুরে যখন পোস্টেড ছিলাম তখন একটা পাজি আর্দালি ছিল, ব্যাটা রোজই বাজার থেকে যা আনতো তার ওজন কম হ'তো। প্রথমে, সন্দেহ হ'তো পরে গিন্নি আনালেন দাঁড়ি-বাটখারা। ব্যাস ব্যাটা ধরা পড়ে গেল। বুঝলে ?'

বুঝলাম জজ গিন্নি এক কঠিন ঠাঁই। জজ দাদাও পড়েছেন এক প্রচণ্ড খাঁচা কলে। এহেন জীবনযাপনের উৎকণ্ঠিত সদাসতর্ক সন্দিহান ধরনে এমন একটা দম আটকানো ভাব আছে যা আমাদের ভাবিয়ে তুলতো।

যা হোক, এক নববর্ষের ভোরে কী মনে হ'লো চলে গেলাম জজ দাদার বাড়ি। বৈশাখের চমৎকার বাতাস। মনটা ছিল ফুরফুরে। এক ডজন রজনীগন্ধা আর এক প্যাকেট সন্দেশ নিয়ে তাঁর সাজানো কোয়ার্টারের কড়া নাড়তেই সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন জজ দাদা, 'এসো এসো, ভায়া এসো। আজকের দিনটা চমৎকার। বোসো। বউমাকে আনলে না কেন ?'

আমি বললাম, 'বউমা জানেনই না যে আমি এখানে। বেড়াতে বেড়াতে এসে পড়েছি।'

বৌদিকে ফুল আর সন্দেশ দিয়ে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। বৌদির সুন্দর মুখ স্মিত হাসিতে ভরে ওঠে। তিনি অন্দরে গেলে দাদা বলেন, 'ছেলেমেয়েরা

গেছে স্কুলে। ওখানে প্যারেড হবে। তো আজকের দিনে তোমাকে খুব খাওয়াতে ইচ্ছে করছে। বলো ভায়া কি খাবে?'

আমার এই এক মস্ত দোষ। কেউ কিছু খেতে দিলে আনন্দ ক'রে খাই, কিন্তু যদি কেউ জিগ্যেস করেন 'কি খাবে' তা হলেই দুষ্টু বুদ্ধি চাগাড় দেয়। এখানেও ব'লে বসলাম, হুট করে, 'তরমুজের সরবৎ খাবো'।

: বাঃ চমৎকার বলেছ। আমিও বহুদিন ও-বস্তুটি খাই নি। লাল টকটকে সরবৎ সঙ্গে একটু বরফ। ফ্রিজেই বরফ আছে অসুবিধে নেই। ছোটবেলায়, বুঝলে



ভায়া, বিরাট কালো তরমুজ হ'তো পূর্ণিয়ার নদী-চরের বালিতে। মা সরবৎ করতেন। আমি কাঠের গুঁড়ো ঢাকা বরফ আনতাম কিনে। কি টেস্ট কি

ফ্লেভার। তুমি বোসো, কিনে আনি। ছেলেমেয়েকেও সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে। প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ।

গুটি গুটি বেরিয়ে বাজারে পেঁছোন। কেনেন এক ঢাউস তরমুজ। নেটের ব্যাগে ভ'রে বিজয়গর্বে ফেরেন। ততক্ষণে এসে গেছে জজ দাদার ছেলেমেয়ে। ব্যাপার শুনে আনন্দে তারাও দিশেহারা। বৌদি তাঁর পরিচারিকাকে নিয়ে তরমুজ-পর্ব সুষ্ঠুভাবে প্রণয়নে বসেন। আমরা বসবার ঘরে আলাপচারি শুরু করি। দাদা বুঝি কিছুটা প্রগল্‌ভই হয়ে পড়েন, 'বুঝলে ভায়া, তুমি তো আবার তিথিলগ্ন মানো না। কিন্তু এ সবের তাৎপর্য আছে বৈকি। আজ হ'লো নববর্ষ। দিনটা ভালো ভাবে শুরু হ'লো। এখন শেষ করতেও হবে ভালো ভাবে। কথায় বলে, মর্নিং শোজ দ্য ডে। কেমন সুন্দর ভাবে স্থচনা হ'লো বলো তো বছরটার। চমৎকার ফুল মিষ্টি তরমুজের সরবৎ। আহা।'

সকলে মিলে সরবৎপর্ব সমাধা করা গেল। সত্যিই চমৎকার স্বাদ। আমি এমনকি মনে মনে আমার দুষ্টু বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলাম। তার পরে যা হয়, অর্থাৎ সব ভালো জিনিসেরই তো একটা শেষ আছে, তাই তরমুজের সরবৎও শেষ হলো। এদিকে ঘড়িতে বাজলো সাড়ে আটটা। মনে পড়লো, নববর্ষের সকালটা গিন্নিকে একটু বেশি রকম বঞ্চনা করে ফেলেছি। ঠিক করলাম, তাকে একেবারে চমকে দেবো মাংস মিষ্টি কিনে তার সঙ্গে একখানা শাড়ি দিয়ে। তার পরে মধুর কণ্ঠে বলা যাবে, 'বুঝলে মশাই, এইজন্যই দেরি করলাম। কেমন সারপ্রাইজ?' নববর্ষের সকালে নতুন শাড়ি কোন্ বউ না তারিফ করে? সেইসঙ্গে যদি অধিকন্তু থাকে পত্নীপ্রেমের অব্যর্থ অভিজ্ঞান?

চঞ্চল মনে উঠে প'ড়ে বলি, 'দাদা এবারে যাই, বাজারে যেতে হবে তো।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো বটেই' জজ দাদা বললেন, 'বিশেষত তুমি বউমাকে কিছু বলে আসো নি। তিনি কত কি ভাবছেন। নববর্ষের এমন চমৎকার সকালে মেয়েটাও এখনও বাবাকে একটু দেখলো না। ঠিক ঠিক। তুমি ওঠো। না না, একটু বোসো। বাজারে তো আমিও যাবো। ভালো দেখে একটা মাছ কিনতে হবে, তাই না? মাছ হলো লক্ষণযুক্ত জিনিস। কই গো, টাকা আর ব্যাগ দাও।'

নেপথ্য থেকে শোনা গেল, 'আজ আর বাজার করতে হবে না। এই তো অনেক টাকা খরচ করে তরমুজ আনলে। আজকে কলাইয়ের ডাল, আলুপোস্ত দিয়ে চালিয়ে নেব অখন।'

মর্নিং শোজ দ্য ডে। অসহায় অপ্রতিভ জজদার মুখের মতো অবর্ণনীয় ব্যথাতুরতায় শুরু হ'লো এক নববর্ষ।

*　　*　　*　　*

প্রত্যেক মাস পয়লায় সকাল আটটা নাগাদ আমাদের বাড়ির সামনে একজন শীর্ণ রোগজীর্ণ মানুষ এসে রোয়াকে চুপ ক'রে ব'সে থাকে। হঠাৎ তাকে দেখলে মনে হবে শ্মশান থেকে উঠে-আসা কোনো মৃতদেহ। কান্তিহীন, বিবর্ণ, কোটরগত চোখ। সে এসে ব'সে থাকে, ব'সেই থাকে, আবেদনহীন। সাধারণত কাজে কর্মে ভেতর মহলে থাকলে হয়তো জানতেই পারলাম না। কেননা সে তো সোরগোল তোলবার মতো মানুষ নয়। রোগে ভুগে ভুগে গলাটাও বসে গেছে। তাই ব'সেই থাকে। বোঝা যায় জগৎ আর জীবনের ওপর চরম অভিমানেই সে যেন খুব নিষ্ক্রিয়, চুপচাপ হ'য়ে গেছে। হঠাৎ যদি আমার টরটরে স্বভাবের ছোটমেয়ে তাকে কোনো গতিকে দেখে ফেললো তো মুস্কিল আসান। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে বলবে, 'বাবা, সেই বাউল এসেছে।' তাকে দশটা টাকা দেবো। সে গিয়ে তাকে দেবে। দূর থেকে খানিক গল্প করবে। দূর থেকে কথা বলাটা তার মা-র নির্দেশে। কেননা তাঁর ধারণা মানুষটা ক্ষয়রোগী।

আসলে কিন্তু মানুষটা বাউল না সহজিয়া তার মীমাংসা করা মুস্কিল। থাকে আমাদের শহরের প্রান্তে কপালীপাড়ায়। সেখানে কোনই পাকা বাড়ি নেই, একঘর ভদ্রলোকও নেই। আছে শ্রমজীবী, ভিক্ষুক, বাস কর্মচারী, উট্‌কো মস্তান, সাইকেল চালক, ঝি, আয়া, ধাই, ছোটমাপের কারিগর, চোলাই বিক্রেতা এইসব। এদের কারুর জীবনই শুদ্ধসত্ত্ব নয়, নির্ভরযোগ্যও নয়। বেশির ভাগ দম্পতিই সেখানে একরকমের সাজানো সম্পর্ক নিয়ে বাস করে। সবাই যে সবাইয়ের বিয়ে করা বউ তাও না। হয়তো ফুসলে-আনা, কি অল্পদিনের হালকা আসনাই। রাতে একজনের বউকে আরেকজন পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে যাচ্ছে এমন দৃশ্য এখানে আকছার। কেউ প্রতিবাদও করে না। সবাই যে যার জীবিকায় ব্যস্ত। সকাল বেলাতেই পাড়া বেবাক ফাঁকা। নেহাৎ কেউ যদি কাজে না যায় তো রয়ে গেল, কি কারুর শরীর বেজুত তাই বিছানায় শুয়ে আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েগুলোর মধ্যে যারা শিশু শ্রমিকের পর্যায়ে পড়ে তারা কাজে যায়। তার চেয়ে ছোট যারা, বেওয়ারিশ কুকুরের মতো ঘোরে, খেলে, মারামারি করে। বিকালে বয়স্করা ফিরলে রান্না হয়। তখন খুব হৈ চৈ আনন্দ ক'রে খেয়ে ঘুমিয়ে কাদা হ'য়ে যায়। তার পরে কপালীপাড়ার রাতের নাট্য শুরু হয়। কুপি জেলে জুয়ো খেলা,

পরিণামে খিস্তি আর মারামারি। তাড়ি বা চুল্লু খেয়ে মাতলামি, ভাঙচুর। বউ পেটানি কিংবা বউয়ের হাতে চ্যালা কাঠের মার খাওয়া। চিৎকার, অশ্রাব্য গালাগাল, কান্না। এই সবের মধ্যে বাউল মানুষটা থাকে। যেন গরির ঘরের আঙিনায় সন্ধ্যামণি ফুল। শোভাময় কিন্তু বেমানান।

মানুষটার একটা নামও আছে বৈকি। কৈলাস। কৈলাসচন্দ্র কয়াল। শৈশবে



বাপ-মা মরা। নানা ঘাটের জল খাওয়া, তবে স্বভাবে খুব শান্ত, শান্তিপ্রিয় বছর চল্লিশ পর্যন্ত বিয়ে থা করে নি। একটু আধটু ধম্ম কম্মের নেশা ছিল

মেলা-মচ্ছবে যাবার টান ছিল। তেমন তেমন গুরু পেলে দীক্ষা-শিক্ষা নেবার লোভও পোষণ করতো গোপনে। মানুষটার জীবনে তেমন কোনো শ্রী বা ছন্দ ছিল না কিন্তু জীবিকায় ছিল পোক্ত। সোনারুপোর কাজে বেশ হাত ছিল তার। আয় মন্দ ছিল না। একবার বানপুর-মাটিয়ারির অম্বুবাচী মেলায় গিয়ে কোনো একটা সহজিয়া মতে দীক্ষা নিয়ে ফেলে কণ্ঠিধারণ ক'রে। কৈলাসের সোনারুপোর মালিকের যে-দোকান তার সামনে প্রত্যেক সোমবার একদল গেরুয়া পরা মেয়েছেলে 'জয় রাধে' বলে ভিক্ষে চাইতো। মালিক তাদের দু পয়সা দিতো। এই মেয়েছেলের দলে একজন ডাঁটো চেহারার বৈরেগিনীর চোখের ভাব কৈলাসের মন টানে।

বাজারে একবার সেই মানদা বোষ্টমীর সঙ্গে দেখা হ'তে কৈলাস আগ্রহ ভরে তার দিকে তাকায়। মানদা হাসিমুখে বলে, 'দীক্ষে তো হয়েচে দেখছি, শিক্ষে কি হয়েচে ?'

এক্ষেত্রে দীক্ষা বলতে মন্ত্রদীক্ষা, শিক্ষা বলতে দেহতত্ত্বের হঠযোগ। কৈলাসের তাতে খামতি ছিল। মানদা সেইখানটায় গেড়ে বসলো। কৈলাসকে নিয়ে গেল আকন্দবেড়ে গ্রামে নিজের বাউল গুরুর কাছে। এবার শিক্ষা হ'লো। কিন্তু বাউল মতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে সাধনসঙ্গিনী লাগে। মানদা সে কাজে অভিজ্ঞ, পোক্ত। গুরুর নির্দেশে বাউণ্ডুলে কৈলাস উঠে এলো কপালীপাড়ায় মানদার ঘরে। মানদার আগের সঙ্গীটা বছর খানেক আগে দেহ রেখেছে। তার গেহ আর দেহ ফাঁকা পড়ে ছিল। কৈলাস সেখানে অধিষ্ঠান করলো।

তবে মজা এই যে, কৈলাস মানুষটা মানদার মতো ক্যাজুয়াল ধরনের নয়, রীতিমতো সিরিয়াস প্রকৃতির। তার বাউল ধর্ম, বাউল তত্ত্ব এসব সে গভীরভাবে বুঝতে জানতে আচরণ করতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তবে সোনারুপোর কাজে গাফিলতি করে নি। বাউল ধর্মের শব্দ-যাদু তাকেও পেয়ে বসেছিল। মানদাকে বলতো, 'ছিলাম রুপাসোনায়, অ্যালাম এবার উপাসনায়, বুঝলে কিনা।'

এসব রসের কথাবার্তা আমাকে মানদা বলেছিল। রুখুসুকু চেহারার চিমড়ে মানুষটার ভেতরটা নাকি রসে টইটুম্বুর, মানদা আমাকে জানিয়েছিল। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হওয়াটা অবশ্য খুবই আশ্চর্যের। আমি বাউল-ফকির-সহজিয়াদের নিয়ে জানাচেনা লেখালেখি করতাম অবশ্য। তবে সে সব গ্রাম-গ্রামান্তে ঘুরে। শহরের লোক আমার সে-পরিচয় তেমন জানতো না। একবার ঘোষপাড়ার সতী মা-র মেলায় কৈলাস আর মানদা আমাকে দেখে ফেলে। 'বাবু

এখেনে যে ?' এ প্রশ্নের নেপথ্যে অনুক্ত জিজ্ঞাসা ছিল 'তবে কি আপনিও সহজের পথের পথিক নাকিন ?' এর কদিন পরে কৈলাস আমাদের বাড়ি এসে বলে, 'বাবু, আপনার কাছে কি নালনের গানের বই আছে ? দেবেন ? দুয়েকখানা গান টুকে নেবো'। নালন বলতে লালন শাহ্ ফকির। দিলাম তাকে এক কপি 'লালন গীতিকা'। নেমন্তন্ন করলো তাদের ডেরায়। অবশ্য কুণ্ঠিতভাবে বললো, 'সে খুব ঘিন্নার জায়গা বাবু, ছোটলোকদের আস্তানা। তবু দেবেন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো। গরিবের ভিটেয় মহতের পা পড়বে। দুটো দেহতত্ত্বের গানও শুনে আসবেন।'

বাউল বৈরেগীদের গভীর নির্জন পথে ততদিনে আমার বহু অভিজ্ঞতা ঘটে গেছে। কৈলাস-মানদা এমন কিছু সাধক নয় যে তাদের কাছে আমি তেমন কিছু পাবো। তবু যাই। আন্তরিক সেবাধর্মে আপ্যায়ন করে। ভক্তিবিশ্বাসে ফাঁকি নেই। তবে গান শোনানোর চেষ্টাটা একটা অত্যাচার। কারণ কস্মিনকালেও সে গান গায় নি, গলাটাও ফাটা বাঁশের মতো। একটা আযুল স্প্রে-র টিনে বাখারি বেঁধে সে একতারা বানিয়েছে। তার বেসুরো পিড়িং পিড়িং আর কর্কশ কণ্ঠের গান কপালীপাড়ার পরিবেশে ছিল অদ্ভুত। তবে কথাবার্তায় কৈলাস বেশ ওস্তাদ ছিল। প্রায়ই বলত, 'বাবু রুপাসোনা আমার জীবিকা কিন্তু উপাসনা হলো জীবন। সে জীবনের মর্ম জানা কঠিন। মানদা সে পথে অনেকটা এগিয়েছে। আমাকেও এগিয়ে নিয়ে চলেচে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার পতন হয়। তা বাবু নতুন পথে চলতে গেলে পতন তো হবেই বারে বারে। তবে কথা হচ্ছে—

বাউল-জীবন জানতে হয়।
তার কোথায় উৎস কোথায় লয়॥'

কৈলাসের কাছেই আমি বাউল জীবনের লক্ষণ জানতে পারি। বাউলকে নাকি সর্বকেশ রক্ষা করতে হয়। পরতে হয় ডোর কৌপীন। হাতে তামার বালা। গলায় পরতে হয় তসবি মালা। পরনে গেরুয়া বস্ত্র থাকে কাছা না দিয়ে। মাথার চুল চুড়ো ক'রে বাঁধা।

কৈলাস নিচুস্বরে বলে, 'বাবু, বাউল-জীবন রক্ষা করা কঠিন। যেমন নারীর সতীত্ব।' আমি বলি, 'কঠিন কেন ? আর স্ত্রীলোকের সঙ্গেই বা তুলনা করছো কেন ?'

: বাবু, বাউলরা তো স্ত্রীলোক। দেখছেন না সর্বকেশ রক্ষা, এ তো নারীর লক্ষণ। তার পরে ধরুন মাথার চুড়ো, গলার মালা, হাতের বালা, কাছা না-দিয়ে

বস্ত্র, এসব কি নারীর ধরন নয়? সব চেয়ে বড় লক্ষণ তো ডোর কৌপীন, বুঝেছেন?

: না তো। ডোর কৌপীনের বিশেষত্ব কি?

: মেয়েরা যখন ঋতুমতী হয় তখন তো ডোর কৌপীনের মতো বস্ত্রধারণ করে তাই না?

একেবারে চমকে যাই। এদিকটা তো কখনও ভাবি নি। কৈলাস বলে, 'বাউল স্বভাব হলো শান্ত, মধুর। জোরে কথা বলা চলে না। আপন বেদনা মেয়েদের মতোই গোপন রাখতে হয়। সেইজন্যই বাউল জীবন কঠিন। গানে বলছে, 'আগে স্বভাবকে করো প্রকৃতি' বুঝলেন? কাজটা কঠিন। উল্টো সাধন। বাবু, আমার বাউল জীবন কায়েম হবে তো?'

কি জবাব দেবো তাকে? আমার পক্ষে নিতান্ত রহস্যময় অন্তর্গূঢ় জটিল এই জীবন, মানে বাউল জীবন, যার পনেরো আনাই আচরণঘটিত ও গুহ্য। আমি তাকে কী ভাবে সান্ত্বনা বা পথনির্দেশ দিতে পারি? কেবল তার আর্তি আমাকে ছুঁয়ে যায়, আকুলতা মর্মকে কাঁপায়। একটা কেবল ভরসা পাই যে, কৈলাসের জীবন আর জীবিকায় কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তার বাউল জীবন-যাপনে সোনা-রুপোর দোকান কোনো বাধা আনে না। সে ঐ পোশাক প'রেই দোকানে কাজ করে, আবার গুন গুন করে গানও গায়। তাকে আমি সঙ্গ দিই, উদ্‌বুদ্ধ করি, চাঙ্গা রাখি।

কিন্তু বাউল জীবনে আঘাত আসে অতর্কিতে। অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়ে গঙ্গায় স্নানের ঘাটে পা পিছলে কৈলাস পড়ে যায় একটা পাথুরে বোল্ডারে। কঠিন আঘাত লাগে কোমরে। প্রচণ্ড ব্যথাকাতর মানুষ, তবু প্রথম সাত দিন তেমন কিছু বলে নি। বাউল জীবনের ধর্ম রক্ষা করে নাকি নারীর মতো গোপনে নীরবে সয়ে গেছে যন্ত্রণা। তার পরে একদিন অজ্ঞান হ'য়ে যেতে মানদা আমাকে ডাকে। বড় ডাক্তার আমাকে জানান কিডনিতে প্রচণ্ড চোট। রোগ-ভোগ ঝঞ্ঝাটে দেখতে দেখতে এক বছরের মধ্যে কৈলাস যেন উল্টুদের দলে চলে গেল। ভালো ক'রে হাঁটতে পারে না, বসতে পারে না। তার একটা কিডনি একেবারে শেষ।

দেখতে দেখতে, অতি দ্রুত, জীবন-জীবিকার সর্বত্র কৈলাস অপাংক্তেয় হয়ে গেল। সোনা-রুপোর দোকানে কাজ করতে হয় সারাদিন ঠায় ব'সে একটানা। সে কাজে তাই সে অচল বলে ঘোষিত হ'লো। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা, হাঁটতে কষ্ট,

প্রস্রাবে তীব্র জ্বলুনি। তবু সে বাউল জীবন ধ'রে রাখতে চায়। শরীরের বেদনা নারীর মতো সহ্য করে। সস্তা মার্কিনে গেরুয়া রঙ লাগিয়ে আবরণ নেয়। তার জমানো টাকা ক্রমে শেষ হয়ে যায়। তার পরে যন্ত্রণাকাতর মানুষটা ফের একদিন অজ্ঞান হ'তে মানদা তাকে হাসপাতালে দেয় আর নিজে আবার ভিক্ষাবৃত্তি নেয়। জেলা হাসপাতাল কৈলাসকে পাঠায় কলকাতায়।

এ ভাবেই কৈলাস-মানদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। আগ্রহী বাউল জীবনের করুণ মর্মান্তিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা ভেবে আমার জীবন-জীবিকার রথচক্র তো থেমে থাকতে পারে না। আমি এগিয়ে চলি।

কিন্তু কৈলাস একদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসে। এখন আর সে বাউল নয়। বাউল জীবন তার ধ্বংস হয়ে গেছে। লাঠি ধ'রে কোনমতে হাঁটে। কোটরগত চোখ। যেন কান্তিহীন শীর্ণ এক প্রেতাত্মা। যে-জীবিকায় সে দক্ষ তাতে শারীরিকভাবে সে অপারগ। যে-জীবন তার আকাঙ্ক্ষিত তার থেকে সে ভ্রষ্ট। কপালীপাড়ায় ফিরে এসে কৈলাস দেখে ততদিনে মানদা নতুন পুরুষ বরণ করেছে। জীবন তো দাঁড়িয়ে থাকে না। তবে তার জীবিকার মতো কপালীপাড়া থেকে সে একেবারে উৎখাত হয় নি। দয়াময়ী মানদা তাকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দেয়। সে পড়ে থাকে এক বেওয়ারিশ মেটে ঘরের দাওয়ায়।

লাঠিতে ভর ক'রে কোনমতে কৈলাস এখন শম্বুক গতিতে হাঁটে। মাস-পয়লায় হাজিরা দেয় আমার বাড়ির রোয়াকে। তেমনই আরো কটা নিশ্চিত ভিক্ষাসত্র আছে তার। আমার সঙ্গে তার প্রায় দেখাই হয় না বলা চলে। তাকে দেখলে খানিকটা সংকোচও হয়। একটাই তো মোটে মানুষ, হ'তে চেয়েছিল খাঁটি বাউল। গ্লানিময় নিঃসঙ্গ জীবন পেরিয়ে মানদার হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছিল নতুন এক আচরণ আর বোধের জগতে। ফাটা বাঁশের মতো গলা নিয়েও অকুণ্ঠে গাইতো :

ঘুচিয়ে ময়লামাটি হয়েছি পরিপাটি
করিনে নটিখটি ;
এবার খাঁটি পথে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে পারলো কই ? আমি তাকে মাস-পয়লায় এড়িয়েই চলি সাধ্যমত। তবু সেদিন হঠাৎই কৈলাসের মুখোমুখি হয়ে গেলাম বাজার ফেরৎ। মানুষটা যে কৈলাস তা সনাক্ত করতেই খানিক থমকে দাঁড়ালাম রোয়াকের

সামনে। কার-না-কার কাছ থেকে পাওয়া একটা নীল বুশসার্ট তার পরনে আর একটা ময়লা পায়জামা। রোগপাণ্ডুর দেহত্বক। শূন্য দৃষ্টি। মাথার চুল ছোট ক'রে ছাঁটা। লাঠি হাতে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে দণ্ডবৎ ক'রে কান্নাভাঙা কণ্ঠে বললে, 'বাবু, আমি সেই কৈলেস। আমার বাউল জীবন হলুনি বাবু। এই দেখুন।'

যার সর্বকেশ রক্ষা করার কথা সে প্রায় নেড়া। ডোর-কৌপিনের বদলে অন্যের দেওয়া পায়জামা। গেরুয়া অঙ্গবস্ত্রের স্থান নিয়েছে নীল বুশশার্ট। লোকের দয়ার দান। বাউল জীবন কঠিন ঠিকই, তাই বলে পৃথিবী এতটাই নির্মম ?

কৈলাস বললো, 'বাবু, মনেও আর আমি বাউল নেই। নারীর মতো ব্যথা বেদনা এখন আর গোপন করতে পারি নে, রোগযন্ত্রণায় ফুকরে কাঁদি। স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে, মানদাকেও গালমন্দ করি চেঁচিয়ে।'

আমি সেই অদ্ভুত পোশাক-পরা, আত্মধিক্কারী মানুষটার দিকে চেয়ে চোখের জল ধ'রে রাখতে পারি না। তার হাত দুটো কেবল চেপে ধরি। কেবলই মনে হয়, একটা সহজ সরল লোক একটা প্রার্থিত জীবন পেয়েও পায় নি। চেয়েছিল উপাসনা, পেয়েছে ভিক্ষা।



শিক্ষা-অশিক্ষা

'শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে আগেকার সম্পর্কটা ছিল গুরু আর শিষ্যের। আর এখন দাঁড়িয়েছে গরু আর শস্য। সব দেখবেন মুড়িয়ে খাবে।'

হরিদাসপুরের একজন অশিক্ষিত চাষীর মুখে এমন চমকে দেওয়া কথাটা শুনে মনে হয়েছিল যেন সপাং ক'রে মুখে চাবুক পড়লো, কেননা আমিও তো একজন শিক্ষাজীবী। কথাটা উঠেছিল হেডমাস্টার সহদেব পালের মৃতদেহের সামনে। সৎ আদর্শবান সহদেবের চারপাশে তখন শোকাহত গ্রামবাসী। আকাশে জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্র। বৃদ্ধ চাষীটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ঐ কথা কত অনায়াসে বলেছিলেন আমাকে। এ-কথার পৃষ্ঠে আরও বলেছিলেন, 'কি জানেন বাবু, বহুদিন এইসব জমিজিরেৎ চাষবাস নিয়ে কাটলো। এখন সব দিকের হালচাল দেখে, বিশেষ ক'রে শিক্ষে-দিক্ষের ব্যাপারে, এই গরু-শস্য ছাড়া আর কি বলি বলুন তো?'

জবাব দিতে পারিনি কিন্তু মনে পড়ে গিয়েছিল হরিদাসপুরে প্রথম যেদিন সহদেব পালের নিমন্ত্রণে তাঁর শিক্ষাসত্র দেখতে আসি সেদিনকার স্মৃতি।

বাস রাস্তার কিনারেই হরিদাসপুর। সমস্ত গ্রামের স্বভাব শান্ততা ভেঙ্গে ভট ভট ভট ভট ক'রে ডিপ টিউবওয়েলের মেশিন চলছিল সেদিন। মাটির

বুকের ভেতর বন্দী জল যন্ত্রের টানে বার হয়ে ঝ'রে পড়ছিল ভূমিত্রীরই বুকে। গ্রামে ঢোকার রাস্তার দুধারে অবারিত ধানক্ষেত আর পাটক্ষেত। লক লক করছিল প্রবর্ধমান চারা। মন ভরে গিয়েছিল।

তখনও জানিনা এই শ্যামশ্রী ছাড়ালেই চোখে পড়বে কতখানি শ্রীহীন অনুজ্জ্বলতা। দশপঁচিশ বিঘের কয়েক লপ্ত জমি পেরিয়ে তবে সর্বপ্রথম গ্রামের জনমনিষ্যির মুখ দেখা গেল। আর একটু দক্ষিণে হেঁটে তবে গ্রামের এ-দিগরের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় চোখে পড়লো। মনটা দমে গেল। কত যে বয়স হয়েছে, কী যে হতশ্রী, কেমন যে জীর্ণ! ঘরের জানলা নেই। ফ্রেমসমেত উধাও। ফোকরটা চাপা হয়েছে ভেতর থেকে টেবিল দিয়ে। স্কুলবাড়ির প্লাস্টার খ'সে প'ড়ে ইট দাঁত খিঁচোচ্ছে, ছাদ পড়ো-পড়ো।

সেই ম্লানিমাভরা পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আন্তরিক হাসির অভ্যর্থনা করলেন প্রধান শিক্ষক সহদেব পাল। আমি বললাম, 'এই আপনার সাধের ইস্কুল?' সহদেব আওড়ালেন,

'বিদ্যালোভীর নাহি হ'লো ভীড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
দীর্ণ হে তুমি জীর্ণ বিদ্যালয়'

আমি লজ্জায় মাথা নিচু ক'রে ছিলাম।

সহদেববাবু বললেন, 'বিদ্যামন্দির তো দেখলেন, এবারে গ্রামের মন্দিরটা চলুন দেখে আসি।' দাঁড়ালাম দুজনে শতাব্দী উত্তীর্ণ এক শ্যাওলা ধরা মন্দিরের সামনে। মনে হ'লো গ্রামের এক মাত্র মন্দিরটার দশাও একমাত্র বিদ্যালয়টির মত সকরুণ, জীর্ণ। বেশ কল্পনা করতে পারলাম, হাঁসকল লাগানো মন্দিরের প্রাচীন দরজা খুলতে গেলে ক্যাচর্ক্যাচব শব্দে সবাই সচকিত হয়ে ওঠে। সারা মন্দিরের গায়ে কত বর্ষযাপনের ম্লানিমা। মন্দিরের মাথায় অশথের চারা বংশ বিস্তার করে চলেছে। মন্দিরের মধ্যে চামচিকে আর ছুঁচোর সঙ্গে শ্রীমদনগোপাল জিউ বসবাস করেন। অসহায় টানা টানা তাঁর দুটি চোখ আততিহীন। চলমান জীবনপ্রবাহের মাঝখানে দারুভূত দেবতা। এমন করুণ দেব মূর্তিরও নিত্যপূজা হয়। হতদরিদ্র এক পুরোহিতের সেটি রোজকার কাজ।

গ্রামের সবেধন বিদ্যামন্দিরের মূল পুরোহিত আমাদের এই সহদেব পাল। তাঁর অবশ্য সহকারী সহকারিণী আছেন। গ্রামের লোকের উচ্চারণে হেড মাস্টের আর মাস্টের। মহিলা হলেন দিদ্‌মনি।

শূন্য বিদ্যাভবনের কাছে আবার দুজনে ফিরে আসি। বসি দু'দণ্ড বকুল গাছের চত্বরে। সহদেববাবু ঘাটের মুখে, মানে অবসরের মুখে। ভয় হয় তাঁর অবসর নেবার আগেই বুঝিবা স্কুল বাড়ি ধ্ব'সে পড়ে। বললেন, 'জানেন, আমার বিশ বছরের হেডমাস্টারি জীবনে এই স্কুলের সংস্কার করাতে পারি নি। গ্রামবাসীরা উদাসীন। স্কুল বোর্ডের নেকনজর কিংবা বদান্যতা কি এমন গহীন গাঁয়ে পৌছাতে পারে?'

জিগ্যেস করলাম, 'স্কুলে ঘর কটা?'

: গণনায় তিনটে, আসলে দুটো।

: কেন?

: কারণ একটা ঘরে গাঁয়ের লোক মস্ত এক উনুন গ'ড়ে রেখেছে। বছরে তিনবার এখানে অষ্টমপ্রহর মচ্ছব হয়, তারই খিচুড়ি রান্না করে ওরা ঐ ঘরটাতে। তালাচাবি ওদেরই হাতে।

: কমপ্লেন করেন না?

: তাহ'লে এখানে আর চাকরি করতে আসতে হবে না।

: আপনিও তাহ'লে শ্রীশ্রী৺ মদনগোপাল জিউ?

: হ্যাঁ দারুভূত মুরারি।

এ পর্যন্ত যা লিখলাম তার সবটাই ষোলো আনা সত্যি। কেবল হরিদাসপুর আর সহদেব পালের নামদুটিই যা সাজানো। এইখানে আমার ভূমিকা কমিয়ে এনে বরং সহদেব পালের জবানীতে ব্যাপারটা ভাবা যাক।

ভাবছিলেন সেদিন সহদেব পাল অন্যদিনের মতই বকুলগাছ তলায় ব'সে আর চোখ মেলে রাখছিলেন বটগাছের আড়ে। কান পাতা ছিল বাসরাস্তায় কোনো বাস থামে কিনা তার আওয়াজ শোনার জন্যে। কেননা বাসে ক'রে আসবেন তাঁর দুই সহকারী শিক্ষক আর এক দিদিমনি। সহদেব একটু পুরোনো কালের মানুষ তো তাই সব তাতেই তড়িঘড়ি। এখন তো মোটে দশটা। ইস্কুল বসবে এগারোটায়। ছেলেপিলে আসতে আসতে প্রায় এগারোটাই বাজে। মাস্টারমশাইদের পৌঁছোতে সওয়া এগারোটা। কোনোদিন বাস ফেল করেন তাঁরা, কোনোদিন নাকি রাস্তায় বাস খারাপ হয়। শেষপর্যন্ত এলেন তো সহদেব বাবুর বাপের ভাগ্যি। আর কি মেজাজ সব! দিদিমনি নাকি তলে তলে কোন্ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। দুই সহকারীর একজন সকালে জনা পঞ্চাশেক ছাত্র দুই শিফ্‌টে পড়িয়ে তবে আসেন। আর একজন অঞ্চলপ্রধান। তিনি এলে কৃতার্থ হয়ে যেতে হয়। সহকারীরা আড়ালে সহদেববাবুর কর্মপ্রীতি আর কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে হাসাহাসি করেন। তাঁরা

তাঁকে এইচ. এম ব'লে উল্লেখ করেন। এইচ. এম মানে হেডমাস্টার। তাঁদের মতে এইচ. এম একটা হাব্‌লা। আদর্শবাদী আর নিরেট। আরে সাতসকালে এলে কি গরমেণ্ট বেশি মাইনে দেবে?

সহদেব আদর্শবাদী, তবে নিরেট নন। সেইজন্যই সহকারীদের সঙ্গে কোনো বিরোধ-বিতণ্ডায় যান না। ইস্কুলটা চালানোই তাঁর লক্ষ্য। সেটা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকার ঠিক সময়মত বেতন দেন। বেতনও আগের চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু পড়াশুনোর আবহাওয়াটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ



স্বাধীনতার পরে পরেই সহদেব শুনতে পেতেন স্বাধীনদেশে শিক্ষাব্যবস্থা আমূল পাল্‌টে যাবে। অবসরগ্রহণের মুখে এসেও অবশ্য সেই পাল্টানোর কোনো স্পষ্ট দিশে তিনি দেখছেন না। তাঁরা নিজেরা প্রথম প্রথম প্রাইমারি শিক্ষাকে ঠাট্টা ক'রে বলতেন 'পায়ে মারি' শিক্ষা। অর্থাৎ প্রথমেই পায়ে এমনভাবে গুঁতো মারা হচ্ছে যাতে সে দাঁড়াতে না পারে।

রাস্তা দিয়ে একজন সচ্ছল চাষী, চারুপদ হালসানা, যাচ্ছিল। এসে বসলো দুদণ্ড। সহদেবকে মান্য করে। কিন্তু সহদেব লক্ষ করেছেন তাঁর সহকারী বিজন কিংবা সোমনাথকে এই চারুপদ কেমন অনায়াসে বলে, 'কি মাস্টের, একটা বিড়ি খাবে নাকি?' তারাও খায়। আশ্চর্য এ ব্যাপারটা আগে ছিল না। আগে গ্রামের সবাই তাঁদের বলতো মাস্টারমশাই। কবে থেকে যে মশাই কথাটা টিক-টিকির লেজের মত খ'সে গেল কে জানে! এই চারুপদই সেবারে, যখন প্রাইমারিতে পাশফেল ছিল, তখন ইস্কুলে এসে বিজনকে বলেছিল, 'বুঝলে মাস্টের আমার খোঁকা, আরে তোমাদের ঐ থিরি কেলাসের ছিরিপদ হালসানা, ছোঁড়া এবারেও তো ফেল দিয়েচে'।

'হ্যাঁ। খুবই খারাপ করেচে।' সহদেব বলেছিল।

: সেতো করবেই। আরে সে স্নুমুন্দি পড়েটা কখন? কেবল তো মাঠে ঘাটে ঘোরে আর বিড়ি টানে। তো তাতেই ফেল দিয়েচে। তা মাস্টের এখন কি হবে?

: কি আর হবে? আরেক বছর পড়বে।

: কেন? একটা ব্যবস্থা কিছু হয় না?

. কি ব্যবস্থা?

: এই ধরো মাস্টের, একটা মোটা টাকা লাও। টাকা লিয়ে ছোঁড়াটাকে ফোর কেলাসে তুলে দাও না কেনে। ধরো কেনে, ও থিরি কেলাসও যা ফোরও তাই। চাষার পোর আবার ল্যাকাপড়া।

তা অবশ্য হয়নি। তবে সহদেব তখন থেকেই বুঝে গেছেন যে গ্রামীণ শিক্ষায় অশিক্ষিতদের দাপট ক্রমেই বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যে আগে এ অবস্থাটা কিন্তু ছিল না। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, চারুপদরা এখন স্কুলের চত্বরে এসে বসে। সহদেবকে বলে, 'আপনার সেইসব স্নুয়ো ছেলেমেয়ে কই? বিজন মাস্টের, সোমনাথ আর লক্ষ্মী দিদিমনি? ইস্কুলে দেরি ক'রে এলে পরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো বুঝলেন?'

সহদেব পালের মন বকুলবিছানো শিক্ষা প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে একটু স্মৃতিচারী হ'লো। মনে পড়লো এ গ্রামে প্রথম আসার ঘটনা। এতো তাঁর বাস্তুগ্রাম নয়। স্বাধীনতার আগে পরে তাঁদের ডেরা ছিলো ইব্রাহিমপুর। বাবা জাতব্যবসা অর্থাৎ কিনা হাঁড়িপাতিল গড়তেন। অবরে অবরে একটা শীতলা বা রক্ষেকালীর মূর্তি। হঠাৎই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মা তো কোন্ কালে গিয়েছিলেন। মাত্র

ষোলোবছরেই সহদেব একেবারে যাকে বলে সহায়সম্বলহীন অনাথ। সবে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ভাবছেন কি ক'রে দূর শহরে গিয়ে কলেজে পড়বেন।

এ সময়ে তাঁর একটা বড় নেশা ছিল। যাত্রা করবার নেশা। গ্রামের যাত্রাদলে ফিমেল পার্টে তিনি ছিলেন খুব জনপ্রিয়। ছোটখাট পুতুল পুতুল চেহারা ছিল। গলার স্বর চিরকালই চিকন। সেবারে 'চন্দ্রহাস' পালার বিষয়ার রোলে তাঁর খুব নাম হয়। কয়েকটা গ্রামে বায়না হয়েছিল যাত্রাগানের। তেমনই এক গ্রামের মোড়ল মুরুব্বি ছিলেন সরফান আলি খাঁ। যাত্রাপাগল মানুষ। স্বাধীনতার পরে পরে তখন কংগ্রেসের খুব রবরবা। সরফান খাঁ বরাবরই উদারপন্থী মুসলমান। তাই মুসলীম লীগ করেননি কোনদিন। দেশ স্বাধীন হ'তে ক্ষমতা আর নেতৃত্ব তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেল। সরফানের গ্রামের নাম ছিল মুকুন্দপুর। সেখানে 'চন্দ্রহাস' যাত্রা হ'লো একরাত। যাত্রার শেষে সরফানের বাড়ি ভোজ। ভোজের পর সহদেবকে ঘরে ডেকে সরফান সব খোঁজ-খবর নিয়ে বলেন, 'মাস্টারি করবা এ গাঁয়ে? তুমি তো মাট্রিক পাশ'।

: ইস্কুল আছে গাঁয়ে?

: এখন নেই। তবে হবে। আমিই করবো। আমার ভিটের পাশেই জমি দেবো। সরকারী টাকা আনবো।

সরফান আলি খাঁ এবারে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'ইস্কুল করাটা বাহ্য। আসলে তোমাকে আমি এ গাঁয়ে বেঁধে ফেলতে চাই। কেন জানতে চাইছো? আসলে আমি যাত্রাগানে পাগল। আমার গ্রামের যাত্রাদলে সবই আছে, কেবল ফিমেল পাট করার মত লোক নেই। তোমার এলেম আছে, বিদ্যেও আছে। ব্যাস। মাস্টারি করো আর যাত্রাদলটাকে চাঙ্গা করো। রাজি?'

রাজি হয়েছিলেন। তার ফলেই ইব্রাহিমপুরের বাস্তুত্যাগ আর মুকুন্দপুরে বসত। জোতজমি আর ভিটে সেও তো সরফান আলির দান। মানুষটা তাঁকে চিরকালের বন্ধনে বেঁধে শুধু মোহব্বতের স্মৃতি রেখে কোথায় মাটির তলায় লুকিয়েছেন।

কে বলবে সহদেব পালের বাড়ি মুকুন্দপুরে নয়। এখানেই তাঁর বাস্তু, এখানেই বিয়ে, সন্তানজন্ম, জীবিকা। কেবল বছর কুড়ি আগে পাশের গ্রাম হরিদাসপুরে হেডমাস্টারি পেয়ে রোজ পড়াতে যাওয়া। মুকুন্দপুরেই তাঁর হেড-মাস্টারি হবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য ক্যাঁচালে সে আর হলো কই? তাই বলে এই হরিদাসপুরের জীর্ণ দীর্ণ বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনটি কেটে যাবে? এটা কি একটা ইস্কুল না খোঁয়াড়?

শিক্ষকজীবনে দারুণ অতৃপ্ত সহদেব পালকে আমার চেনার কথা নয়। কেননা আমি থাকি শহরে। কিন্তু আমাদের কলেজে আই. এ পড়তে এসেছিল সহদেববাবুর ছেলে নিমাই। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। গভীর উৎসুক দুটি চোখ নিমাইয়ের। আমি তখন গ্রামে গ্রামে বাউল ফকিরদের হদিশ ক'রে বেড়াচ্ছি। কথায় কথায় নিমাই একদিন ব'লে বসলো, 'স্যার, একদিন আমাদের গাঁয়ে যাবেন ? মুকুন্দপুরে ? আমার বাবা অনেক ফকিরদের খবর রাখেন। শব্দ গানের সংগ্রহ আছে তাঁর।'

আমাকে আর কে ধ'রে রাখে ? অচিরে নিমাইয়ের সঙ্গে মুকুন্দপুরে পৌঁচেছি। তখন সাতের দশক। সহদেব বাবু মানুষটা বেঁটেখাটো, আত্মমগ্ন। কি একটা বই পড়ছিলেন মন দিয়ে। লুঙ্গি গেঞ্জি পরনে। সস্মিত লাজুক হাসিতে অভ্যর্থনা করলেন। 'কি বই পড়ছিলেন ?' আমার এই প্রশ্নে কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'এই ছেলের একখানা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই'।

: রাষ্ট্রবিজ্ঞানে খুব উৎসাহ বুঝি ?

: না না। এমনই দেখছিলাম। সময় কাটানো আর কি !

নিমাই গর্বিতভাবে বলে, 'বাবা সঙ্কল্প করেছেন আমার সঙ্গে প'ড়ে প্রাইভেটে আই. এ দেবেন'।

'তাই নাকি ?' আমি উৎসাহিত হয়ে জানতে চাই।

: না, মানে সেই কোন্‌কালে ম্যাট্রিক পাশ করেছি তো। মূর্খই হয়ে থাকলাম। তাই ভাবছি নিমাইয়ের সঙ্গে যদি পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া যায়। দিতে পারবো কিনা কে জানে। দিলেও এই বয়সে কি পাশ করবো ?

স্বল্পশিক্ষিত বিনয়ী মানুষটি কিন্তু থেমে থাকেননি। শিক্ষা বাড়িয়েই চলেন। আমি ধারাবাহিকভাবে জানতে পারি সহদেববাবু নিমাইয়ের সঙ্গে আই. এ আর বি. এ পাশ করেন। নিমাই ক্ষান্তি দিয়ে চাকরি নেয়। সহদেব কিন্তু প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম. এ হন।

প্রবীণ বয়সের এই উদ্যমী বিদ্যাচর্চা কিন্তু শেষপর্যন্ত সহদেবের কাজে এলো না। কারণ সবে যখন এম. এ পাশ ক'রে ভাবছেন হাই স্কুলে যাবার উদ্যোগ নেবেন তখন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হ'লো। নিমাই যা একটু সাকুব হয়েছে তখন তার পরের তিন ভাই নাবালক। নিমাই বাইরে চাকরি করে। সংসার কে দেখে ? ছোট ছেলেটা তো শিশু। খবর পেয়ে আমি যাই একদিন শোকে সান্ত্বনা জানাতে। জ্ঞানী বুঝমান মানুষকে কীই বা সান্ত্বনা দেবো ? গিয়ে দেখি শিশুটিকে

কোলে নিয়ে রান্না করছেন। অনভ্যস্ত গৃহস্থালীর চিহ্ন সারাবাড়ির সর্বাঙ্গে। নিজেই বলেন, 'পায়ে মারি টিচারই রয়ে গেলাম বুঝলেন? ছোটবেলায় একবার উঠে দাঁড়াতে গেলাম, বাবার মৃত্যু বসিয়ে দিলে। এবারে ভাবলাম উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি হ'লো, একবার জাতে ওঠা যাক। সবে খোঁজখবর নিয়ে কথাবার্তা চলছে পুঁটিমারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, তো আবার পায়ে মারি হ'লো! কী, করি বলুন তো?'

: কেন? পুঁটিমারি কি অনেক দূরে?

: তা ধরুন বাসে চেপে এক ঘণ্টা, তার আগে বাস রাস্তা যেতে আরো আধ ঘণ্টা, সঙ্গে এদিক ওদিক ধরে আরো আধ ঘণ্টা। মোট দুঘণ্টা যেতে, দুঘণ্টা আসতে। তা বাদে স্কুল আওয়ার। বাড়িতে অপোগণ্ড শিশু। তন্ময়।

: ওর নাম তন্ময় বুঝি?

: হ্যাঁ, মা মারা যেতে নাম রেখেছি তন্ময়।

: কেন?

: বড়টার নাম নিমাইপদ, মেজ বলাইপদ, সেজ কানাইপদ, ছোটটার নাম রেখেছিলাম মুক্তিপদ। কিন্তু এত শিশু যে দেখলাম জননীর মৃত্যুশোকই পেলো না। অবোধ তন্ময় হয়ে রইলো। তাই নাম দিয়েছি তন্ময়।

: এখন কীভাবে স্কুল করছেন?

: বাড়ির লাগোয়া স্কুল তো। চালাচ্ছি, কোনোমতে। দেখি তন্ময় তো খানিকটা বড় হয়ে উঠুক। তখন না হয় আরেকবার চেষ্টা করবো উচ্চ বিদ্যালয়ে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য দেশের পট পাল্টে যায়। সহদেব পাল চেষ্টা চরিত্র ক'রে পাশের গ্রামে হরিদাসপুরের স্কুলে হেডমাস্টারি পান। সেখানেই গত বিশবছরে সাইকেল ঠেঙিয়ে যাওয়া-আসা। সে ইস্কুলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

ভবিষ্যৎ নেই কেননা গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত চাষী। গ্রামের বিদ্যালয় তাদের পক্ষে উৎপাতস্বরূপ। চাষের যা রবরবা আর মজুর মুনিষের যা আকাল তাতে বাড়ির ছোঁড়াগুলো চাষের কাজে লাগলে সুবিধে কত। তা কি হবার জো আছে? মাস্টেরগুলোর চাকরি রাখতে হবে তো, তাই নড়া ধ'রে ধ'রে ছোঁড়াগুলোকে ইস্কুলে নিয়ে যায় জোর ক'রে। এই হ'লো সাধারণ গ্রামবাসীর মতামত। বাকি কজন সদাই রক্তচক্ষু! তাঁদের মতে সহদেব মাস্টের বাদে আর সকলেই ফাঁকিবাজ না হয় ধান্দাবাজ।

স্বাধীনদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় আর তার পরিবেশ সম্পর্কে সহদেব প্রায়ই

তাঁর হতাশা পেশ করেন। বলেন, 'আচ্ছা শিক্ষার পরিবেশের কি উন্নতি হবে না? মানুষ কি ক্রমশ অমানুষই হয়ে যাবে?'

শেষের প্রশ্নটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা! তাঁর কাছেই জানতে পারি বড় ছেলে চাকরিস্থলে গিয়ে মুকুন্দপুর থেকে খানিকটা সরে পড়েছে। মেজ বলাইপদ নকশাল হয়ে সাতের দশকে খুন হয়েছে। এ সবেরই অবশ্যম্ভাবী ফলে কানাইপদ বখে গেছে। সে এখন ক্বচিৎ বাড়ি আসে। এলে বাপের ওপর হম্বিতম্বি করে। মারাত্মক ড্রাগের নেশাড়ে। ব্যাপার স্যাপার দেখে সহদেবের শেষ আশ্রয় হ'লো তন্ময়। আমাকে বলেন, 'আমার এখন দুটো চিন্তা, বুঝলেন। একনম্বর হলো, রিটায়ার করা পর্যন্ত ইস্কুল বাড়িটা খাড়া থাকে কিনা। আর দুনম্বর হলো, বেঁচে থাকতে থাকতে তন্ময় লেখাপড়া শেষ করে কোনো কাজ পায় কিনা। তবে তো ভিটেটায় পিদিম জ্বলবে?'

তাঁর দুটো চিন্তারই সদুত্তর পাওয়া হয়নি। হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোকে ওপারে ডাক আসে। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি যাই। ম্লান মুখে নিমাই এসে দাঁড়ায়। কানাই কোথায় কোন্ ড্রাগের আসরে খবর মেলেনি। তন্ময় কলেজ-পড়ুয়া সবে। সে শোকে অনিশ্চয়তায় হতাশায় একেবারে পাথর। একজন গ্রামবাসী আমাকে বলে, 'নিমাইয়ের বাবা ছিলেন আদর্শবাদী। খানিকটা ভাববাদী বলতে পারেন। হিসেবনিকেশ করে দেখছি কিছুই রেখে যাননি। এত বিদ্যা জ্ঞান কি কাজে এলো বলুন তো? অথচ চার চারখানা সন্তান।'

আমি বললাম, 'ছি, মৃতমানুষের নিন্দে করতে নেই। আর নিমাইয়ের বাবা কী রেখে গেছেন তা কি কেউ বুঝবে কোনদিন?'

দুপুরবেলা শ্মশানে যাবার পথে হরিদাসপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে যখন কিছুক্ষণের জন্য মৃতদেহ এনে রাখা হলো তখন সারাগ্রাম শ্রদ্ধায় আবেগে অনুতাপে এসে ভেঙে পড়লো যেন। শিক্ষাহীনতার রুদ্ধ পরিবেশে এই প্রবীণ মানুষটি তো রোজই নিয়ম ক'রে এসে দরজা খুলেছেন। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় চেয়ে থেকেছেন বাস রাস্তার দিকে। অসাড় গ্রাম্য চাষীদের বুঝিয়েছেন ক্ষেতশ্রমের চেয়ে বড় হলো শিক্ষা। নড়া ধ'রে ধ'রে ছেলেদের এনে জোর করে পড়িয়েছেন। এঁদের কথা খবরের কাগজে বেরোয় না কোনদিন। জাতীয় শিক্ষকের সম্মান কখনই সহদেবের মতো মানুষ পাননা। তিনি যেন হরিদাসপুরের গ্রাম্য পুরোহিত। প্রতিদিন যত প্রতিকূলতাই থাক তবু সামান্য উপকার তুলে দিয়েছেন শিক্ষাসত্রে।

মৃতদেহ ঘিরে বিপুল জনস্রোত থেকে দূরে একটা কাঁঠাল গাছের তলায় ব'সে

নানা কথা ভাবছিলাম। তন্ময়ের কান্নাভেজা অসহায় মুখখানা মনে পড়ছিল, এমন সময় এক বৃদ্ধ মুসলমান চাষী হুঁকো হাতে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিনের বেলায় যেন খুব আঁধার নেমে এলো বাবু। মাস্টারমশাই চলে গেলেন। বিশ বছর ছিলেন। রোদে জলে একদিনের তরেও কামাই ছিলনি কাজে। হরদিন ঐ বকুল গাছটার তলায় বসে বাসরাস্তার পানে তেকিয়ে থাকতেন—কি না কখন মাস্টারবাবুরা আসেন। শেষ হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়েরও শিক্ষে-দিক্ষে শেষ।'

আমি বললাম, 'কেন? শেষ বলচেন কেন? অন্য মাস্টারমশাইরা তো রইলেন। নতুন হেডমাস্টারও একজন আসবেন বৈকি।'

: তা আসবে ঠিকই। কারুর স্থান কি ফাঁকা থাকে? তবে কি জানেন বাবু, ঐ সহদেব মাস্টার আর একটা হবে না।

বর্তমান শিক্ষা আর শিক্ষক সম্পর্কে একজন বর্তমান তৃণমূল মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা। আজকাল পথে-ঘাটে ট্রেনে-বাসে সব স্তরেই কি এমনধারা তিক্ত কথাবার্তাই শুনতে পাই না? প্রায় সবলোকেরই বক্তব্য হলো: আজকাল মাস্টারদের মাইনেকড়ি সুবিধেসুযোগ অনেক বেড়েছে কিন্তু সেইসঙ্গে বেড়েছে ফাঁকিবাজি। দুয়েকজন বাদে প্রায় সবাই অর্থলোলুপ আর ধান্দাবাজ। ইস্কুল কলেজে ভালো ক'রে পড়ায় না কিন্তু টিউশনীর দিকে খুব নজর। সেইসঙ্গে এই কথাটাও ব্যক্ত হয় যে আগেকার সব শিক্ষকই ছিলেন আদর্শবাদী, দরিদ্র কিন্তু সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ছাত্রদরদী। তাঁদের দেখলেই নাকি প্রণাম করতে ইচ্ছে করতো।

মুস্কিল যে জনমত সবসময়েই একটু প্রান্তবাদী হয়ে থাকে। আমাদের পুরোনো কালের গল্প-উপন্যাসে শিক্ষক শ্রেণীর বড় বীভৎস চিত্রায়ন দেখি। শিক্ষক মানেই রক্তচক্ষু, প্রহারপ্রবণ এবং প্রচণ্ড রাগী একজন ব্যক্তি। আমার নিজেরও তো অনেকটাই বয়স হ'লো। স্বাধীনতার আগে পরে বিদ্যালয় জীবনে যাঁদের কাছে পাঠ নিয়েছিলাম তাঁদের সবাইকে প্রাতঃস্মরণীয় মহিমময় ব্যক্তি ব'লে মনে হয়নি। একজন সুদী কারবার করতেন, একজন ছিলেন নেশাগ্রস্ত, আরেকজন ছাত্রদের সঙ্গে সমকামী অভ্যাসে রপ্ত ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ জানতেন না। খদ্দরধারী জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের ত্যাগ তিতিক্ষার যতটা প্রশংসা ছিল, ততটা জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইনি। সবচেয়ে বড় কথা, তখন শিক্ষাবিভাগে যে-সব লোক নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা এখনকার নিরিখে খুব আনকোয়ালিফায়েড ছিলেন। যৎসামান্য মানুষই তখন স্বেচ্ছায় শিক্ষক হতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থ-

নৈতিক মন্দা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে প্রচণ্ড বেকারী ঠেকাতে অনেকে শিক্ষকতা নেন। সিলেবাস ছিল সহজ সরল, বিজ্ঞানবিষয়ে পঠনপাঠন আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছোয় নি, সাহিত্যপাঠে সমাজ-ইতিহাসের প্রয়োগ ছিল অজ্ঞাত, ছাত্রদের মধ্যে এখনকার মত হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি, অভিভাবকরা ছিলেন নিশ্চিন্ত বা উদাসীন। তখন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বিদ্বান ব'লে মনে করা হতো, সৌম্যকান্তি শিক্ষকের প্রতি সম্ভ্রম দেখানো হতো, ছাত্রীদের মনে করা হতো মেধার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর।

তাই ব'লে এখন যেমন যদু-মধু রাম-শ্যাম শিক্ষা বা শিক্ষকবিষয়ে অনায়াসে মত ও মন্তব্য পেশ করেন, প্রশ্ন উঠতে পারে সে যোগ্যতা তাঁদের সকলের আছে কিনা। সেদিন ট্রেনে নিত্যযাত্রীরা একযোগে শিক্ষকদের আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে হঠাৎ এক শিক্ষককে দেখতে পেয়ে জিভ কেটে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনাকে আমরা কিছু বলিনি।'

শিক্ষক মন্তব্য না করে নিত্যযাত্রীদের পরিচয় জানতে চান। একজন কারখানার ফিটার, একজন তৃতীয়বর্গের কেরানী, একজন ছাপাখানার কম্পোজিটার, একজন বিদ্যুৎপর্ষদের কর্মী, যাঁর কাজ পোলে উঠে তার সারানো, একজন বইয়ের দোকানের সেলসম্যান, একজন লটারির টিকিট বিক্রেতা। শিক্ষক তাঁদের সবিনয়ে বললেন 'আপনারা যে বললেন প্রাইভেট টিউটররা দেশের সর্বনাশ করে দিলো, তা এখনকার যা সিলেবাস তা আপনারা নিজেরা পড়াতে পারবেন তো? তাছাড়া পড়াবেনই বা কখন? চলেছেন তো সারাদিনের মতো রুজি রোজগারে। দেখুন, আমি তো শিক্ষক কিন্তু নিজের মেয়ের জন্যে টিউটর রেখেছি। কেন বলুন তো? কারণ আমাদের কালের সিলেবাস আর নেই। গণিত, জীবনবিজ্ঞান আর ভৌতবিজ্ঞান পড়ানো আর আমাদের সাধ্যে নেই। সেটা ভেবেছেন কি? এসব বিষয়ে তাহলে পড়াবেন কে? ঐ সব বিষয়ের শিক্ষকরাই যোগ্য শিক্ষক, তাই নয় কি?'

কথা হ'লো এসব কথা ব'লে কে, রুখে দাঁড়ায়ই বা কে? ফলে চলেছে নিন্দার প্রবাহ, চরিত্রহননের অবাধ সচ্ছলতা। কে অধিকার দিয়েছে অযোগ্য মূর্খ ব্যক্তিদের শিক্ষাবিষয়ে মন্তব্য করবার? এ কি জনপ্রতিনিধি নির্বাচন যে সকলেরই সম অধিকার? কে বলেছে যে সব শিক্ষকই এখন ফাঁকিবাজ? কর্তব্যনিষ্ঠ ছাত্রদরদী প্রগাঢ় পণ্ডিত শিক্ষকদের কি অভাব আছে? চোর জোচ্চোর ঘুষখোর মদ্যপ ব্রতহীন আদর্শহীন সব মানুষই এখন শিক্ষকদের নামে যা খুশি বলে যান, ব্যাপারখানা কি?

বিদেশে কি শিক্ষকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের এতখানি সরব দেখা যায়? যায় না, কারণ সেসব দেশ কর্মের বেড়াজালে সদাচঞ্চল। দেশের সাধারণ মানুষ সাধারণের মতই থাকতে সেখানে অভ্যস্ত। আর এদেশে সকলেই বিশেষজ্ঞের মতো মন্তব্য দিতে তৎপর। এদেশের খেলোয়াড়, অভিনেতা, রাজনীতিক বা মন্ত্রী সম্পর্কে যতটা স্ক্যাণ্ডাল আমরা জানি ততটা তথ্য জানি না।

তবু চোখ-কান খোলা রাখলে অনেককিছু দেখা বোঝা যায়। আমাদের শহরে একজন সফল প্রাথমিক শিক্ষক আছেন। তাঁর কোচিঙে সন্তানকে কোনোপ্রকারে পড়াবার একটু ব্যবস্থা করতে অভিভাবকদের ছোটাছুটি করতে দেখি। দেখা গেছে, ভদ্রলোকের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত গুণে তাঁর কোচিং ক্লাশের ছাত্ররা পরীক্ষায় সফল হয়। তাই এত ভিড়, এত আকুলতা। বলাবাহুল্য, ভদ্রলোক নিজে যেচে কাউকে ডাকেন না বরং সবাই তাঁকে অনুনয় বিনয় করে। তাঁর ঘরের ছোট বারান্দায় বাচ্চাদের ছোট ছোট জুতো উপচে পড়ে। এ কি তাঁর দোষ? তাঁর বাড়ির সামনে সর্বদাই অপেক্ষমান জনক-জননীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। নববর্ষের বিকালে এক ব্যবসায়ী ব্যঙ্গ ক'রে শিক্ষক মশাইকে বললেন, 'কি স্যার, বাড়ির সামনে প্যাণ্ডেল ক'রে গার্জেনদের একটু সরবৎ-মিষ্টি খাইয়ে শুভ নববর্ষ করুন। সারাবছর ওদেরই তো টাকা পিটছেন।'

ভদ্রলোকের এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মাথা পেতে নিতে হয়, যদিও তা নেবার কথা নয় তাঁর। কিন্তু তিনি পেশায় শিক্ষক তাই স্বভাবনম্র আর ক্ষমাশীল হতে হয় তাঁকে। তাঁর অবশ্য মনে থাকে যে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক মদ্যপ ও লম্পট।

ব্যতিক্রমও আছে বৈকি। একবার আমাদের শহরের গৌতম মণ্ডল নামে একটি ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিন লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয়। তাতে শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়। ছেলেটিকে সম্বর্ধনার ঢেউ ওঠে। তবে তার এই অসামান্য সাফল্যে শিক্ষকদের অবদান বিষয়ে তেমন কোনো উচ্ছ্বাস বা স্বীকৃতি শুনিনি। সে যাই-হোক, তার অনেক সম্বর্ধনার মধ্যে একটি সভায় আমি ছিলাম। সে সভার সভা-পতি শহরের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ ব্যবহারজীবী নন্দকিশোর সান্যাল ভারী চমৎকার একটা ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন: 'এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের এখানকার একটা পুঁচকে ছেলে সকলের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে শুনে তো আমি অবাক! সে আবার আমাদের সামনে ব'সে আছে ভাবলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমি

আমার এই নব্বই বছরের জীবনে ভালো ছাত্র অনেক দেখেছি, ফার্স্ট বয়ও কম দেখিনি। কিন্তু মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে এমন ছেলে এই প্রথম দেখলাম। তাই ভাবছি, ভাগ্যিস এতদিন বেঁচে আছি তাই তো শ্রীমান গৌতমের মুখখানা দেখলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

নন্দকিশোর বাবু এরপর বললেন, 'এখন যাকে বলে মাধ্যমিক, আগে তাকে বলতো ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। আমিও চুয়াত্তর বছর আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। তখন দেশ ভাগ হয়নি। তবু সারাদেশে পুব-পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মাত্র হাজার ত্রিশেক ছাত্র ম্যাট্রিক দিয়েছিল। আর এখন এবারে এই পশ্চিমবঙ্গেই তিনলক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক দিয়েছে। ভাবতেই পারিনা কী বিশাল এই ব্যাপার কতটা প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে এই ছেলে একেবারে ফার্স্ট? বলিহারি যাই।

'আর একটা কথাও আমি বোলবো। আমি সভা আরম্ভের আগে গৌতমের বাবা-মার সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে জানতে পারলাম ছেলেটা যে কেবল বই মুখে গুঁজে থাকে তা নয়। বিতর্ক করে, খেলে, সারাপৃথিবীর খেলার খবর রাখে, গল্প-উপন্যাস পড়ে, প্রবন্ধ-গল্প লেখেও। বাপ রে, আমাদের সময় এসব তো ভাবাই যেত না। তখন গুড-বয়রা ছিলো বুক-ওয়ার্ম। খেলার মাঠে তাদের দেখাই যেত না। আসলে এখন পৃথিবী তো অনেক বড় হয়ে গেছে। স্বাধীন দেশ। বিশ্বের সব দেশের সঙ্গে আমাদের এখন ল'ড়ে জায়গা করে নিতে হবে। আধুনিক সব জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর রাখতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আর কৃৎকৌশলের হদিশ নিতে হবে। তারপর এখন যাকে বলে কম্পিউটার, স্ট্যাটিস্টিকস আর ইলেকট্রনিক্সের যুগ। এখন কি আর ম্যাদামারা গুড বয়ের যুগ আছে? আমার নাতি নাতনিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি তো, কত কী-ই জানে তারা। তাই সবশেষে বলছি শ্রীমান গৌতম, তোমার সামনে বিরাট বিশ্ব। তুমি মেধাবী আর বুদ্ধিমান। সারা বিশ্বের মানচিত্রে তোমাকে ভবিষ্যতে আমরা চাই। আর এই নব্বই বছরের বৃদ্ধের একটি আবদার আছে তোমার কাছে। দ্যাখো, বেশিদিন বেঁচে থাকলেই দুঃখ তাপ শোক-বেদনা একটু বেশি পেতে হয়। তা তোমাকে বাপু একটাই বলবার কথা আমার। যে কদিন বাঁচি যেন শুনতে পাই তুমি সব পরীক্ষায় কেবল ফার্স্ট-ই হয়ে চলেছ, সেকেণ্ড কোনদিন হবে না। এই বৃদ্ধ বয়সে সেই দুঃখটুকু আমাকে দিও না। আমি তা সইতে পারবো না।'

আজো মনে পড়ে চমৎকার সেই সভার স্মৃতি। মনে থাকে সেই প্রবৃদ্ধের গভীর সরস সমঝদারি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেই উদারতা, উচ্চ মনের প্রতিফলন দেখি কই?

বেশির ভাগই তো সমালোচনাপ্রবণ, নিন্দামুখর। এখনকার শিক্ষক আর শিক্ষার্থী সকলের কাছেই তো নিন্দিত হচ্ছেন। ভেবে দেখার সময় হয়েছে দেশের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন লড়াইটা কাদের ?

* * * *

আজ থেকে বিশ বছর আগে পশ্চিবঙ্গের কোনো এক গ্রামে গড়ে উঠেছে একটি কলেজ। যে-অঞ্চলে কলেজটি হয়েছে সেখানে ছিল অসার গহীন জঙ্গল। মনুষ্য-বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দেশভাগের পর একদল কর্মঠ আর সাহসী নমঃশূদ্র সেখানে জঙ্গল কেটে বসত বানিয়ে নেয়। নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর যখন তারা প্রতিষ্ঠিত হ'লো অনেকটা তখন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা ঘটলো প্রথমে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ক্রমে আরেক উচ্চ বিদ্যালয়। পরে দেখা গেল, উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ-করা ছেলেমেয়েগুলি অবর্ণনীয় কষ্টে পড়ছে শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে। উদ্যমী আর উচ্চাশাভরা একজন অঞ্চলনেতা তখন স্বপ্ন দেখলেন একটা কলেজ খোলার। সব রাজনৈতিক দল এককাট্টা হয়ে মহাকরণের শিক্ষাদপ্তর থেকে কলেজ খোলার অনুমতি আদায় করলেন। তপসিলী ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় যোজনার সূত্রে একটা মোটা অনুদান পাওয়া গেল। অনেক স্থানীয় মানুষ ভূমিদান করলেন। সেই জমি বেচে অনেক টাকা হ'লো। কলেজ শুরু হয়ে গেল এক পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে। তখন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়নি। অধ্যাপক নিয়োগে প্রাইভেট কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর অনেকটা অবাধ স্বাধীনতা ছিল। সেই সুবাদে কলেজে একটি সুবিধাজনক অধ্যাপকমণ্ডলী গডে উঠলো। তাঁরা জ্ঞানবুদ্ধিতে কেমন, তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল কোন্ পর্যায়ের সেসব তো আমার জানার কথা নয়। কেননা আমি থাকি দূরে। জায়গাটার নামটাই কেবল জানতাম। জানতাম আরো যে সেখানে একটা কলেজ চালু হয়েছে। ভালোই তো।

ভালো যে ততটা নয় তা অবশ্য বুঝতে পারি বছরখানেক পরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে বি.এ পরীক্ষকদের এক সভা হচ্ছিল সেদিন। প্রধান পরীক্ষক নির্দেশ দিচ্ছিলেন খাতা দেখার বিষয়ে আমাদের সকলকে। সভার শেষে সবে করিডরে একটু দাঁড়িয়ে বহুদিন বিগত বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতির তাপ নিচ্ছি এমন সময় অকলংক শুভ্রবস্ত্রধারী একজন আমাকে প্রণাম করলো। তার কাঁধ ধ'রে তুলে দেখলাম আমার অনার্সের প্রাক্তন ছাত্র দেবল মণ্ডল। বললাম, 'তুমি এখানে ?'

দেবল বললো, 'পরীক্ষার খাতা নিতে এসেছি স্যার। আপনার সঙ্গেই তো মিটিং করছিলাম।'

: তুমি কলেজে পড়াচ্ছো নাকি ? কোন্ কলেজে ?

দেবল সেই নবনির্মিত কলেজের নামটা বললো। কিন্তু আমি পড়লাম ধন্দে। ধন্দ এই যে, আমার স্মৃতি জানান দিচ্ছিল দেবল ছাত্রজীবনে ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বানান ছিল অশুদ্ধিতে ভরা, বাক্যগঠনের দুর্বলতার জন্য তিরস্কৃত হতো। শেষপর্যন্ত অনার্সও পায়নি। পরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করে ব'লে জেনেছিলাম। কিন্তু সে যে কোনোভাবেই অধ্যাপনার কাজে উপযুক্ত এমন ভাবার কারণ নেই। এখন ছেলেটির মুখে কিন্তু গর্বিত আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। একবছর অধ্যাপনা ক'রেই হাতে অধ্যাপকসুলভ চামড়ার ব্যাগ নেওয়া রপ্ত করেছে, পোষাকও পরেছে যাকে বলে অধ্যাপক শোভন। অথাৎ ছাপা বাঁধাই ভালো, প্রচ্ছদও দৃষ্টিনন্দন। চিন্তা সেখান থেকেই শুরু হ'লো।

ফেরবার পথে ট্রেনে দেবলেরই সহপাঠী রাজেনের সঙ্গে দেখা। রাজেন বেশ মেধাবী ছিল। রাইটার্সে কাজও করে উচ্চপদে। তার কাছে আমি সারাদিনের জমিয়ে-রাখা বিস্ময় আর মর্মবেদনা উজাড় ক'রে ফেললাম। প্রশ্নও করলাম, 'আচ্ছা, দেবল ঐ কলেজে কাজ পেলো কী করে ?'

রাজেন সংক্ষেপে বললো, 'ডোনেশন স্যার'।

: তার মানে ?

: তার মানে কলেজ ফাণ্ডে ও পঁচিশহাজার টাকা দিয়েছে জমি বেচে। সেটাই কর্তৃপক্ষের শর্ত ছিল। ওর যুক্তি হলো, সারাজীবন তো বেকারই থাকতে হতো। তার বদলে অধ্যাপনা। সোজা কথা। ইনসিয়াল ইনভেস্টমেণ্ট পঁচিশ হাজার। একবছর বেতন পেলেই শোধবোধ। ও বললো, 'ধরে নিয়েছি যেন একবছর আমি বেতন পাইনি। পরের বছর থেকে তো মোটা বেতন প্লাস সামাজিক সম্মান।'

: বাঃ, ছোকরার বুদ্ধি আছে তো ? পড়াতে পারে ?

: পড়াবে কী করে ? নোটস্ দেয়, পরীক্ষার আগে কোশ্চেন বলে দেয়। খুব অনুন্নত কলেজ, খুব লো-স্ট্যাণ্ডার্ড তো, চলে যাচ্ছে। তবে দেবল অন্যদিকে আরেকটা দাঁও খুব জোর মেরেছে।

: সেটা কী রকম ?

: ও তো তপসিলীভুক্ত, তাই সমাজে বিদ্বান বলে খুব মান্যগণ্য ব্যক্তি। বিয়ে

করেছে খুব ধনাঢ্য পরিবারে। একলাখ টাকা নগদ নিয়েছে জানেন স্যার, ও আমাদের কিনতে পারে।

বুঝলাম, বেশিরভাগ অধ্যাপকদের কঠিন লড়াই এই জায়গাতেও। অযোগ্যদের পাশে সৎ কর্তব্যপ্রবণ, বিবেকী আর মেধাবীদের আত্মসম্মান রাখার লড়াই।

মনে পড়লো অদ্রীশবাবুর কথাও। ম্যাট্রিক থেকে আই. এস-সি দ্বিতীয় আর প্রথম স্থান পেয়ে পাশ করেছিলেন। বি. এ এবং এম. এ পরীক্ষাতে হয়েছিলেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তারপরে জলপানি পেয়ে ইংলণ্ড যান। কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রি নিয়ে ফেরেন। প্রথমে অধ্যাপক, পরে কলকাতার নামজাদা এক কলেজের অধ্যক্ষতার গৌরব। কিন্তু সত্যিই গৌরবের কি? তার সঠিক মূল্য নির্ধারণের জন্যে হরিচরণ দত্তের কাহিনীটাও জানতে হবে।

স্বাধীনতার পরে অনেক অপ্রধান জনপদ ক্রমে জমজমাট হয়ে উঠেছে। নানা বর্গের জন বিস্ফোরণের চাপে স্কুল-কলেজের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। ফলে, যে-যেখানে যেভাবে পেরেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। একেক জায়গায় এমন হয়েছে যে হয়ত সেখানে প্রথম এক শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যারা কলেজের মুখ দেখলেন। অশিক্ষিত অভিভাবক আর হঠাৎ-ছাত্রগোষ্ঠীর আচার ব্যবহার হয়ত তেমন নম্র সহনশীল বা অ্যাকাডেমিক নয়। যেমন করে তারা জমি হাঁসিল করেছে তেমনই জোর ক'রে শিক্ষা ও শিক্ষকদের কব্‌জা করতে অভ্যস্ত। উদ্ধত, জেদী, জঙ্গী—সেইসঙ্গে কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের মদত এ সব শিক্ষার্থীদের বেপরোয়া করে দিয়েছে। কল্যাণপুর এমনই এক কাল্পনিক নাম যেখানে এমন একটি কলেজ আছে যার ছাত্ররা ঐ ধরনের। সেখানে আইন মোতাবেক বিজ্ঞাপন দিয়ে অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই অধ্যক্ষ কলেজ চালাতে পারেননি। পরবর্তী বিধিসম্মত অধ্যক্ষরাও অপমানিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন। অপমান ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখা গেল একজন স্থানীয় অধ্যাপককে (ধরা যাক তাঁর নাম হরিচরণ দত্ত) ছাত্ররা খুব পছন্দ করে। হরিচরণের অবশ্য অধ্যক্ষ হবার মতো যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু কলেজ চালাতে তিনি দক্ষ। কেননা অমন ভয়ংকর জঙ্গী ছাত্ররাও তাঁকে মানে। তিনি তাদের পিঠে হাত রেখে কথা বলেন, পরীক্ষায় অসদুপায় নিলে সেদিকে তাকান না। শোনা যায়, আড়ালে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ধূমপানও করেন। তাঁর জনপ্রিয়তা অবাধ। 'হরিচরণ স্যার' একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি। যাহোক কলেজের গভর্নিং

বডি, যার সভাপতি একজন এস. ডি. ও, ভেবে দেখলেন বাইরে থেকে অধ্যক্ষ এনে কিছুতেই কলেজ চালানো যাবে না ঐ লোকালয়ে। অগত্যা তাঁরা একমত হয়ে হরিচরণ দত্তকে কলেজের অফিসার-ইন-চার্জ করে দেন। এরপরে যাকে বলে স্মুথলি কলেজ চলতে থাকে। বছর বছর স্থায়ী অধ্যক্ষের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কিন্তু হরিচরণ নানা কৌশলে তাতে প্রতিবন্ধ ঘটান। মোটকথা, সেই ইনটার-ভিউটা হতে পারে না। কখনও প্রার্থীদের কাছে ভয় দেখিয়ে গোপন চিঠি যায়, কখনও কলেজ গৃহে অধ্যক্ষ-পদপ্রার্থীদের আসবার পথে হরিচরণ-সমর্থক ছাত্ররা সারি সারি শুয়ে পড়ে। ধ্বনি দেয় : 'চাই না, চাই না। বাইরের অধ্যক্ষ চাই না।'

হরিচরণের অধ্যক্ষ হবার পথে কাঁটা ছিল দুটো। এক, তাঁর কেরিয়ার খুব সাধারণ মাপের। দুই, তাঁর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা ছিল কম। কিন্তু দেখতে দেখতে সাতটা বছর কাটলো। হরিচরণের একসপিরিয়াসের ঘরটা বেশ নধর হয়ে উঠলো। এবারে সবরকমের যোগাযোগ ক'রে, সব জায়গায় পূজো চড়িয়ে তিনি পাকাপাকি অধ্যক্ষ পদে ব'সে পড়লেন।

তা না হয় হ'লো, কিন্তু মুড়ি মিছরির একই দর হয়ে গেল এই যা দুঃখ। কেননা উজ্জ্বল মেধাবী ডিগ্রিধারী অদ্রীশ বাবুও প্রিন্সিপ্যাল, হরিচরণও প্রিন্সি-প্যাল। দুজনেরই এক বেতনক্রম, একই সুযোগ। এর বিরোধী ফলাফল ক্রমেই বোঝা যাবে। কেননা অদ্রীশ বাবুরা এসব দেখে কেবলই গুটিয়ে যান আর হরিচরণবাবুরা শুধুই নিজেদের মেলে ধরেন। এদেশে সত্যিই এমন ঘটনা আছে যে, সর্বৈবভাবে ব্যর্থ অধ্যাপক হয়েছেন উপাচার্য, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলবাজির জোরে অযোগ্য ব্যক্তি হয়েছেন প্রধানশিক্ষক। এ ঘটনাও সত্য, কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়মে যাঁর কলেজে পড়াবার যোগ্যতা নেই তিনি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে জেঁকে বসেছেন।

এসব শুনে আমার একজন আমলা বন্ধু বললেন, 'আসল প্রবলেমটা কি জানো? প্রবলেমটা হলো নিউমারিকাল।'

'তার মানে?' আমি জানতে চাই।

: তার মানে সবটাই সংখ্যায় বেড়ে গেছে। আগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল এখন হয়েছে আটটা। আগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল তাই তার একজন ডাকসাইটে ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। কে? না বাংলার বাঘ। এখন আটটা ইউনিভার্সিটিতে আটজন ডাকসাইটে লোক কোথায় পাবেন? তাই বাঘের বদলে বেড়াল।

পাশের বন্ধু টিপ্পনী কাটলেন, 'সেই বেড়ালও কেবল ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করেন আর দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে লেজ মোটা করেন। কেননা একদল ইঁদুর জোট পাকিয়ে বেড়ালের লাইফ হেল করে দেয়। তারপর একদিন বেড়াল পালালে ইঁদুর-দৌড় শুরু হয়। ঠিক কিনা।'

: একেবারে সঠিক। এইভাবেই দেখবে কলেজের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে বিশ গুণ, স্কুল বেড়েছে পঞ্চাশ গুণ। একটা জেলায় প্রাইমারি স্কুল আড়াই হাজার। ভাবা যায়? এত সব পোস্টে লোক চাই। নিশ্চয়ই সবাই যোগ্য নয়, সবাই উইলিং নয়। আমি নিজের চোখে দেখেছি কলেজের ভর্তির আবেদনপত্রে লেখা আছে 'ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবকের পেশা'—অভিভাবক একজন স্কুলটিচার হয়ে নিজে হাতে ফর্ম পূরণ করে লিখেছেন 'টিচারী'। টিচারী কিরকম ইংরাজি মশাই?

আমলা বললেন, 'ও এতেই আপনি চমকে যাচ্ছেন? সারা দেশে এক অল্পবিদ্যার ভয়ংকরী কি এক ইংরাজি চালু হয়েছে সে আপনি ম্যাগাজিন করতে পারবেন না। ডু ইউ আণ্ডারপ্যাণ্ট?'

বন্ধু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'সে আবার কি?'

: ম্যাগাজিন মানে ইমাজিন, আণ্ডারপ্যাণ্ট বলতে আসলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রেনে শুনেছি লোকে বলে 'সিংগ্‌ল্‌' হয়েছে কিন্তু এখনও ট্রেন ছাড়ার কথা মাইকে 'অ্যালাউন্স' করেনি।

: এ সবই ক্রমে চলবে এবং শুদ্ধতা বিদায় নেবে। জানেন কি আমাদের ইংরাজির সহকর্মী বিকাশবাবুর কীরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল? তিনি গিয়েছিলেন গ্রামের এক জুনিয়র হাইস্কুলের শিক্ষক নির্বাচনের ইণ্টারভিউ নিতে। প্রার্থীরা পাশ গ্র্যাজুয়েট, সেটাই প্রার্থিত। তিনি একজন প্রার্থীকে জিগ্যেস করলেন, 'বি. এ-তে আপনার কোন ইংরাজি নাটক পাঠ্য ছিল?' প্রার্থী জবাব দিলেন, 'মার্চেণ্ট অফ ভিনিস'। বিকাশবাবু বললেন, 'মার্চেণ্ট অফ ভিনিসে'র কোন্‌ চরিত্রটা আপনার বিশিষ্ট বলে মনে হয়েছিল?' প্রার্থী নীরব। এবারে বিকাশবাবুর জানতে চান, 'মার্চেণ্ট অফ ভিনিস কার লেখা জানেন?' হাস্য-উদ্ভাসিত মুখে প্রার্থী বললেন, 'সে আর জানবোনা স্যার? লিখেছেন—ডি. এন. ঘোষ।'

এ ঘটনা শুনে দুজন বন্ধুই হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, আর আমার মনে হ'লো আসলে তাঁরা কাঁদছেন।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত থাকবার সুবাদে সারাজীবনে কতবার দেখেছি যোগ্য ব্যক্তি তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা বা সমাদর পাননি, উল্টোটাও দেখেছি। অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তি দাপিয়ে গেলেন শুধু ঠিক ঠিক লাইন ধ'রে। এর ফলে শিক্ষা-জগতে আজকাল একরকম দালাল শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যেমন সব বৃত্তিতেই হয়েছে। এসব দালাল এমনই কানকাটা যে শিক্ষক হয়ে আরেক শিক্ষককে বলেন, 'কেসটা দেখবেন দাদা, ওটা আমার কেস।' এক্ষেত্রে কেস বলতে বুঝতে হবে কখনও অ্যাডমিশন কেস, কখনও প্রোমোশনের কেস, কখনও নম্বর বাড়ানোর কেস!

এইভাবেই পাওয়া যাবে টিউশনী বাগাবার কেস, এগজামিনারশিপ তদুপরি স্ক্রুটিনিয়ার হবার জন্য উমেদারির কেস, ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম পাবার জন্যে তাঁবেদারির কেস। এঁরা একজন শিক্ষককে খুশি করার জন্যে আরেকজন শিক্ষককে গালিগালাজ করেন। সহকর্মীকে হেনস্থা করবার জন্য সহকর্মীদের নিয়ে দল পাকান। এঁরা ইন্টারভিউয়ের আগে এক্সপার্টের নাম জেনে তাঁর বাড়ি ধাওয়া করেন। অন্যকে দিয়ে বড় মানুষের কাছে পৌঁছে যান। বেনামীতে নোট লেখেন বা অন্যের লেখা নোটস্ নিজের ব'লে ক্লাসে চালান। সংখ্যায় এঁরাই বেড়ে চলেছেন। আশ্চর্য কি যে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জাতীয় শিক্ষক বলে সম্মান ও প্রশংসাপত্র পান। এ সবের ফলে হীনতা, দালালি আর উমেদারি যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনই স্টাফ রুমে শিক্ষকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে বিদ্যাদান বা সেই অনুষঙ্গী কিছু নয়, বরং পে-কমিশন কিংবা মেহরোত্রা কমিশন, অ্যাসো-সিয়েশন কিংবা মিনিস্টার।

আমার এক বন্ধু বলেন, বুঝলে, আজকাল কলকাতায় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোকের দেখা হ'লে কুশল বিনিময়ের বদলে জিগ্যেস করা হয়, 'আপনার টেলিফোন ঠিক আছে তো?' হয়ত একটু অত্যুক্তি কিন্তু অনেকটাই সত্য। আমরা যতটা মানবিক তার চেয়ে বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে। একজন শিক্ষক বা অধ্যাপক তাই এখন শিক্ষাসত্রে প্রবেশ ক'রে জিগ্যেস করেন, 'আমাদের নাকি আরেকটা ডি. এ অ্যানাউন্স করেছে? কবে থেকে দেবে? তাহ'লে সেন্ট্রাল ডি. এ-র থেকে আমরা ক' কিস্তি পিছিয়ে থাকলাম?'

এ সবেরই ফলে যোগ্য শিক্ষক বা অধ্যাপক ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের বৃত্তে। প্রভাসচন্দ্র চন্দের মত আমার কোনো কোনো সহকর্মী ঢেকে যাচ্ছেন বিস্মৃতিতে। এখানে আমি আলাদাভাবে প্রভাসবাবুকে শ্রদ্ধা জানাই। ছয়ের

দশকে তিনি সহকর্মী ছিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানতপস্বী সরল মানুষ। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কোথায় যে আত্মগোপন করেছিলেন কে জানে? হঠাৎ প্রায় বিশ বছর পরে তাঁকে দেখলাম। শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, বয়সের ভারে একটু বুঝি বেঁকে গেছেন। কাঁধে একঝোলা মোটা বই নিয়ে কলকাতা থেকে সটান একেবারে আমার বাড়ি। কী ব্যাপার? ম্লান হেসে বললেন, 'এখন আর আমি আপনার প্রাক্তন সহকর্মী নই। এখন আমি হকার। নিজের বই নিজেই খরচ ক'রে ছেপেছি। কেউ তো ছাপলো না। এক কপি কিনবেন তো কলেজের জন্যে?'

কুণ্ঠিতভাবে বলি, 'আরে বসুন আগে। চা মিষ্টি খান। পরে কথা হবে। কত দিন পরে দেখা বলুন তো?'

প্রভাসবাবু, 'বিশ বছরের কাছকাছি তো বটেই। মনে পড়ে সে সব পুরোনো দিনের কথা?'

মনে পড়ে যায় সেই আমার প্রথম যৌবনের অধ্যাপনার দিনগুলো। তখনই প্রভাসবাবু বেশ প্রবীণ। অধ্যাপনা করতেন পারসি ভাষা ও সাহিত্যের। কিন্তু অধ্যাপনা করতে পেতেন কই আর? আরবি পারসির ছাত্রই মিলতো না। তাই বছরের পর বছর কলেজে আসতেন আর বাড়ি যেতেন। ছাত্র নেই।

তাই ব'লে অবকাশটা নষ্ট করেননি। গ্রন্থাগারে সর্বদাই বই ঘাঁটতেন। একদিন কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম, 'কি বই এত ঘাঁটছেন? লক্ষ্যটাই বা কি আপনার?'

উজ্জ্বল চোখদুটো মেলে সোৎসাহে বললেন, 'বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের একটা তালিকা আর প্রয়োগের নমুনা তৈরি করছি। বিরাট কাজ। সব বাংলা বইই তো দেখতে হচ্ছে।'

উত্তেজিত আবেগতাড়িত হয়ে ব'লে বসলাম, 'লিখুন আপনি বই, আমি ঠিক প্রকাশক যোগাড় ক'রে দেবো।'

মনে আছে সে কথা রাখতে পারিনি। পাণ্ডুলিপি বগলে ক'রে কলকাতার তাবৎ প্রকাশকের দোরে ধর্না দিয়েছি। কেউ রাজি হন নি। 'ধুর মশাই, এসব বই এখনকার পাবলিক খাবে না' কিংবা 'কে এই প্রভাসচন্দ্র চন্দ? নামই শুনিনি কোন দিন। কি জানি মশাই আপনিই নাম ভাঁড়িয়ে এসব লিখছেন না তো?'— এ জাতীয় ছিল প্রকাশকদের উৎসাহ বাণী।

রাগে হতাশায় ফুঁসে আমি প্রভাসবাবুকে ব'লে বসি, 'কেন মশাই আপনি

এত সাবজেক্ট থাকতে পারসি পড়তে গেলেন? হিন্দুর সন্তান তো বড় একটা এসব পড়ে না। আপনাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বলুন তো?'

: সেইটাই তো বলা মুস্কিল। তবে কি জানেন, আমি বরাবরই একটু কল্পনা-প্রবণ আর আদর্শবাদী। তখনও পার্টিশন হয়নি। আই. এ পড়ি ১৯৪০ নাগাদ ঢাকার জগন্নাথ কলেজে। হিন্দু মহাসভার একটা ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা করতে এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি কি বললেন জানেন? বললেন, হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য, হিন্দুর সংস্কৃতির বিশিষ্টতা বুঝতে গেলে আগে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আরবি পারসি পড়তে হবে। সেই উন্নত ভাষাব সাহিত্য আর দর্শন জানতে হবে। আছেন এখানে কোনো ছাত্রবন্ধু যিনি আমায় আজ কথা দেবেন যে আমার পরামর্শমত আরবি পারসি পড়বেন? আমি আবেগের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি কথা দিচ্ছি পড়বোই।'

: তারপর?

: তারপর আর কি? আত্মীয় স্বজন সকলের অমতে ঢাকায় অনার্স আর এম. এ পাশ করলাম। ফার্স্ট ক্লাশই পেয়েছিলাম। কিন্তু দেশভাগ হ'লো হঠাৎ। চলে আসতে হ'লো। শ্যামাপ্রসাদও অকালে মারা গেলেন। এদেশে অধ্যাপনা করতে করতেই আরো একটা বিষয়ে এম. এ করলাম কিন্তু ঐ বিষয়ে অধ্যাপনা পেলাম না, কেননা ঐ বিষয়ে আমার অনার্স নেই! ঐ সাবজেক্টই হয়েছে আমার নিয়তি। যদি বা একটা বই লিখলাম তো প্রকাশকরা ছাপে না। শুধু শুধু দেখুন তো, আপনার কি হয়রানি!

পরে 'হাফিজের কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ' বিষয়ে গবেষণা ক'রে প্রভাসচন্দ্র ডি. লিট পান কিন্তু একথাও সত্য যে তিনি বেশির ভাগ অধ্যাপনা জীবনে ছাত্র পাননি, সমগ্র অধ্যাপনা জীবনে প্রমোশন পাননি এবং সারাজীবন জ্ঞানচর্চা ক'রে স্বীকৃতি পাননি।

এদিকে আমার নাকের ডগা দিয়ে কত সাধারণ মেধার অধ্যাপক তাঁদের বিষয়ের নানান চমকদার বা লাগসই বিষয়ে গবেষণা ক'রে চটজলদি ডিগ্রি নিয়ে তরতর ক'রে উন্নতির সোপানে উঠে গেলেন। প্রভাসচন্দ্র আরবি পারসির মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত ক'রে, সেই ভাষায় কাব্যসাহিত্য দর্শন প'ড়ে, বহু শ্রমে ধৈর্যে দীর্ঘকাল গবেষণা ক'রে যা লিখলেন তা তাঁকে উন্নতির সোপানে তো নিয়ে গেলই না এমনকি তা মুদ্রিত হয়ে বিদ্বৎ সমাজেরও সমাদর পেলো না। একমাত্র তখন পূর্ব পাকিস্তান তাঁর রচনার ও প্রচেষ্টার কিছু সমাদর করেছিলো। 'বাংলাভাষায়

আরবি পারসি শব্দ' তারাই আগ্রহ ক'রে ছাপে। সে দেশে অধ্যাপনার জন্য প্রভাসচন্দ্রের ডাকও আসে। বলতে গেলে তা মাতৃভূমিরই ডাক, কারণ তাঁর আদিবাস্তু তো নোয়াখালিতে। কিন্তু প্রভাসচন্দ্রের আদর্শবাদী মনে এই অভি-মান ছিল যে, মাতৃভূমি থেকেই তিনি একদা উৎখাত হয়েছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা যে-ইসলামী সংস্কৃতির গভীরতা, বৈচিত্র্য ও উদারতা আরবি পারসি সাহিত্যে তিনি উপভোগ করতেন, মুগ্ধ হতেন—সেই ইসলামি জীবনের অন্য এক নগ্নতা, ভয়ংকর দাঙ্গাবাজ জিঘাংসা তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি সে দেশের সমাদরের লোভ ত্যাগ ক'রে এ দেশের অনাদরের অবমান মেনে নেন।

একদিন স্টাফরুমে তিনি আমাকে পরিতাপের সঙ্গে নিচু স্বরে বলেছিলেন, 'আপনাকে গোপনে বলছি, আমি হিন্দু মুসলমান দুজনেরই কাছে মার খেয়েছি। আমার নিজের দেশের মুসলমানরা বাস্তু কেড়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। আর এ দেশের মুসলমানরা সারাজীবন আমার প্রমোশনের পথ আটকে রেখেছে। জানেন কি, আমাদের সার্ভিসে আমিই একমাত্র হিন্দু ক্যাণ্ডিডেট ছিলাম? কিন্তু মুসলমান একসপার্টরা বরাবর আমাকে উপেক্ষা করেছেন। আমার ডি. লিট ছিল তবু আমার কেস কখনও প্রমোশনের জন্য বিবেচিত হয়নি। আর দেখুন এদেশে এসে হিন্দুদের হাতেও আমি মার খেলাম। তারা আমার বই ছাপলো না কেন জানেন? তার বিষয় ইসলামী ব'লে। তারা কি জানে আরবি পারসি জীবনদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু জীবনদর্শনের কি গভীর মিল? তারা কি বোঝে, যে-ভাষায় তারা কথা বলে তার দশটা শব্দের একটা হলো আরবি না হয় পারসি? হাফিজ মুসলমান ব'লেই এদেশে অচ্ছুৎ থেকে গেলেন?'

শিক্ষা-অশিক্ষার এই মর্মান্তিক বিবরণ শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। একজন প্রকৃত শিক্ষিত সমন্বয়কামী উদার মানুষের জীবনব্যাপী অনাদর আর অপমান আমাকে তাড়িত করে। আমি অস্থিরতা বোধ করি কিন্তু কিছু করতে পারি না। প্রভাসচন্দ্রের জন্য শুধু আমার মনের গভীরে এক অমলিন শ্রদ্ধার স্মৃতিফলক গ'ড়ে রাখি।

তাই এতদিন পরে বৃদ্ধ ন্যুব্জ প্রভাসচন্দ্র যখন আমার বাড়ি তাঁর নিজের পয়সায় ছাপা বই নিয়ে এসে বলেন 'আমি এখন হকার' তখন সব এলোমেলো লাগে। এই শিক্ষা জগৎ, এই প্রকাশনার জগৎ, এই বুদ্ধিজীবীদের ভদ্রতার ভান আমার চুরমার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে। আমি যেন নিজেকেও ছিন্ন করতে চাই। তবু প্রকাশ্যে শান্ত চিত্তে তাঁকে সমাদর ক'রে বসাই, ভোজ্যে আপ্যায়ন করি।

আমার মনে পড়ে, যখন একসঙ্গে কাজ করতাম মাঝে মাঝে প্রভাসচন্দ্রের বাড়ি গেলে কত সমাদর ক'রে মিষ্টি আর চা বিস্কুট খাওয়াতেন। মানুষটার সরল অকপটতার একটা ঘটনাও মনে পড়লো। একদিন সন্ধ্যাবেলা গেছি তাঁর বাড়ি। দিলেন শুধু চা। বললেন, 'আজকে মিষ্টি পেলেন না, বিস্কুটও না। আজ যে মাসের একত্রিশ তারিখ। একটাও পয়সা নেই।'

প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে এতটা অকপট আর অনর্গলিত করে, সেদিন বুঝে ছিলাম। মানুষটার মধ্যে রসবোধও ছিল। শুধু যে মাঝে মাঝে হাফিজের বা রুমীর রচনা অনুবাদ শোনানোতে তা ধরা পড়তো তা নয়। একদিন স্টাফরুম সংলগ্ন ইউরিনালে আমি অন্যমনস্ক ভাবে ঢুকে পড়েছিলাম পর্দা সরিয়ে। খেয়াল করিনি কেউ সেখানে আছেন। ছিলেন স্বয়ং প্রভাসচন্দ্র। লজ্জিত বিব্রত হয়ে চ'লে আসছি তাড়াতাড়ি, প্রভাসচন্দ্র বললেন, 'জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল'।

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠি।

অনেকক্ষণ নিরিখ করেও সেই প্রভাসচন্দ্রকে ফিরে পেলাম না এতদিন পরে। হাফিজের ওপর লেখা তাঁর ডি. লিট থিসিস দু ভল্যুমে বার করেছেন। ইংরাজিতে লেখা। একশো পঞ্চাশটাকা দাম। বললাম, 'কলেজ লাইব্রেরির জন্যে নিশ্চয়ই কিনবো, কিন্তু ট্রিপ্লিকেট রসিদ চাই যে?'

অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, 'রসিদ বই ছাপিয়ে ফেলেছি। এই দেখুন। এখন কি আর সেরকম হাঁদাগঙ্গারাম আছি ভাবছেন? এখন পাক্কা সেলসম্যান। বলুন কত পারসেণ্ট কমিশন লিখবো। কবে পেমেণ্ট দেবেন?' একটু থেমে হেসে বললেন, 'কি পারছি তো? যেতে হবে বহু কলেজে। ঠিক সেলসম্যানের মতো হচ্ছে তো কথাবার্তা?'

আমার ভেতরটা হাহাকার ক'রে যেন মুচড়ে উঠলো। এ কেমন শিক্ষাব্যবস্থা আর এ কোন্ করুণ শিক্ষাজগৎ আমাদের? পণ্ডিতকে তা ক'রে দেয় বিক্রেতা? শিক্ষক বা লেখক ব'লে যেটুকু গবগৌরব আমার ছিলো সেদিন তা মুছে গেল। মনে হলো কলম আছে আমার, আছে কণ্ঠস্বর, কিন্তু আমি আসলে এক নির্বাক অসহায় দ্রষ্টা।

*   *   *   *

জগদ্দল ঘাট থেকে একটা লঞ্চ ছাড়লো চন্দনগরের রানীঘাটের উদ্দেশে। ভট ভট ভটর। কেরোসিন-ডিজেলের ধোঁয়ায় চোখ জ্ব'লে উঠতে অন্যদিকে তাকাই। সেদিকে একডাঁই বাচ্চাদের নামলেখা স্যুটকেস। খুদে পড়ুয়ারা এপার থেকে

বাবা, মা কিংবা পরিচারক-পরিচারিকার সঙ্গে লঞ্চে চেপে চলেছে চন্দননগরের নাম-করা কনভেণ্টে। তারা আপাতত লঞ্চের জানলা দিয়ে উচ্ছ্বিত জলের উল্লাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছে। গানটা অবশ্য ইংরাজি। তাদের ব্যাগ অভিভাবকদের কাছে। স্যুটকেশ লঞ্চের মাঝখানে জড়ো করা। একটা দামী স্যুটকেশের গায়ে ইংরাজি অক্ষরে লেখা আছে প্রিয়দর্শী দাশগুপ্ত। সত্যি আজকালকার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কি সুন্দর সব নাম! কি সুন্দর সব পোষাক আর বই! কি চমৎকার সব সুষম খাদ্য তারা খেতে পায়!

মনে পড়ে যায় কুমড়োর ঘ্যাঁট আর রুটি খাওয়া আমাদের কৈশোর। মনে পড়ে নেকারবোকার কিংবা ফিতে বাঁধা প্যাণ্টের কথা আর একটা সস্তা টুইলের সার্ট। অবশ্য সেসবই ছিল প্রাণপ্রিয়। যত্নে পাট ক'রে তোষকের তলায় রেখে স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রির দেশজ ব্যবস্থার কথা ভেবে ভালও লাগে। যাহোক আপাতত ভালো লাগছিল চুলবুলে কচিকাঁচাগুলোর দারুণ হুটোপাটি। উপভোগ করছিলাম প্রিয়দর্শী নামটি। খেয়াল ছিল লঞ্চ থেকে নামার সময় দেখবো প্রিয়দর্শী সত্যিই কতটা প্রিয়দর্শন।

লঞ্চ থামলো রাণীঘাটে। প্রথমে খুব হুড়োহুড়ি। একটু থিতোলে একে একে এক একটা হাত তুলে নিচ্ছে এক একটা স্যুটকেশ। প্রিয়দর্শীর নাম লেখা স্যুটকেসের ওপর আমার গোয়েন্দা চোখ। হ্যাঁ, এবারে হাত পড়েছে। সোনার রুলি সরু শাঁখা পরা একটা মাখনবরণ হাত। হাত বেয়ে চোখের দৃষ্টি উঠে যায় মুখে। চেনা চেনা যেন। আরে অনিন্দিতা না? একটু গায়ে গতরে, একটু সচ্ছল জীবনের মোলায়েম প্রশান্তি সারা মুখে, তবে একইরকমের সুন্দরী রয়ে গেছে! আশ্চর্য যে অনিন্দিতাও সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হঠাৎ দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। অনিন্দিতাই মুখর হলো, 'উফ্, কতদিন পরে দেখা। পনেরো বছর হবে?'

: হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। সেই তো এম. এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেল তোমার। আমরা সব গোমড়া মুখে ভোজ খেলাম।

কুল কুল ক'রে হেসে ওঠে অনিন্দিতা। বলে, 'আগের মতই ফাজিল আছো দেখছি।'

ইতিমধ্যে প্রিয়দর্শী নামের সত্যিই প্রিয়দর্শন কিশোরটি মাকে টানতে লাগলো। তার বন্ধুরা নেমে গেছে। আমরাও জনস্রোতের সঙ্গে নেমে কনভেণ্টমুখো স্ট্র্যাণ্ডের পথ ধরি। অনিন্দিতা মুখ নামিয়ে চাপাস্বরে ছেলেকে বলে, 'গ্রীট হিম'।

ছেলেটা তোতাপাখির মত আমাকে বলে, 'গুড মর্নিং আঙ্কল। হাডুডু'। আমি সহবৎ মেনে বললাম, 'মর্নিং, হাউ ডু ইয়ু ডু'। এখানেই নিয়মানুযায়ী



থামতে হয়। এবারে পরিহাস ক'রে প্রাক্তন সহপাঠিনীকে বলি, 'ইংরিজিতে আঙ্কল মানে অনেকরকম হয়। প্রিয়দর্শীর আমি কে? কাকা না মামা?'

: মামা হওয়াই সবদিক থেকে সেফ।

: তথাস্তু। তা বোন, আমাদের সেই রোমিও ভগিনীপতি এখন কোথায় কর্মরত?

: রোমিও কেন ?

: বাঃ ভুলে গেছো ? বলতে না তখন তুমি যে, সামনের বাড়ির এক ন্যাকা ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা তোমার শোবার ঘরের ব্যালকনির তলায় দাঁড়িয়ে গুনগুন করে ?

: উফ্, হিলারিয়াস। এখনও মনে আছে ?

: মনে থাকবে না ? সব সহপাঠীর বুকে হাফসোল মেরে তুমি তো সেই ন্যাকা ইঞ্জিনিয়ারকেই গাঁথলে। সেই রোমিও এখন কোথায় ?

: রোমিওর এখন মাথাভরা টাক, মধ্যপ্রদেশ স্ফীত। তিনি এখন শ্যামনগরের এক জুটমিলের কেষ্টবিষ্টু। আসবে একদিন, বলোনা, প্লিজ।

: না। এ বয়সে নতুন ক'রে ভাইফোঁটা নিলে কপাল চড়চড় করবে। যাকগে কথা হচ্ছে, সেই শ্যামনগর থেকে গুঁতিয়ে জগদ্দল ঘাট। ঘাট পেরিয়ে চন্দননগর। তারপরে কনভেণ্ট। তারপর ?

: তারপর গঙ্গার স্ট্র্যাণ্ডের ছায়াছন্ন বৃক্ষতলে উপবেশন ক'রে অন্যান্য জননীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ পি. এন. পি. সি। বুঝলে ?

: না। কনভেণ্টের ইংরিজি জানিনা তো!

: পি. এন. পি. সি আসলে বিশুদ্ধ বাংলা। মানে পরনিন্দা পরচর্চা! তাতে কেটে যাবে সময়। তারপরে ছেলেকে টিফিন খাইয়ে বাড়ি, মানে কোয়ার্টার। কর্তার সঙ্গে লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি। একক দিবানিদ্রা অর্থাৎ বিউটি স্লিপ। চটকলের আর্দালী বিকেলে এসে ছেলেকে নিয়ে যায়।

স্কুল-গেটে ঢোকবার মুখে প্রিয়দর্শী হাত নেড়ে বললো, 'বাই বাই আঙ্কল, সি ইউ'। অনিন্দিতা হেঁকে বললে, 'ওয়াটার বট্‌লে স্কোয়াশ আছে, খেয়ে নিস্'। ছেলে বললো, 'খাবো। কিন্তু টিফিনে আলুকাবলি-তেঁতুলজল খাওয়াবে তো ? ঠিক ?' সে স্কুলে ঢুকে গেল।

আমি বললাম, 'আলুকাবলি তেঁতুলজল ? আঃ, সেতো আমরা খেতাম। কনভেণ্টের ছেলেমেয়েরা ও সব খায় ?'

অনিন্দিতা বললো, 'আর বোলো না। ছেলেটা একেবারে জংলি ভুত হয়েছে। কিছুতে ভালো জিনিস খাবে না। চীজে অরুচি, আপেল সেদ্ধ 'ম্যাগো', মাংসের স্টু দিলে বমি করবে। কিন্তু লঞ্চঘাটে ঐ যে নোংরা খোট্টাগুলো আলুকাবলি তেঁতুল-গোলা দিয়ে বেচে সেটা খাবে চেটে পুঁচে। তবু মাঝে মাঝে ঐ সব ঘুষ দিয়ে ভালো জিনিসটা খাওয়াই। এমন হোপলেস লাগে তখন কি বোলবো।'

আমি বললাম ; আসলে ওর অভাবেরই অভাব।

: তার মানে ?

: তার মানে ঐ যে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকে রাণীমা রাজবাড়িতে প্রাণ-হাঁপিয়ে ওঠা রাজপুত্রকে বলেছিলেন, 'বুঝেছি বাছা আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে'—এও তাই। তুমি কি প্রিয়দর্শীর জন্যে কোনো অভাব রেখেছো ?

অনিন্দিতা করুণভাবে চেয়ে থাকে। অসহায়। আমি বলি. 'আমাদের ছোটবেলায় সব কিছুর অভাব ছিল। ভালো পোষাকের অভাব, সুষম খাদ্যের অভাব, ভালো বইয়ের অভাব। সেইজন্যে ঐ সবের কবে একটু স্বাদস্পর্শ পাবো ব'লে আমরা লোলুপ হয়ে থাকতাম। জানো, আমার একটা হারমনিয়াম ছিল না তবু খালি গলায় মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গাইতাম। পরের বাড়ি গিয়ে রেডিও শুনতাম। কেউ নেমন্তন্ন করলে হাপুসহুপুস ক'রে খেতাম পেট না-ফাটা পর্যন্ত। ভাবতে পারো, জীবনে প্রথম ফাউন্টেন পেন পেলাম পৈতেয় উপহার ! বই পড়ার নেশা ছিল তাই পাড়ার লাইব্রেরিতে প'ড়ে থাকতাম। দাদাদের ছোট-হয়ে-যাওয়া পোষাক পরতাম। আর জীবনে প্রথম চাকরি ক'রে প্রথম মাসের মাইনে বাবাকে দিতে বাবা বললেন, 'একটা ঘড়ি কেনো এবার'। উঃ সে কি আনন্দ। এদিকে কলেজে পড়াচ্ছি অথচ ঘন ঘন আদেখলার মত ঘড়ি দেখছি। ভাবতে পারো ?'

গঙ্গার দিকে করুণ অসহায় মুখে অনিন্দিতা তাকিয়ে থাকে আর আমি তাকে সেই বেপথু অবস্থায় রেখে বিদায় নিই। সে তো বহু বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজও ভুলিনি। জানিনা অনিন্দিতার ছেলে জীবনে কতটা কি করতে পেরেছে। কিন্তু দিকে দিকে এমন তো কতই দেখি যে এমন পুতু পুতু ক'রে বড় হওয়া ছেলে-মেয়ে কেমন যেন একলসেঁরে হয়ে যায়। পরিকল্পিত অভিজাত শিক্ষা তাদের আত্মকেন্দ্রিক ক'রে তোলে। দেশ আর দশের লড়াইয়ে তাদের তেমন অংশ থাকে না। এ প্রসঙ্গে আমার ভাগনে কৌশিকের কথা মনে পড়ে। তার যখন মাধ্যমিক দেবার বয়স তখন পৈতে হ'লো। পৈতে উপলক্ষে সে এতরকম উপহার পেলো যে তা দেখে চমকে গেলাম। গল্পের বই, কুইজ পাজ্‌ল্‌, ওয়াকম্যান, স্যাটলেংথ, ক্যারমবোর্ড, পেন সেট. টিউব কালার সেট, ক্রিকেট ব্যাট, ক্যাসেট স্ট্যাণ্ড ক্যামেরা, স্টিকার, খেলোয়াড়দের পোস্টার, থার্মস ফ্লাস্ক, কোলোন স্প্রে, ভি আই পি ব্যাগ। সে অনেক উপহার খুব তাচ্ছিল্য ভরে নিলো এবং নির্বিকার ভাবে বললো, 'এ আমার আছে। যাকগে, কাউকে দিয়ে দেবো।' এই ভয়ানক

আত্মম্ভরিতা, শিষ্টাচারের এতটাই যে অভাব তার মূলে যে ঘোরতর অশিক্ষা তার কথা তাকে কে বলবে? সকাল হ'লেই তো সে ঘড়ি প'রে, টাই হাঁকিয়ে, বাবার গাড়িতে চ'ড়ে একটা অহংকারী বিদ্যালয়ে যাবে। আমি তাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে খুব সংকোচের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁরে, তোকে তো আমার একটা কিছু দেবার দরকার। তোর তো দেখলাম সবই আছে। কি নেই বল্‌তো? কি নিবি?'

কৌশিক খুব ক্যাজুয়ালি বললো, 'দিতেই হবে? আচ্ছা তাহ'লে মাধ্যমিকের একটা লাস্ট টাইম সাজেশানস কিনে দাও।' আমি হতভম্ব হয়ে আমার ভাগিনেয়র স্পর্ধিত অশিক্ষিত মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার দাদার প্রতিবেশী মিঃ ব্যানার্জির দিকে অবশ্য আমি এতটা বিস্মিত হয়ে চাইতে পারিনি। যোধপুর পার্কের এই অহংকারী কস্ট-অ্যাকাউটেণ্ট



ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন চায়ের টেবিলে, 'আমার সব রেজাণ্ট-ওরিয়েণ্টেড ইনভেস্টমেণ্ট বুঝলেন?'

'কি রকম?' আমি জানতে চাইলাম।

ব্যানার্জি বললেন, 'আমার ছেলে শৌভিক যখন মাধ্যমিক দেয় তখন চারজন টিউটর রেখেছিলাম। টু হানড্রেড ইনটু ফোর, দ্যাট ইজ এইট হানড্রেড পার

মান্থ্। তার মানে একবছরে ন হাজার দুশো টাকা। ব্যাস, পাশড উইথ স্টার মার্কস্। বুঝলেন ?'

: বুঝলাম। তারপরে কি করলেন ?

: তারপরে উচ্চ মাধ্যমিক আর জয়েণ্ট এনট্রান্সের জন্যে ছ'জন টিউটর রাখলাম। এবারে একটু বেটার স্টাফ, মানে কলেজ টিচার্স। পার হেড থ্রি হানড্রেড। তার মানে মাসে আঠারোশো। অর্থাৎ আঠারোশো ইনটু চব্বিশ মাস অর্থাৎ অ্যারাউণ্ড চুয়াল্লিশ হাজার টাকা।

: ফলাফল ?

: শ্রীমান এখন কানপুর আই. আই. টি-তে আছে। সেখান থেকে সোজা স্টেটস্ চলে যাবে। টাকা রেডি হয়ে যাবে ততদিনে।

কোনোভাবে ব্যানার্জির এই আত্মবিশ্বাসী স্বপ্নটা কি ভাঙতে পারে না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে ব্যানার্জির সন্তান শৌভিক ভবিষ্যতে কেমনতর মানুষ হবে। দেশপ্রেমী, বন্ধুবৎসল, সমাজচেতন, পরোপকারী, পরদুঃখকাতর, ত্যাগী, দয়ালু, দরিদ্র-বান্ধব—এর কোনো একটা বিশেষণ কি তার আচরণ বা কর্ম দেখে বসানো যাবে তার নামের আগে? যদি না যায় তবে এই রেজাল্ট-ওরিয়েণ্টেড শিক্ষা কোন্ কাজে লাগবে ?

বরং ভাবতে ভালো লাগে চাকদহের অরূপ দাসের কথা। অনুন্নত এক গ্রামের অজানা এক শিক্ষকের সন্তান অরূপ। বাবার অনামী বিদ্যালয়কেই সে বিখ্যাত করে দিয়েছে মাধ্যমিকে প্রথম হয়ে আজ থেকে ছবছর আগে! কলিকাতা নিবাসিনী একজন অরূপের সাফল্য দেখে বলেছিলেন, 'এবারে পর্ষদ্ ষড়যন্ত্র করেছে কলকাতায় কাউকে ফার্স্ট হতে দেবে না। আপনি ভাবতে পারেন কলকাতায় কত ভালো ভালো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কত টিউটর আছে? কত জ্ঞান, কত সুযোগ। তার পাশে কোথাকার কোন্ চাকদার অরূপ দাস। অসম্ভব।'

মুস্কিল, যে, পরের বছর সেই অরূপ দাসই আবার উচ্চ মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছিল। মনে আছে মাধ্যমিকে প্রথম-হয়ে অরূপ যা বলেছিল। তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, প্রথম হওয়া উপলক্ষে তার কি বলবার আছে। সে বলেছিলো, আমাদের ইস্কুল যাবার রাস্তাটা খুব খারাপ। বর্ষায় বড্ড কাদা হয়। রাস্তাটা যেন ভালো হয়। আর আমাদের ইস্কুলের কয়েকটা ঘরে বৃষ্টি হ'লে জল পড়ে। ওগুলো যেন সারানো হয়।

ব্যানার্জির সন্তান শৌভিক আর চাকদহের অরূপ, দুজনের মধ্যে কার শিক্ষা যথার্থ আর ফলপ্রদ ?

কিংবা অন্য একটা দিকও ভাবা যেতে পারে। সব সময়ে ফার্স্ট, সেকেণ্ড হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কথাই যে আমরা ভাববো বা গুরুত্ব দেবো তার কি মানে আছে ? শিক্ষা-অশিক্ষার এই দারুণ দুর্যোগের দিনে সাধারণরাও তো অসাধারণত্ব দেখাতে পারে। দেবদাস ভট্টাচার্যের কথাই ধরা যাক।

তার বাবা ছিলেন বৃত্তিতে পুরোহিত কিন্তু স্বভাবে বাউণ্ডুলে। এদিকে পাঁচ ছটি সন্তান। তাদের মা নেই। তাই সংসারে শ্রীছাঁদ নেই। দারুণ দারিদ্র্য। দেবদাস বড় ছেলে। পড়তো আমাদের কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাশে। একদিন বেলাশেষের টিউটোরিয়ালে তার শুকনো ম্লান মুখখানি দেখেই মনে হ'লো সারাদিন কিছু খায়নি। সেকথা জিগ্যেস করতেই ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো। তাকে বাড়ি এনে খাইয়ে দাইয়ে সব বিবরণ জানা গেল।

দেউলিয়া বলে একটা গ্রামে তাদের বাড়ি। সেখান থেকে বাইশ মাইল দূরে কলেজ। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় দুটো চিঁড়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে তার স্টেশনের দিকে যাত্রা সুরু। মেঠো পথে চার মাইল। তারপরে ট্রেন। ট্রেন থেকে নেমে আমাদের শহরে আটটা থেকে দশটা দু বাড়িতে টিউশনী। তারপরে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটে কলেজ ক'রে আরেকটা টিউশানী সেরে বাড়ির ট্রেন। আবার হাঁটা মেঠোপথে। তারপরে সেই বাউণ্ডুলে সংসার। দুটো ভাতের প্রত্যাশা! 'দেবদাস তুমি তাহলে পড়বে কখন ?' প্রশ্ন শুনে সে কাঁদে।

তাকে উদ্যম ক'রে শহরে আনি। একে তাকে ধ'রে থাকার ব্যবস্থা করি। জুটে যায়। বই জোগাড় করে দিই। বলি, 'বাড়ির প্রতি নির্মম হও, নইলে তুমি দাঁড়াতে পারবে না। তুমি দাঁড়ালেই ভাইবোন মানুষ হবে।' তাকে একসেট জামা পায়জামা কিনে দেবো বলে দোকানে নিয়ে গিয়ে বলি, 'দেবদাস, তুমি কেমন দামের জামা পাজামা পরো ? তার চেয়ে দামি জিনিস কিনবো না।' মনে আছে দেবদাস আমাকে সচকিত ক'রে বলেছিলো, 'স্যার, আমি কোনোদিন নতুন জামাকাপড় পরিনি: স্টেশন বাজারে পুরোনো সেলাই করা জিনিস কিনে পরি।'

আমি দেবদাসের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। বুঝতে পারি, বড় কঠিন বাজি ধরে বসেছি। তবু জিততে তো আমাকে হবেই। এবারে আর অশিক্ষার সঙ্গে নয়, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই।

সে লড়াইতে আমি আর দেবদাস জিতে যাই, তবে ব্যানার্জির মত রেজাল্ট

ওরিয়েন্টেড জিত সেটা নয়। কিন্তু মহত্তর। দেবদাস প্রি. ইউ পাশ করে একটু উচ্চাশাসম্পন্ন বিষয়ে অনার্স নেয়। ইংরাজি। নানা কারণে বিষয়টা ঠিক দেবদাসের মত গরীবের পক্ষে ভোগ্য নয়। তবু সে লড়ে। সে লড়াই কঠিনতর। কারণ এবারে সে প্রথমে যে-বাড়িতে গার্জেন-টিউটর হয়ে ঢোকে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করবার লোভে, অচিরে দেখা গেল সেখানে গৃহকর্তা সন্ধ্যে থেকে বসান জুয়ার আসর। রাত বারোটা পর্যন্ত চলে হৈ চৈ চেঁচামেচি। আর মাঝে মাঝেই গৃহকর্তা হাঁক পাড়েন, 'মাস্টার, যাও কেটলি নিয়ে দোকান থেকে চার কাপ চা নিয়ে এসো।' তাহলে দেবদাস দিনান্তে সুস্থির হয়ে দু দণ্ড পড়বে কখন?

তাকে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করেন প্রীতি দিদিমনি নামে এক শিক্ষিকা। তাঁর কন্যাকে দেবদাস পড়াতো। এবারে একটু যেন স্বস্তি এলো। কিন্তু সে আর কদিন? প্রীতি দিদিমনির বেকার স্বামী ছিলেন উগ্রচণ্ড রাগী আর মাতাল। সেটা দেবদাস প্রথমে ধরতে পারেনি কারণ তিনি মদ্যপান করতেন বাড়ির বাইরে। বাড়িতে নেশায় বুঁদ হয়ে গম্ভীর থাকতেন। একদিন ভদ্রলোক খুব গম্ভীর ভাবে দেবদাসকে সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, 'দেবু, আমার এক বন্ধুর কাপড়ের ব্যবসা। বিশ টাকা জোড়ায় সামান্য খুঁতি একজোড়া কাপড় পাওয়া যাচ্ছে, কিনবে? তাহলে টাকা দাও।' টাকাটা নিয়ে তো ভদ্রলোক বিকেলে রওনা দিলেন, ফিরলেন রাতে। কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ব'সে রইলেন বুঁদ হয়ে। দেবদাস অনেকক্ষণ পরে সাহসে ভর করে গিয়ে বললো, 'মেসোমশাই, কাপড় এনেছেন?' নেশাড়ে মানুষটা রক্তচক্ষু মেলে বললেন, 'কাপড় কিসের?' দেবদাস বললে, 'ঐ যে বিকেলে টাকা নিলেন আমার কাছে, কিনবেন বলে?'

'চোপ' গর্জে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপরেই সপাটে এক চড়, 'গেট আউট ফ্রম মাই হাউস'। দেবদাস এতখানি বয়সে কখনও মার খায়নি। সে হতভম্ব হয়ে গেল।

ছুটে আসেন প্রীতি দিদিমনি রান্নাঘর থেকে। তিনি কিছুই জানতেন না। সব শুনে তিনি স্বামীকে বললেন, 'ছি. ছি, তুমি এতদূর নীচ হয়ে গেছ যে দেবুর মত গরীব ছেলের অত কষ্টের জমানো পয়সায় মদ খেয়ে এসেছো? ছেলেটাকে এত ধোঁকা দিলে? ছিঃ।'

'চোপ' বলে আবার গর্জে উঠে এবারে তিনি প্রচণ্ড কিল চড় লাথি চালাতে লাগলেন প্রীতি দিদিমনির ওপর। তারপর সারারাত কীভাবে যে দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে।

ভোর হ'তেই দেবদাস সটান আমার বাড়ি। সব শুনে গম্ভীর হয়ে যাই। তারপরে একটা জলদি সিদ্ধান্ত নিই। দেবদাসের পড়া শেষ হ'তে তখনও দু'বছর কিন্তু তাকে রাখার ব্যবস্থা করি এক বোর্ডিঙে। কিছু আর্থিক দায় এসে যায়। তা আসুক।

শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু সসম্মানে বি. এ পাশ করে। অর্থাৎ ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে। নম্বরটা হয়ত ঠিক আমাদের দুজনের প্রত্যাশামত হয় না। তবু এ সাফল্যের দাম অনেক। বুদ্ধিমান বুঝমান দেবু এম. এ পড়ার অমোঘ আকর্ষণ ত্যাগ ক'রে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি নেয়। বছর দশেকের মধ্যে সংসারের মধ্যে ছন্দ আনে। ভাইদের পড়ায়, বোনদের বিয়ে দেয়। বাবা অবশ্য বাঁচেন না। এরপর বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের শহরের একটা নামী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে দরখাস্ত ক'রে ইণ্টারভিউ দিয়ে সে সফল হয়। তার জীবন গঠন করেছে যে-শহর তার প্রতি একটা টান ছিল তার। সেখানেই সে স্থিতু হ'লো।

তারপর তো পনেরো বছর গত হয়েছে। দেবদাসের সঙ্গে যে রোজই দেখা হয় তা নয়। তবে প্রায়ই দেখি একটা মোপেড চড়ে দেবদাস চলেছে। পেছনে স্ত্রী, সামনে কন্যা। ভেতর ভেতর দেবুর মনে একটু সৌখীনতার স্বপ্ন ছিল বুঝতে পারি যখন দেখি সে সিল্কের সার্ট পরতে ভালবাসে। সৎ পরিশ্রমী ছাত্রদরদী শিক্ষক বলে শহরে দেবদাসের খুব নাম হয়েছে। টিউশনীর কাজটাও সে ছাড়েনি। কেননা একটা বোনের বিয়ে বাকি আছে আর তাছাড়া···

একদিন দেবদাস সসম্ভ্রমে সলজ্জে তার নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেল। দেবদাসের নিজের বাড়ি? আমার ভেতরটা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। তিল তিল ক'রে জমানো কত কষ্টের টাকা আর কো-অপারেটিভের ঋণ দিয়ে তৈরি দেবদাসের নিজের বাড়ি। নিজের মত ক'রে সাজিয়েছে, সঙ্গে একটু বাগান। লক্ষ্মীমন্ত এক নম্র নীরব স্ত্রী আর ফুটফুটে একটা মেয়ে। আমার মনটা আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় নম্র হয়ে আসে তাদের প্রণাম নিতে। দেবদাস আমাকে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবির কাপড় দিয়ে প্রণাম করে। যে কোনোদিন নতুন-কেনা পরিধেয় পরতে পায়নি এককালে, আজ সে বস্ত্রদানে সমর্থ হয়েছে। আমি ভালবেসে তা বুকে চেপে ধরি।

তাই ব'লে খুব একটা যোগাযোগ রাখি না দেবদাসের সঙ্গে। দেখি দূর থেকে তাকে, শুনি তার যশ আর পড়ানোর খ্যাতি। ভাবি, বেড়ে উঠুক সেই লতাগুল্ম নিজেরই শেকড়ের জোরে। গ'ড়ে নিক নিজেরই আকাশ আর মাটি। মনে পড়ে,

একদিন শুষ্কপ্রায় রৌদ্রক্লঢ় এক লতায় আমি ধরেছিলাম সামান্য একটু ছায়াছত্র। সেচন করেছিলাম একটু স্নেহসলিল।

শিক্ষকের স্নেহঋণ সে শিক্ষক হয়েই শোধ করেছে। শৌভিক ব্যানার্জি তার পিতার দর্পিত অর্থে শুধু শিক্ষকের অর্জিত বিদ্যা কিনেছে। এ বিশ্বে কারুর কাছে তার ঋণ নেই। সে তাই নিঃস্ব।

*   *   *   *

শিক্ষা আর অশিক্ষার প্রভাব যে কোনো কারুর জীবনের সামনে মেলা আছে, কে তার থেকে কতটুকু নিতে পারে বলা কঠিন। আমাদের এক সহপাঠী বরাবর স্কুল জীবনে পরীক্ষায় প্রথম চারজনের মধ্যে থাকতো। উচ্চ শিক্ষার জন্যে কলকাতার এক কলেজে ভর্তি হয়ে স্থান পেলো হস্টেলে। সেখানে এক বখাটে রুমমেটের প্রভাবে একেবারে তলিয়ে গেল জীবনে। এর উল্টোটাও দেখেছি। আমাদের শহরের দেবাংশু সান্যাল নামকরা লোক, অভিজাত সজ্জন। তাঁর বড় মেয়ে মণিদীপা ছিল আমার অনার্সের ছাত্রী। সেই সুবাদে আমার ছিল সান্যাল বাড়ি যাতায়াত। সান্যাল মশাইয়ের তিন কন্যা। তারমধ্যে মেজ আর ছোটদুটি পিঠোপিঠি। সুন্দর ফুটফুটে খরগোসের মত। আমি যখন তাদের দেখি তখন তাদের একজন পড়তো ফাইভে, একজন ফোরে। নামদুটোও তাদের চমৎকার অহনা আর লহনা।

কালে কালে তাদের দুষ্টুমির নানা গুণপনা প্রকাশ পেলো। তবে খুবই বিনীত, বাধ্য, মঞ্জুভাষিণী। কেবল লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী নয়। তাদের বিপত্নীক জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে থাকতেন পণ্ডিচেরী। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রতী। একবার গরমের সময়ে বেড়াতে এসে ভাইকে যুক্তি দিলেন মেয়েদুটিকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে দেবার। অনেক ভাবনা চিন্তা করে তা-ই ঠিক হলো। তখন শ্রীমা জীবিতা, তাঁর অনুমতি মিললো। একদিন কান্নাকাটি ক'রে অহনা আর লহনা চলে গেল পণ্ডিচেরী।

দুজনের মধ্যে অহনা ছিল খুবই নরম ধরনের আর লাজুক। বাইরের লোকের সামনে কথাই বলতে পারতো না। তার ওপরে খাওয়া শোওয়া সব বিষয়ে পিটপিটে। খেলাধুলায় একেবারে আগ্রহ ছিল না। ঘরে ব'সে এমব্রয়ডারি করতে ভালবাসতো। তাকে নিয়েই তাই চিন্তা হলো বেশি। কারণ পণ্ডিচেরীর শিক্ষা-জীবন খুবই কঠোর। শারীর-শিক্ষার খুবই কড়াকড়ি। সবাইকেই সেখানে জিমনাষ্টিকস্, সাঁতার, ডাইভিং এবং দৌড়ে পটু হতে হয়।

বছর খানেকের মধ্যে তাদের বাবা-মা বার চারেক ঘুরে এলেন পণ্ডিচেরী। জানা গেল অমন তুলতুলে খরগোসের মত দুই বোন নাকি রোগা আর কালো হয়ে গেছে। তার মা বললেন, 'অবশ্য খুবই গরম জায়গা ব'লে বোধহয় অতটা কালো হয়ে গেছে। তবে ধকলও খুব। যা খাটায় আর লাফঝাঁপ করায়। তাই বলে ভাববেন না যে ওদের মন খারাপ। খাসা আছে। ফ্রেঞ্চ আর তামিল ভাষা খানিকটা শিখে ফেলেছে। বন্ধুবান্ধব জুটে গেছে। টিচাররা বললেন বিশেষ ক'রে অহনার ফ্রেঞ্চ শেখবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।'

সব শুনে বেশ ভালই লাগলো। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশের গুণে প্রবণতা এইভাবেই বোধ হয় ধরা পড়ে। জানতে চাইলাম, 'কবে ফিরবে তারা?'

: দু বছরের আগে একবারও আসবে না। তারপর মাঝে মাঝে। কিন্তু চিন্তা সেজন্যে নয়। চিন্তা এই, যে পণ্ডিচেরীতে যে শিক্ষাব্যবস্থা তাতে কোনো ডিগ্রি ডিপ্লোমা নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই খুব ভাবিত আমরা। সাধারণত ওখানকার শিক্ষাশেষে ওখানেই থেকে যায় সবাই। আশ্রম তো। অনেকে বিয়ে করে না। তাছাড়া ওখানকার পরিবেশ থেকে এসে এখানে খাপ খাওয়াতেও পারে না। কি যে হবে মাস্টারমশাই।

দু'বছর পরে অহনা-লহনা বাড়ি আসতে আমার ডাক পড়লো। আশ্চর্য পরিবর্তন সত্যি, বিশেষত অহনার। স্মার্ট, শক্তসমর্থ, পেটানো স্বাস্থ্য, তারুণ্যের সরল দীপ্তি, চোখেমুখে বুদ্ধির স্পষ্ট ছাপ। তাদের দিদি মণিদীপা একটা বাড়তি খবর দিয়ে বলে, 'জানেন মাস্টারমশাই, দুজনে যখন ঝগড়া করে সে একটা শোনবার মত জিনিস। তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝবেন না।'

: কেন?

: ফরফর করে ফ্রেঞ্চ বলে। অহনা তো ফ্রেঞ্চে মাদারের সঙ্গে কথা বলে।

শুনে ভারি ভালো লাগলো, অবাকও হলাম। আমাদের শহরের একজন লাজুক সংকোচে জড়োসড়ো কোমল মেয়ে খোদ ফরাসী ভাষায় শ্রীমার সঙ্গে কথা বলছে ভাবা যায়? যথার্থ শিক্ষার কি ব্যাপক সম্ভাবনা। শিক্ষাপরিবেশ কতটাই পালটে দিতে পারে জীবনকে।

এরপরে অন্তত দশবছর অহনা-লহনার কথা জানতে পারিনি। চাকরিসূত্রে হয়ে গিয়েছিলাম প্রবাসী। কেবল মণিদীপার বিয়ের কার্ড একটা পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, অহনা-লহনার কথা কিছুটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অবশেষে একদিন ফিরলাম শহরে। কিছুটা নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সেদিন ঘুরে ঘুরে

দেখছিলাম পুরোনো আমার সেই শহরের প্রিয় সব অঞ্চল। ঘুরতে ঘুরতে শহর-প্রান্তে পৌঁছে গেছি কখন খেয়াল নেই। হঠাৎ চোখে পড়লো লতাপাদপ ঘেরা সান্যাল বাড়ি। আলো জলছিল। ঢুকে পড়লাম। বোঝা গেল পরিবারটির ওপর দিয়ে ভাগ্য বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেছে। শ্রীমতী সান্যালের স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। তবু আন্তরিক সৌজন্যে অভ্যর্থনা করলেন।

দশ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান মানুষকে খানিকটা নীরব করে রাখে অন্তত কিছুক্ষণ।

মণিদীপার কুশল বার্তা নিয়ে জানতে ইচ্ছে করলো অহনাদের খবর। লহনা এখনও পণ্ডিচেরীতেই রয়ে গেছে, তবে অহনা ফিরে এসেছে গতবছর। পরিবারটির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে গেছে গতবছর। সেই খবর পেয়েই অহনা ফিরে আসে। শ্রীমতী সান্যাল বলেন, 'কি বোল্ড আর ফার্ম যদি দেখতেন। কি ইনার স্ট্রেঙ্গথ অব মাইণ্ড! ছেলে থাকলেও এমন পারতো না। সব কিছু একা সামলালো। তারপরে সোজা কলকাতায় আলিয়াস ফ্রঁাস-য়ে দেখা করলো, ডেপুটি হাইকমিশনার অব ফ্রান্সের সঙ্গে কথা বললো। কাজ জোগাড় করে নিলো।'

'তাই নাকি বাঃ?' আমি তারিফ করে বলি 'কি কাজ? কোথায়?'

: মধ্যপ্রদেশে একটা কোলাবরেটিভ প্রোজেক্ট হচ্ছে ভারত আর ফ্রান্সের মধ্যে। সেখানে ফ্রেঞ্চ একস্‌পার্টরা এসেছিল। তাদের ইণ্টারপ্রেটারের কাজ। কী ভাগ্য বলুন?

ভাবতে ভালো লাগে। ভাগ্য ঠিকই, কিন্তু অনেকটাই চারিত্রিক দৃঢ়তা আর আত্মশক্তি যা অহনা অর্জন করেছে একটা পরিকল্পিত শিক্ষার পরিবেশ থেকে। শিক্ষা এতটাই পারে। একজনকে একেবারে সমূলে তুলে ধরে। ভাষাশিক্ষাও যে এতটা কাজে লাগে এমনভাবে আগে ভাবিনি।

শ্রীমতী সান্যাল একটা অ্যালবাম্ বার ক'রে বললেন, 'তিনমাস হলো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।'

: তাই নাকি? এটা তো আরও ভালো খবর। কোথায় হ'লো?

: ঐ ফ্রেঞ্চ এক্সপার্টদের একজনের সঙ্গে। জামাইয়ের ফটো দেখুন। নাম হলো ভেগা। খুব ভালো ছেলে।

সমুদ্রনীল চোখ মেলে অ্যালবাম থেকে ভেগা আমার দিকে চেয়ে থাকে। বিশ্বাস হয় না। খুসি খুসি চোখে চাই গর্বিতা জননীর দিকে। তাঁর গর্ব মেয়ে না জামাই কার জন্যে?

বললেন. 'জানেন মাস্টারমশাই, আমার মেয়ের জন্যে ভেগা একটা নতুন গাড়ি কিনেছে আর বাড়ির নাম রেখেছে 'অহনা'। এই দেখুন বাড়িটার ফটো।'

আনন্দে আবেগে আমার চোখ রুদ্ধ হয়ে আসে। আমার সামনে একটি ফরাসী-শৈলীর বাড়ি ভেসে ওঠে। তার সামনে হাস্যময়ী বিদেশিনীর মত মেয়েটি আমার কতই চেনা তবু কত অচেনা।

অহনার কথা মনে এলেই এখন আমার শিক্ষা-অশিক্ষার পরিবেশগত স্নবিধে-অস্নবিধের কথা ভাবনায় আসে। নিছক পরিবেশগত এরকম শিক্ষাধারা থাকতে পারে যা স্বতই গ'ড়ে তুলতে পারে শিক্ষার্থীকে। অহনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পণ্ডিচেরীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা-পরিবেশ তাকে শুধু যে একটা ভিনদেশী ভাষায় দক্ষ করেছে তাই নয়, এনেছে চরিত্রের দৃঢ়তা, সহজ স্বচ্ছন্দ অন্তঃশক্তি। তার ভেতরটাকে বিকশিত ক'রে তুলেছে।

অথচ এই পরিবেশগত অক্ষমতার জন্যে কম শিক্ষার্থীকেই তেমন ক'রে গ'ড়ে ওঠা হ'লো না। খুব মনে পড়ে সেই সব গ্রাম্য স্কুল বা উদ্বাস্তু কলোনীর স্কুলগুলোর কথা। একজন দুজন হয়তো ছটকে বেরিয়ে আসে, বাকি সব গড্ডলিকা স্রোতে প'ড়ে ম্লান বিবর্ণ অর্ধশিক্ষিত একটা সাধারণ ছাঁচে পরিণত হয়। এছাড়া এমন শহুরে পরিবেশগত প্রতিবন্ধ আছে যা শিক্ষাবিরোধী। সেখানে দরকার শিক্ষার্থীর মধ্যে মোটিভেশন আনা। ভালো স্কুলে সন্তানকে ভর্তি ক'রে তার জীবন গঠনের জন্য অভিভাবককে নিরন্তর লেগে থাকতে হয়। এমন এক লড়াই দেখি দীপন সেনের জীবনে।

দীপন আমার এক সম্পর্কিত ভাগনীর ছেলে। জন্মের সাতদিনের মধ্যে ভাগনী কমলার অনুরোধে আমি দীপনের নামকরণ করি। দীপন মানে উদ্দীপন আবার আলো-জ্বালা। নামটা যাকে বলে ইনস্পায়ারিং। এটা তো স্বাভাবিক যে যার নামকরণ করেছি তার জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে একটা বাড়তি উৎসাহ থাকবে। তাই মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি যাই। দীপনদের পৈতৃক সাবেক বাড়ি কুমোরটুলী অঞ্চলে একটু ঘিঞ্জির মধ্যে। গায়ে গায়ে বাড়ি। কিছুটা অস্বাস্থ্যকর। পাশেই বস্তি। খুব ছোটবেলা থেকে দীপনের ঐ বস্তির দিকে উৎসাহ কেননা এখানে তার কিছু বন্ধু আছে যারা তার খেলাধুলোর সঙ্গী। কমলা আর তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ঐ সঙ্গ নিয়ে। উল্টোপাল্টা কথা বলে দীপন, একটু জেদী একরোখা। লেখাপড়ায় কিছুটা খেয়ালী। হঠাৎ হঠাৎ হাত চালায়, কাউকে না পেলে বাড়ির কাজের মেয়েটার ওপর। কমলাকে এটা বোঝানো যায় না এক-

মাত্র সন্তানদের এ রকম হয়। তারা নিঃসঙ্গ বোধ করে। ভাই বা বোন থাকলে সে অনেক শান্ত স্বভাবের হতো।

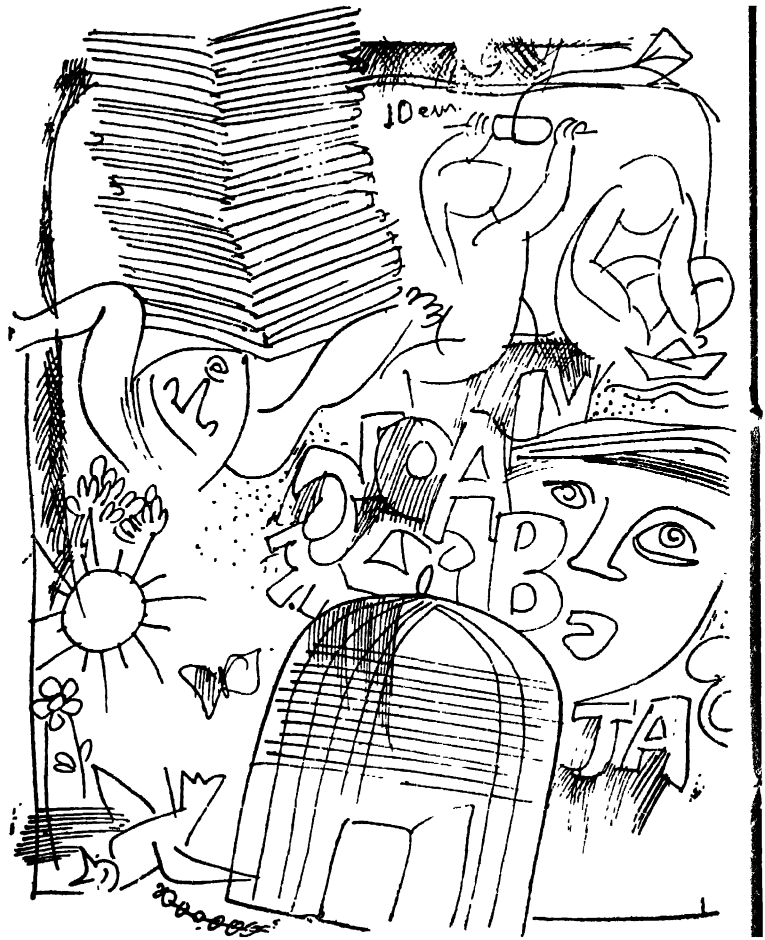
দীপন যখন ক্লাশ ফাইভে উঠলো তখন কমলারা তার সম্পর্কে মতামত নিলো এক সাইকো-অ্যানালিস্টের। তিনি বললেন, দীপনকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নানারকম কাজের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হবে। মোটিভেট করতে হবে। লেখা-পড়াতে তাহ'লে আরো ভালো করবে। সব শুনে আমি বললাম, 'তার মানে যার নাম দীপন, তার স্বভাবে আনতে হবে উদ্দীপনা।'

সুরু হলো সেই লড়াই। প্রথমে কুমোরটুলির মাঠে ভোর বেলা ক্রিকেট কোচিং নেওয়া। বিকালে হেদোর জলে সাঁতার আর ডাইভিং। খাটনিটা কমলারই তরফে বাড়লো। তা হোক, সে হাসিমুখে তা মেনে নিলো সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে। ক্রমে ক্রমে বছর চার পাঁচেক শ্রমে আর ধৈর্যে দীপন এখন প্রতিযোগিতামুখী কলকাতার জীবনে সামিল হয়েছে। হিন্দু স্কুল থেকে সে মাধ্যমিক দেবে। গলাটায় বয়সে ধরেছে। একটু গোঁফের রেখা। এখন আর হেদো-কুমোরটুলীর সাঁতার বা খেলায় নিয়ে যেতে হয়না তাকে। বসে-আঁকো বা কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য কমলাকে আঁকুপাঁকু করতে হয় না। রাতে বুক অব নলেজ চর্চা করতে হয় না। এখন তাদের বাড়ি গেলে দেখা যাবে পড়ার টেবিলে দীপন পড়ছে একমনে। অথবা অঙ্ক কষতে কষতে কানে ওয়াকম্যানে ক্যাসেট শুনছে জ্যাকসনের। তার পড়ার টেবিলের সামনের দেওয়াল ক্রিকেটারদের ষ্টিকারে ঘন সমাচ্ছন্ন। মাধ্যমিকে সে কটা লেটার পাবে তা নিয়ে কমলা এখন ভাবে।

অথচ এসব কোনো ভাবনাই তেমন ক'রে ভাবতে হয়নি আমার শ্যালিকা বিজলীকে। কেননা তার বিয়ে হয়েছে শান্তিনিকেতনে। তার অধ্যাপক স্বামী স্বভাব উদাসীন, শান্ত এবং আত্মমগ্ন। কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী, জীবিকা কলকাতা-তেও ভালোই ছিলো; কিন্তু শান্তিনিকেতনের জীবন এই সত্তর আশির ছিন্ন পরিবেশেও ভালো লেগে গেল। আসলে আশ্রমিক জীবন সেখানে নেই-নেই করেও অনেকটা এখনও আছে। যারা নিতে পারে তাদের জন্য খোলা আছে সত্র। ঠিকই যে শান্তিনিকেতনে এখন অনেক অশান্তি কিন্তু তার বাইরে আছে একটা শান্ত জগতের অলক্ষ ছন্দ। কথা হ'লো রবীন্দ্রনাথেরই কথায়, 'পারবি কি তুই যোগ দিতে সেই ছন্দেরে?' বিজলীরা পেরেছিল।

তাদের সংসারে যখন একটি পুত্রসন্তান জন্মালো তখন তার নাম রাখা হ'লো উৎস। তখনও জানা ছিল না যে সেখানকার জীবন যাপনের সহজ উৎসে কতখানি

প্রাণরস ছিল। ক্রমে আনন্দ পাঠশালার শিশুদিনগুলো যাপন ক'রে সে পাঠভবনে এলো। অজস্র আনন্দময় উৎসমুখের উৎসারিত আলো এবারে তার জীবনকে ঘিরে ধরলো। কেউ তাকে তেমন করে পাঠ দেয়নি তবু উৎস দিব্যি গান গায়। বাসন্তী



রঙের পাঞ্জাবী আর সাদা পাজামা পরে শিশু শালতরুর মতো একহারা চেহারার উৎস ভোরে উঠে বৈতানিকের দলে গান গায়, 'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'। দেখতে দেখতে তার গানের গলা খুলে গেল। বললে দুদশখানা গান পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই সে গেয়ে দিতে পারে। মাস্টারমশাইয়ের

সঙ্গে সুরুল কিংবা খোয়াইয়ের পথে চলে যায়। পাঠভবনের সাহিত্য পাঠের আসরে সহজ গদ্যে মনের কথা লিখে পড়ে। উৎস যেন আনন্দ আর সৃজনের উৎস হয়ে ওঠে। বাবা মা-র গর্ব গৌরবের সন্তান। অথচ বাবা মা তাকে তেমন ক'রে মোটিভেট করেন না। দেখাই যাক না কী হয়। উৎস রংতুলি নিয়ে মাঠে মাঠে বসে যায়। এটা ওটা নিয়ে মূর্তি গড়ে। লেখাপড়াতেও তার মনোযোগ সমান।

দেখতে দেখতে পাঠভবনের নবম শ্রেণীতে উঠে যায় উৎস সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। বসন্তোৎসবে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা গৌরপ্রাঙ্গণে সকলের সামনে 'তাসের দেশ' অভিনয় করলো। উৎস তাতে রাজপুত্রের ভূমিকায় চমৎকার নেচেছিল। খবরটা শুনে মনে হ'লো রবীন্দ্রনাথ এমনটাই তো চেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। ভেবেছিলেন প্রকৃতির বুকে যেমন সহজে ফুটে বেরোয় প্রাণের তাপ তার বর্ণগন্ধ নিয়ে, তেমনই শান্তিনিকেতনের আশ্রমের পরিবেশে ফুটে উঠবে শিক্ষার্থীর নানা সৃজনের প্রাণবেগ। উৎস'র বাবা মা কি ভেবেছিলেন যে তাদের সন্তান এত সহজে গেয়ে উঠবে গান, আবার নাচবেও? অবশ্য সেসব গান বা নাচের মান যে একেবারে অতি উচ্চাঙ্গের তা তো নয়। তবু বিশ্বভারতীর সাধারণ মান সারা-দেশের গড়পড়তা মানের চেয়ে অনেক উঁচু, অন্তত নাচ গান আর ছবি আঁকার ক্ষেত্রে!

এরপরে রবীন্দ্রজন্মের একশো পঁচিশ বছরে এসে গেল এক অভাবিত সুযোগ। লণ্ডনে আয়োজন হ'লো এক রবীন্দ্র উৎসবের। শান্তিনিকেতন থেকে একটা নাচ গানের দল গেল তাতে অংশ নিতে। সে দলের পঁচিশ জনের মধ্যে উৎসও হ'লো একজন। দুটো নৃত্যনাট্যে নাচবে, গানের দলে কোরাস গাইবে। বিজলী আনন্দে উচ্ছ্বাসে দিশাহারা। উৎসব থেকে ফিরলে দেখা করতে যাই। অ্যালবামে ফটো দেখি। সত্যি, কার জীবনের উৎসমুখ যে কোন্ দিক থেকে খুলে যায় কে জানে? বিজলী খানিকটা কপট অনুযোগের সুরে বললো আমাকে, 'সত্যি আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে এবার। ছেলেটা কি আমার নাচিয়ে হয়ে যাবে? লেখাপড়া শিখবে না নাকি?'

আমি বলি, 'লেখাপড়া তো ভালই শিখছে। তার সঙ্গে এমন সুযোগ আর কজন পায়? ভাবো তো, উৎস যদি কলকাতায় পড়াশুনো করতো তবে কি নাচ গানের দলে এমনভাবে বিলেত যেতে পারতো? আর তাছাড়া শান্তিনিকেতনে উৎস যদি ভবিষ্যতে সঙ্গীত ভবনের ছাত্র হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?'

যাকে নিয়ে এত কথা সেই উৎস তখন নির্বিকারভাবে একটা মাটির পুতুল গড়ছিল। তার ভেতরের স্থিতধী সত্তায় বিলেত ভ্রমণ কোনো উত্তেজনা আনে নি দেখলাম। শান্তিনিকেতনের এও হয়তো একটা শিক্ষা যা ভেতর-ভেতর গড়ে ওঠে। তাকে বললাম, 'নাচ গান তোর ভালো লাগে ?'

: হ্যাঁ।

: ভবিষ্যতে কি নাচ গানকে জীবিকা করবি ভাবছিস ?

: না ! আগে মাধ্যমিক পাশ করবো। তারপরে বিজ্ঞান পড়বো ইচ্ছে আছে। নাচ গান শেখবার কোনো অসুবিধেতো নেই এখানে। শিখে নেবো।

ভেবে দেখলাম উৎসর জন্য কোন সাইকো-অ্যানালিসিস লাগেনি। যাকে বলে সেল্ফ মোটিভেটেড।

কিন্তু এসবের বাইরেও কিছু ঘটনা থাকে, থেকে যায় এই দেশের এক বিশাল ছাত্রসমাজ। তাদের সবাই দীপনের মত সুপরামর্শ বা মোটিভেশন পায় না, কিংবা উৎস'র মত পায়না প্রাণবিকাশের পারিবেশিক ধারা। এদেরই একজনের নাম বিজন দাস। তার বাবা গরীব উদ্বাস্তু। উঠেছেন এসে এক গ্রাম্য কলোনিতে। স্বামী স্ত্রী আর তিনছেলে। গতর খেটে খাওয়া। বিজনের বাবা ট্রেনের ফল বিক্রেতা। বিজনের দাদা স্কুলের ড্রপ আউট। আপাতত তাদের গ্রামে ভ্যান রিক্সা চালায়। বিজন কিন্তু ছোটবেলা থেকে মেধাবী। বিদ্যায় তার বিপুল আগ্রহ। প্রাইমারী ক্লাস থেকে স্কুলে সে প্রথম হয় একেবারে নিজের চেষ্টায়। মাস্টার মশাইদের একটা আলাদা নজর আছে অবশ্য তার উপর। তাদের মত দরিদ্র খেটে খাওয়া পরিবারে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া একটা বড় স্বপ্ন।

সেই স্বপ্নে একটা বড় ধাক্কা লাগে যখন বিজন মাত্রই ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। তাদের চালাঘরের পেছন দিকে কোনো সমাজবিরোধী দল রেখে গিয়েছিল খড়ের মধ্যে ঢেকে একটা শক্তিশালী হাত বোমা। হয়তো প্রয়োজনমত কোনো এ্যাকশানে সেটা চটজলদি কাজে লাগাবার মতলব ছিল তাদের। বিজনের ভাই সুজন তখন নিতান্ত বালক। বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই জিনিসটা দেখতে পেয়ে বিজনের কাছে এনে বলে, 'দাদা, এই দ্যাখ্ একখানা বল।' বিজন সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে কি যে হয়, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। তাতে উড়ে যায় বিজনের ডানহাতের অনেকটাই।

জেলা হাসপাতালে যতজন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তার মধ্যে বিজনের শিক্ষকরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। তাঁদের মধ্যে বিজনের প্রিয় মাস্টারমশাই

শুভজিৎ বাবু ছিলেন। সবাই সান্ত্বনা দিয়ে চলে যাবার পর বিজন স্যারকে ডেকে বলে, 'স্যার, আমাকে একটা খাতা পেন্সিল এনে দেবেন?'

শুভজিৎ অবাক হয়ে বলেন, 'এখন, এই অবস্থায় খাতা পেন্সিল কি করবি?'

শান্ত কণ্ঠে বিজন বলে, 'এখন তো অনেকদিন এখানে থাকতে হবে। ততদিনে বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করি। আমি তো আর ডানহাতে লিখতে পারবো না স্যার।'

শুভজিৎ আমায় বলেছিলেন, তিনি কোনরকমে চোখের জল লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন হাসপাতাল থেকে। কিন্তু একটা কথা তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছিল। বুঝেছিলেন, লেখাপড়া বিজন করবেই এবং তাঁর জীবন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেল বিজনের সঙ্গে। এইবারে স্বরু হলো সেই লড়াই। দৈহিক প্রতিবন্ধিতার সঙ্গে মনের তীব্র সঙ্কল্পের লড়াই।

এ তো কোনো মুখরোচক খবর নয় যে সংবাদপত্রে বেরোবে। কিন্তু বিজন-শুভজিৎদের মত একরকম জেদের দাঁতে-দাঁত-চেপে লড়াই চলছেই সারাদেশে। শুভজিৎ কেবল যে বিজনের জন্যে বিদ্যাদানে তৎপর থেকেছেন তাই নয় তার মনকে চাঙ্গা রাখতে সবচেয়ে সতর্ক থেকেছেন। অবশ্য বিজনের স্কুলের সব শিক্ষকই তার প্রতি নজর রেখেছিলেন।

কিন্তু আসল কাজটা বিজনকে তো একাই করতে হয়েছে। তার ভেতরে নির্মাণ ক'রে নিতে হয়েছে আরেকটা বিজনকে। সে সঙ্কল্পবদ্ধ, দৃঢ়, অবিচল-লক্ষ্য। সে অপরের সহানুভূতি কুড়িয়ে বাঁচবে না। তাকে তো কতজনই নিরস্ত করতে চেয়েছে। দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্য—এই দুটো বড় শত্রুর সঙ্গে কি একা লড়া চলে? প্রথম প্রথম সে কেঁদেছে নিজের অক্ষমতায়, অন্যদের টিটকারিতে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। ঠুঁটো জগন্নাথ। এসব কথা তাকে হজম করতে হয়েছে। পাশাপাশি সহৃদয়জনের শুভেচ্ছাও ছিল বৈকি। তবে তার বাবা স্পষ্টই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, মা আড়ালে কাঁদতেন। দাদা উৎসাহ দিতো গোপনে চুপি চুপি, রাতে পাশে শুয়ে।

আসলে মানুষের স্বভাব পালটানো যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন দৈহিক প্রবণতাকে পাল্টানো। বিজন তো কোনদিন ন্যাটা ছিল না, তাই বাঁ হাতে লেখা স্পষ্ট করে লেখা, বা সবচেয়ে যা জরুরী—দ্রুতবেগে লেখা, তা আয়ত্ত করতে তার বহুদিন লেগেছে। অবশেষে তার প্রথম পর্যায়ের জয় এসেছে। ক্লাস এইট নাইন থেকেই তার সম্পর্কে শিক্ষকরাই আশাবাদী হয়ে ওঠেন। গতবছর বিজন

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিল শুভজিতের সঙ্গে। শুভজিৎ আমার ভাইয়ের মত। তাকে বলেছিলাম, বিজনকে আমি একদিন দেখতে চাই।

সামনাসামনি তাকে এই প্রথম দেখে মনে হলো একাগ্র সঙ্কল্পের স্বপ্নময় বিজনতা মাখানো তার দুই চোখে। বললাম, 'পাশ ক'রে কী পড়বে? আর্টস না সায়েন্স?' বিজন বললো, 'সায়েন্স'। আমি বললাম, 'কি ক'রে পড়বে সায়েন্স? একখানা হাতে কি ল্যাবরেটরির কাজ করতে পারবে?' বিজন তার স্বপ্নস্বচ্ছ চোখ দুখানি মেলে বললো, 'ঠিক পারবো। কেন পারবো না।'

ঠিক পনেরো দিন পরে বিজন এলো তার একমাত্র সক্ষম হাতে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে। প্রণাম ক'রে বললো, 'স্যার পাঠিয়ে দিলেন। আমার রেজাণ্ট বেরিয়েছে আজ।'

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিলই মনে। বললাম, 'কেমন হ'লো?'

: চারটে লেটার, স্টার।

বহুরকম সফলতার কারণে মিষ্টিমুখ করেছি জীবনে, এমন মিষ্টি কখনও লাগেনি।

* * * *

অমা নিশীথিনীতে মাঝে মাঝে তিনতলার ছাদে উঠে তারকাপুঞ্জ দেখি। মনের মধ্যে কত রঙের ভাবনাস্রোত বয়ে যায়। সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে দেখা-জানা সফলতা আর বিফলতার কথা মনে আসে। দেবদাস-অহনা-উৎস-দীপন সকলের কথা ভাবি। বিশেষ ক'রে বিজনের কথা মনে আসে। কিন্তু এত সব উজ্জ্বলতার আলো ম্লান হয়ে আসে যখন নিভৃত ক্ষণে নিজের মেয়েটির কথা ভাবি। তার কথা, তার অক্ষমতার কথা তো ভুলে থাকতেই চাই। তবু তা হানা দেয় মাঝে মাঝে। যেন বইয়ের মধ্যে চেপে রাখা শুকনো ফুলের গন্ধের মত। তখন মনের মধ্যে একরকম ক্ষরণ সুরু হয়।

শিক্ষার কোনোরকম আলোই আমার মেয়ের চোখে বিচ্ছুরিত হয়নি, হয়না। কেননা সে জন্ম থেকেই জড়বুদ্ধি। তাই আমি যেন সেই বাতিওয়ালা যার ঘরেই আলো জ্বলেনা। তার দুটি চোখ বোধহীন, তার ওষ্ঠ কোনোদিন ভাষার তাপে কাঁপেনি। এত বড় একটা বিরাট বিচিত্র বিশ্বে তার কিছু বোঝবার নেই, বলবার নেই। আমাদের বেদনাবিহত গৃহকোণ ছাড়া তার থাকার জায়গাও কোথাও নেই। দুরারোগ্য সেরিব্রাল পল্‌সি ব্যাধি তার মস্তিষ্ক আর স্নায়ুকে অসাড় ক'রে

দিয়েছে, কেবল প্রকৃতির অভ্রান্ত করুণ নিয়মে তার শরীরটা বেড়ে উঠেছে। সেই শরীরের ওপর অবশ্য তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সে কেবল তার জড়তা নিয়ে বসে থাকে চোখ মেলে।

এদেশে তার মত জড়বুদ্ধির সংখ্যা আঠাশ লক্ষ, কিন্তু তাদের জন্য সরকারি বা বেসরকারি কোনো আবাস নেই। এ জাতীয় প্রতিবন্ধীর অস্তিত্ব কেবল তার পরিবারের প্রতিবন্ধিতা এনে দেয়। এদের নিরাময়ের কোনো ঔষধ নেই, নিষ্ক্রমণের কোনো পথও নেই। দয়াময় মৃত্যুই কেবল এদের ত্রাতা।

কতবার ভেবেছি কোনো একটা হোম পাওয়া যায় না, যে কোন দামে, যেখানে তাকে রাখতে পারি। আবার ভাবি আমার জীবনের দায় কেন অন্যে বইবে? যদিও বা বয়, তবে কি সেটা হবে না আমারই আত্মপ্রবঞ্চনা। 'তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি' রবীন্দ্রগানের এই পংক্তি মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু এক্ষেত্রে বেদনার দান যে বড় দুঃসহ দুর্বহ। বুঝতে পারি পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম শাস্তি হ'লো সন্তানের ব্যর্থতা বিফলতাকে বুঝে নেওয়া।

এসব দুঃসহ অস্তিত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝে একঝলক বাতাসের মত খবর আসে। কোথাও একটা জড়বুদ্ধিদের জন্য নিকেতন খোলা হচ্ছে। পরে খোঁজ খবর নিয়ে হতাশ হ'তে হয়। কিন্তু সম্প্রতি মাস কয় আগে একজন নিশ্চিত খবর আনলেন, বেহালার সখের বাজারের ভেতরের দিকে এক বিদেশিনী একটি আবাস খুলেছেন। খবর নিয়ে অনেক খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পৌঁছোলাম। প্রাথমিক সংবাদেই অবশ্য খানিকটা হতাশ হ'তে হ'লো। কেননা আবাসও সত্য, বিদেশিনীও সত্য, কিন্তু জড়বুদ্ধিদের নয়, সেখানে আছে দৈহিক প্রতিবন্ধীরা। ইণ্টার ন্যাশনাল স্প্যাস্টিক সোসাইটির একটা শাখা। হতাশ হয়ে চলে আসছি কিন্তু বিদেশিনীর ডাকে বসতে হ'লো। জানতে চাইলেন সমস্যা কি। সব শুনে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে জানালেন, তাঁর নাম মিশেল। ফ্রান্সের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ছুটি নিয়ে পি. এইচ. ডি. ক'রে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ইংলণ্ডে স্পাস্টিক সোসাইটির কার্যকলাপ দেখে তার সদস্য হয়ে এদেশে এসেছেন সেবার কাজে। আর ফিরবেন না লেখাপড়ার জগতে। এই তো যথার্থ কাজ।

আমি সম্ভ্রম ভ'রে তরুণী বিদেশিনীকে দেখি। তিনি এবারে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি করি, আমার স্ত্রীই বা কি করেন। আমি বলি, 'আমরা দুজনেই কলেজে পড়াই।'

'সেকি?' বিস্ময়ে মিশেল বলে, 'আর আমার কাছে এসেছো জড়বুদ্ধি সন্তানের

সমাধানের জন্য ? তোমরা তো উচ্চশিক্ষিত, তোমরা বোঝোনি, এই ব্যাধির সামাজিক অসহায়তা ?'

: তার মানে ?

: তার মানে, তোমরা এক্ষুনি চাকরি ছেড়ে দাও। বাড়িতে নিয়ে এসো এলাকার জড়বুদ্ধিদের। সবাইকে নিয়ে একটা সেবাসত্র গড়ে তোলো।

: আমি ?

: হ্যাঁ তুমি এবং তোমার স্ত্রী। কিসের শিক্ষা তবে তোমাদের ? নিজের সমস্যাকে ভাবছো একার ? না না। সবাইকে নিয়ে ভাবো। টাকার অভাব হবে না। আমি জোগাড় ক'রে দেবো। তোমাদের মতো যারা আঘাত খেয়েছে তারাই তো সমাধান করবে। নইলে কিসের শিক্ষা ? স্কুল কলেজে পড়াবার লোকের অভাব হবে না। তোমাদের মত দুঃখের অভিজ্ঞতা পাওয়া অথচ শিক্ষিত মানুষের অভাব। গো অ্যাণ্ড ডেডিকেট ইয়োরসেলফ।

আমি অধোবদনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে বার হয়ে এলাম। মনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত খোঁজ ক'রে দেখলাম কন্যার ব্যাধি আমাকে সৌখিন দুঃখ-বিলাসী ক'রে দিয়েছে। আমি স্বার্থপরের মত তার হাত থেকে পরিত্রাণ চাই, তাদের মত ব্যাধিগ্রস্তদের সার্বিক ত্রাণ চাই না। আমার উচ্চশিক্ষা, বুদ্ধি, জ্ঞান আর যশোলিপ্সা আমাকে এ শিক্ষা দেয়নি যে আত্মদানই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।